# সম্মুখ সমরে কলকাতার সংবাদপত্র

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য

প্রাক্‌-পরিচয় : নিশীথরঞ্জন রায়

॥ ১৩, কলেজ রো ; কলিকাতা-৯ ॥

SAMMUKH SAMARE

KALKATAR

SAMBADPATRA

*by*

Dr. Nandalal Bhattacharya

প্রকাশক ঃ
মৃগাঙ্ক মৌলী চৌধুরী
রানার
১৩, কলেজ রো;
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি, ১৯৬০
গ্রন্থস্বত্ব ঃ করবী ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ঃ তরুণ চক্রবর্তী
ব্লক ঃ মডার্ন প্রসেস

মুদ্রণে ঃ
সুকুমার মল্লিক
এ. বি. প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট,
কলিকাতা-৬
মানস কুমার কোলে
শ্রীগুরু প্রিণ্টার্স
২৭, এস. এস. স্ট্রিট,
কলিকাতা-৯

# প্রাক্-পরিচয়

সংবাদপত্র এবং তার আনুষঙ্গিক হিসেবে সাংবাদিকদের নিয়ে সম্প্রতি বাংলা ভাষায় কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যায় আরও রয়েছে প্রকাশনার অপেক্ষায়। এতোদিন পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় গবেষণাধর্মী কিছু কিছু বই-এর একাধিপত্য ছিল। এই কারণে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য লেখা বই অভিনন্দনযোগ্য। সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রসেবীদের জন্য সাধারণ পাঠক সমাজের জানার আকাঙ্ক্ষা এতোদিন পূরণের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হতে চলেছে—এটি অবশ্যই সুলক্ষণ। সংবাদপত্র নিয়ে যেসব গবেষণাধর্মী বই প্রধানতঃ ইংরেজি ভাষায় রচিত হয়েছে তাতে স্থান লাভ করেছে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে সংবাদপত্রের ভূমিকার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। এই সব গ্রন্থ যতো পাণ্ডিত্যপূর্ণই হোক না কেন সাধারণ কুতূহলী পাঠক মন তাতে তৃপ্ত হয় না; বিশ্লেষণধর্মিতা আর তথ্যসম্ভারের কুটজালে তাঁরা হয়তো বিভ্রান্ত বোধ করেন, নয়তো বই পড়তে গিয়ে তাঁদের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পটভূমির চিত্রটি যতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের সঠিক ভূমিকা ততোখানি নয়।

তাছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রটি অতিরিক্ত মাত্রায় প্রশস্ত বলেই ভারতের একটি অঞ্চলের সংবাদপত্রের ভূমিকাকে তুলনামূলক ভাবে বেশি স্থানে অথবা গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। আর যদি তা সম্ভবও হয়, তাহলে সংবাদপত্র নিয়ে আলোচনার নেপথ্য-নায়ক সাংবাদিককে হয়তো পুরোপুরি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আরও একটি বিষয় এখানে প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় সংবাদপত্রের যুগ-পরিধি পৌনে দুশো বছর (১৮১৮-১৯১৮)। এই সময়-সীমার মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় লেখা গোটা সংবাদপত্রের ভূমিকা একটিমাত্র গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশন করা সম্ভব নয়।

গ্রন্থকার ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তিনি বেছে নিয়েছেন বিশেষ একটি অঞ্চলের দিশী এবং বিদেশী ভাষায় রচিত সংবাদপত্রের ভূমিকা-বর্ণনা আর সেই সঙ্গে সাংবাদিকের প্রতিও নিবদ্ধ করেছেন তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি। এই ধরণের কাজ বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রের প্রতিবাদী ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিককেও যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর বই-এর অনেকখানি জায়গা জুড়ে অবস্থান করেছেন যেমন ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের ('বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার') জেমস অগাস্টাস হিকি, 'বেঙ্গল জার্নালে'র সম্পাদক উইলিয়ম ডুয়েন, 'বেঙ্গল হরকারু'র সম্পাদক চার্লস ম্যাকলিন, 'এশিয়াটিক মিরার'-এর চার্লস কে. ব্রুস, 'মর্নিং পোস্টে'র মালিক-সম্পাদক হিটলে, 'ক্যালকাটা জার্ণালে'র স্বনামধন্য সিল্ক বাকিংহাম, তেমনি তাতে বর্ণিত হয়েছে পরবর্তীকালের 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ কৌমুদী' 'মীরাৎ উল আখবার,' 'সংবাদপ্রভাকর,' 'অমৃতবাজার,' 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'রেইজ অ্যান্ড রায়ত', 'বেঙ্গলী'। 'সোমপ্রকাশ,' 'বঙ্গবাসী,' 'স্টেটসম্যান' প্রমুখ পত্রিকার ভূমিকার মূল্যায়ন এবং সেই সঙ্গে তাদের সম্পাদকদের কথা। বিশ শতকের জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাও—সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, নিউ ইন্ডিয়া প্রমুখ এবং তাদের স্বদেশসমর্পিত প্রাণ সম্পাদকরা গ্রন্থকারের কাছে লাভ করেছেন প্রাপ্য স্বীকৃতি। প্রত্যেক গণ-প্রতিরোধের সংগ্রামে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের ভূমিকা নিয়েই লেখক শুধু আলোচনা করেন নি, তাঁর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীনোত্তর ভারতের সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্রসেবীদের মর্যাদা বৃদ্ধির ইতিহাস। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভূমিকার বিবর্তনের কাহিনী আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে যেহেতু অভিজ্ঞ লেখক প্রতিটি স্তরে সরকারী নীতির পটভূমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিবাদী ভূমিকার ইতিহাসই শুধু নয়, ভারত এবং ভারতীয়দের বিরুদ্ধে সরকারী স্তরে আচরিত অন্যায় অবিচার আর সমাজের প্রতিরোধ করার মতো সত্যসন্ধানী, উদার এবং সাহসী বিদেশী এবং ভারতীয় সাংবাদিকদের কর্মকৃতি বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরে ডঃ ভট্টাচার্য একটি মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন।

১ জানুয়ারি, উনিশশ' নব্বই নিশীথরঞ্জন রায়
ইনস্টিটিউট অব্ হিস্টরিকাল স্টাডিজ
কলকাতা-১৭।

## প্রস্তাবনা

সংবাদপত্রের আরেক নাম সংগ্রাম। সংবাদপত্র তুলে ধরে জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগের কথা, তুলে ধরে তার ওপর যে নির্যাতন, শোষণ এবং পীড়ন চলে তার কথা। স্বাভাবিকভাবেই শাসকশক্তি সংবাদপত্রকে দমনের জন্য বিস্তার করে প্রলোভন এবং কঠিন দণ্ডের বেড়াজাল। যেহেতু সংবাদপত্রের শক্তি জনতা, তাই বেশিরভাগক্ষেত্রেই শাসকের সেই প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে রেখে তার দণ্ডনীতির মোকাবিলা করে সংবাদপত্র। এ কাহিনী কোন এক নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এ কাহিনী সর্বদেশের—ভারতবর্ষেরও।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। বৃটিশভারতের রাজধানী হওয়ার সূত্রে সংবাদপত্রের বিকাশ এবং বিস্তারও ঘটে কলকাতাতেই। এই কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র থেকে শুরু করে স্বাধীনতাপূর্বকালে প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রকেই কোন না কোন ভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয় বৃটিশশক্তির সঙ্গে। বৃটিশ পরিচালিত সংবাদপত্র আর ভারতীয় সংবাদপত্রের সংঘাতের ক্ষেত্র এবং রূপ দুই-ই ভিন্ন। তবু প্রথমদিন থেকেই কলকাতার সংবাদপত্রের একটি সংগ্রামী মনোভাব গড়ে ওঠে। যে মনোভাব থেকে আজকের সংবাদপত্রও বিচ্যুত নয়।

বস্তুত, বৃটিশ শাসনের সেই আদিযুগে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন ইউরোপীয়রাই। সেসব সংবাদপত্র পরিচালনা করতে গিয়ে যখনই তাঁরা শাসকগোষ্ঠীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিবিশেষের ত্রুটি, অন্যায় অত্যাচারের কথা প্রকাশ করেছেন অমনি তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে কারাবাস কিংবা এদেশ থেকে নির্বাসন। সত্যি কথা বলতে কি, তখন একের পর এক সম্পাদককে ভারত থেকে বহিষ্কার করেই বৃটিশশক্তি সমালোচনার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা চালান কিন্তু তাঁদের এই অস্ত্র ব্যর্থ হয় ভারতীয় সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে। নির্বাসন অস্ত্র ব্যর্থ হওয়াতেই বৃটিশশক্তি সাংবাদিকদের দমন করার জন্য তৈরি করতে থাকেন একের পর এক অস্ত্র। ভারতীয় সংবাদপত্রে যখন দেশের মুক্তির

জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানানো হ'ল, যখন বৃটিশ শাসনের অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হতে থাকল তখন ভারতীয় সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রকর্মীদের কপালে জুটল কারাবাস এবং নানা লাঞ্ছনা। বাজেয়াপ্ত হ'ল একের পর এক প্রেস, তবু সেই অত্যাচারের মুখে মাথা নত করেনি ভারতীয় সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা। নির্ভীকচিত্তে তাঁরা সেদিন গড়ে তোলেন সংগ্রাম। সে সংগ্রামের রূপ দেখে স্তব্ধ হয় বৃটিশশক্তি—শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় বহু বিদেশীর।

কলকাতার সংবাদপত্রের সেই সংগ্রামী চরিত্রটিকে তুলে ধরার পাশাপাশি সংবাদপত্রের ইতিহাসের রূপরেখাও টানা হয়েছে এই বইয়ে। ওইসঙ্গে সংবাদপত্রকে দমনের জন্য বৃটিশশক্তি যেসব আইন প্রণয়ন করে এবং যার অনেকগুলি এখনও বহাল তবিয়তে বর্তমান—সেগুলির পটভূমি, সে আইনের মূল বিষয়গুলির প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি এই বইতে। সংবাদপত্রের অনিসন্ধিৎসু ছাত্র বা গবেষকই শুধু নয়, সাধারণ মানুষের যাতে এই বই কাজে লাগে সেদিকে নজর রেখেই সবকিছু ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছি। তাই তাঁদের যদি এই বই ভাললাগে তাহলেই সার্থক মনে করব পরিশ্রমকে।

বইটির নামকরণ করে কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ করেছেন যুগান্তর পত্রিকার যুগ্মসম্পাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। নানা ধরণের বই জুগিয়ে সাহায্য করেছেন স্কটিশচার্চ কলেজের সহঃগ্রন্থাগারিক অমলেশ রায়। বইটি লেখার ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি পূর্বাচার্যদের লেখা বিভিন্ন বই থেকে। এঁদের সবার প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা, সশ্রদ্ধ অভিবাদন। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে তরুণ প্রকাশক মৃগাঙ্ক মৌলী চৌধুরী কিছুটা দুঃসাহসিক ঝুঁকিই নিয়েছেন। তাঁর প্রতিও রইল প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবশেষে কলকাতার অতীত এবং বর্তমানের সংগ্রামী সাংবাদিকদের জানাই প্রণাম—শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জি ৪, রবীন্দ্রপল্লী, জ্যাংড়া — **নন্দলাল ভট্টাচার্য**
বাগুইআটি, কলিকাতা-৫৯ — তিন জানুয়ারি, উনিশ শ' নব্বই

# লেখক পরিচিতি

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য-এর জন্ম ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। ছোটবেলা ও বিদ্যালয় জীবন কাটে হুগলী জেলার তারকেশ্বরে। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় এবং পি. এইচ. ডি। সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনসেবার জন্য ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের লায়ন্স ক্লাব ইণ্টারন্যাশনাল ( ডিস্টিক্ট ৩২২বি ) পুরস্কার জয়ী। বর্তমানে যুগান্তর পত্রিকার চিফ সাব-এডিটর ও পত্রিকার 'ধর্মকর্ম" পৃষ্ঠার সম্পাদক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকায় যেমন বেশ কিছু ধর্মগ্রন্থ ও জীবনী আছে, তেমনি আছে বেশ কয়েকটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। তাঁর রচনার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ও বারাণসীর কয়েকটি সংস্থা কর্তৃক তিনি সম্মানিত।

উৎসর্গ

সতত-প্রতিবাদী

করবী ভট্টাচার্যকে

# বিষয় সূচী

# সাংবাদিক যখন সংবাদ

আমি জেমস অগাস্টাস হিকি।

আমি নিজেকে একজন প্রকৃত ইংরেজ বলে মনে করি।

আজ আমি জেলে পচছি। আমার চারধারে রয়েছে চোর, গুণ্ডা বদমাস। প্রকৃত ইংরেজ হয়েও আজ আমি হেস্টিংসের ফাটকে আটক, ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত।

আমার অপরাধ, যারা বৃটেনের সুমহান ঐতিহ্যকে নষ্ট করছে তাদের বিরোধিতা করা। আমার অপরাধ—আমি সত্য কথা বলছি। আমার অপরাধ—কোন প্রলোভনেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আমি বিকিয়ে দিইনি। 'গ্রেট মোগল' হেস্টিংস অথবা তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পণ করিনি—কোনদিন কোন কারণে তাঁদের কৃপাভিক্ষা করিনি এটাই আমার মস্ত অপরাধ।

আমার দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে 'গ্রেট টার্ক' হেস্টিংস এবং 'জজ জেফরেজ' বা 'পুলবুডি' ইম্পে আমাকে এই ফাটকে আটকে রেখেছে। কিন্তু আমি জোরগলায় বলছি, এভাবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা যাবে না কিছুতেই।

কলকাতা কেন, ভারতের প্রথম খবরের কাগজ 'হিকিজ বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার'-এর পাতায় এমন সব বক্তব্য পড়ে মানুষ টান টান হয়ে বসল। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এমন শক্তহাতে কলম ধরার জন্য বহু মানুষই হিকির ভক্ত হয়ে উঠল।

অবশ্য এভাবে হিকির ভক্ত হয়ে ওঠার শুরু—কিন্তু সেদিন নয়। প্রথম যেদিন হিকির গেজেট বেরুল সেদিনই মানুষ বিস্ময়ে থমকে যায় হিকির বলিষ্ঠতা দেখে।

দিনটা ছিল ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি, শনিবার। বিশ্বের প্রথম ছাপা খবরের কাগজ প্রকাশের মাত্র ১৭১ বছর পরের ঘটনা। কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের প্রথম খবরের কাগজটি প্রকাশ করলেন জেমস

অগাস্টাস হিকি। আর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে কাগজের খবর সাড়া জাগাল শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারত এমনকি বৃটেনের কিছু মানুষের মধ্যেও। কাগজের বিজ্ঞাপন, সংবাদপ্রকাশের ধারা প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত করল হিকিকে।

অথচ সাংবাদিক হবার স্বপ্ন কিন্তু হিকি প্রথম দেখেননি। তিনি সেই সময়ের আরো অনেক ইংরেজের মত জাহাজে চড়ে একদিন ভারতে আসেন সৌভাগ্যের সন্ধানে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বাকিংহাম থেকে হিজলিতে এসে নামেন হিকি। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কিছু সম্পদ আর কম করে তিনটি বিষয়—আইন, মুদ্রণ এবং ডাক্তারি সম্পর্কে বেশ কিছুটা জ্ঞান।

ভারতে এসে হিকি কিন্তু প্রথমেই তাঁর অধিগত এই তিনটি বিষয়ের কোনটিকেই কাজে লাগালেন না। বরং তিনি শুরু করলেন ব্যবসা। বৃটেন থেকে নিজে যা টাকা পয়সা এনেছিলেন তাকে সামনে রেখে স্থানীয় বেশ কিছু বেনিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন ঋণ। সেই ঋণের টাকায় শুরু হল তাঁর নতুন ব্যবসা—জাহাজের ব্যবসা। জাহাজে করে মাল বহনের কাজে নামলেন তিনি।

অল্পদিনের মধ্যেই জমে উঠল ব্যবসা। হিকির সঞ্চয় বাড়তে থাকল—বাড়তে থাকল সামাজিক মর্যাদা। মর্যাদাটা যে বেড়েছিল তার প্রমাণ, মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর যাঁরা শাসকগোষ্ঠীর কাজের সমর্থনে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করছিলেন—তাঁরা দরবার করেছিলেন হিকির কাছেও তাঁর মূল্যবান সইটির জন্য।

ব্যবসা যেভাবে চলছিল, সেভাবে চললে হিকি হয়ত তখনকার আর কিছু ধনী ইংরেজের মত বিলাসের স্রোতেই গা ভাসাতেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যলিপি লেখা ছিল অন্যভাবে। তাই ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ তাঁর জীবনে চিহ্নিত হয়ে রইল একটা গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসাবে।

১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হিকি তাঁর ব্যবসায় বড় ধরনের মার খেলেন। যে জাহাজে তিনি মাল পাঠিয়েছিলেন—তার খোঁজ পাওয়া গেল না বহু-

দিন। বেশকিছুদিন পর নানা দুর্ঘটনার ঝাপটায় টালমাটাল হয়ে জাহাজটি বন্দরে ভিড়ল, দেখা গেল বেশির ভাগ মালই নষ্ট হয়ে গেছে।

ব্যবসায়ীরা সুযোগ পেয়ে ছেঁকে ধরল হিকিকে। নগদ টাকা-পয়সা যা ছিল তা দিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবির একটা ছোট অংশও মেটে না। হিকি নিজের বাড়ি এবং স্থাবর অস্থাবর যেসব সম্পত্তি ছিল তা দিয়ে একটা রফা করতে চাইলেন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা ততদিনে হিকির অবস্থা জেনে গেছে ভাল করে—তাই দয়া, সমবেদনার বদলে তারা শাইলকের মত ক্রুর—কঠোর হয়ে উঠল। টাকার জন্য তারা মামলা দায়ের করল। হিকিকে ঠাঁই নিতে হল জেলে। সেটাই হিকির প্রথম জেলে বাস।

শুরু হল মামলা। হিকির তখন ভাঁড়ে মা ভবানী। তাই তাঁর হয়ে মামলা লড়বার জন্য পাওয়া গেল না কোন আইনজীবীকেই। নিজের মামলা একা লড়তে লড়তে ক্লান্ত হিকি শেষ পর্যন্ত একটি চরম চিঠি লিখলেন কলকাতায় প্রায় সদ্য-আসা অ্যাটর্নি উইলিয়াম হিকিকে।

উইলিয়াম হিকিকে চিঠি লিখলেন জেমস অগাস্টাস হিকি। লিখলেন, একজন সৎ ইংরেজ হয়েও এদেশের বেনিয়াদের চক্রান্তে আমি এখন জেলে বন্দি। আমি আজ ধনেপ্রাণে মরতে বসেছি। আমার সবকিছু দিয়ে আমি রেহাই চেয়েছিলাম। কিন্তু শয়তান ভারতীয় ব্যবসায়ীরা আমার অবস্থা টের পেয়ে দাবির ফাঁসটা বেশ জোরে এঁটে ধরেছে আমার গলায়। তাতেই হাঁসফাঁস করছি আমি।

হে বন্ধু উইলিয়াম হিকি। আপনিও তো একজন ইংরেজ। আপনার পক্ষে কি আপনার স্বদেশবাসী এই হতভাগ্য ইংরেজটির জন্য কিছু করা সম্ভব নয়? এই বিদেশে আমি শুধু আপনারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হিকির সেই চিঠিকে উপেক্ষা করতে পারলেন না অ্যাটর্নি হিকি। তিনি হিকির মামলাটি হাতে নিলেন। তার আগেই অবশ্য হিকি

সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়ে গেছে উইলিয়াম হিকির। তিনি জেনেছেন, এমনিতে ভাল মানুষ হলেও হিকি একটু খ্যাপাটে। মেজাজটা একটু চড়া আর কিছুটা নীতিবাগীশ বলে নিজে যেটাকে খারাপ মনে করেন তাকে মুখের ওপর খারাপ বলতে তাঁর বাধে না এতটুকু।

উইলিয়াম গিয়ে দেখা করলেন হিকির সঙ্গে। বললেন, দেখ, তোমার মামলা আমি নিচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, আদালতে যখন মামলা চলবে তখন একদম চুপচাপ থাকবে। উকিল, জুরি—কারো সম্পর্কেই একটি কথাও বলবে না, বুঝেছ?

উকিল ভুল পথে মামলা নিয়ে যাচ্ছে দেখেও কিছু বলব না?

না, একদম মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে তুমি।

বেশ, তুমি যখন বলছ, তখন তাই হবে।

হ্যাঁ, কথাটা মনে রেখ। একটু বেগরবাই করলেই কিন্তু মামলা ছেড়ে দেব আমি।

না, না, একদম বেগরবাই করব না। ভালমানুষের মত চুপচাপ থাকব আগাগোড়া।

তা যদি থাক, তাহলে তোমাকে খালাস করে আনব খুব শিগগির —একথাটা দিচ্ছি তোমায়।

অ্যাটর্নি হিকিকে কথা দিলেও হিকি কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে পারেননি। সাওয়াল জবাবের সময় নিজের উকিলের বিরুদ্ধেই ফুঁসে ওঠেন হিকি। অনেক জল ঘোলা করে শেষ পর্যন্ত শান্ত হন হিকি, ছাড়াও পান। তারপর শুরু অন্য জীবন।

অন্য জীবনের শুরুটা অবশ্য জেলখানাতেই। জাহাজ ব্যবসার ভরাডুবি দেখে জেলে বসেই হিকি ঠিক করেন, আর অজানা ব্যবসায় নামবেন না। এবার শুরু করবেন হয় ছাপাখানার কাজ কিংবা ডাক্তারি। এই ভাবনামতই ইংলণ্ডে অর্ডার দেন হিকি ছাপাখানার টাইপ ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম এবং কিছু ওষুধের জন্য।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হিকি একরকম হেডটেল করে ছাপাখানার কাজ শুরু করাটাই ঠিক করেন। বরাত ভাল তাঁর! ছাপাখানা চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি সেনাবিভাগের বেশ মোটা একটা কাজের অর্ডার পেয়ে যান হিকি। প্রথম দফাতেই ৩৬ হাজার টাকারও বেশি কাজ করেন হিকি।

কিন্তু গোড়ায় যে কথাটা বলছিলাম, হিকির কপালে আছে ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক মুদ্রাকর হওয়া। ব্যবসায় লাভ হতে থাকলে কপাল লিখন ফলাটা বেশ দুরূহ হয়ে পড়বে, তাই এখানেও সরকারের সঙ্গে গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়লেন হিকি। আটকে গেল তাঁর ওই ৩৬ হাজার টাকার বিল।

হিকি এখন পুরোপুরি প্রশাসন বিরোধী। তাঁর মধ্যে অ্যাণ্টি এসটাবলিশমেণ্ট সেণ্টিমেণ্টটা চাড়া দিয়ে উঠল এবার। কিছুদিন থেকেই হিকির কয়েকজন বন্ধু একটি কাগজ বের করার কথা বলছিল। এতদিন দোনামনা করলেও হিকি এবার ঠিক করে ফেলেন, খবরের কাগজই বের করবেন তিনি। সেই ঠিক করারই ফসল হিকির বেঙ্গল গেজেট।

প্রথম সংখ্যা দেখেই চনমন করে উঠল ভারতে প্রবাসী বৃটিশ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রা! হ্যাঁ, এরকম একটা জিনিসই তারা খুঁজছিলেন। ভারতে বসবাস করলেও, ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে হলেও, তারা যে ভারতীয় নয়, তারা যে রাজার জাত—একথাটা তাদের মাথায় সুড়সুড়ি দিত সব সময়। তাই সহ্য হোক, না হোক তারা চাইত বৃটিশ খানা, চাইত ইউরোপীয় পোশাক। অথচ মুসকিল, সব সময় হাতের কাছে তা পাওয়া যেত না। কবে জাহাজ আসবে, তবে আসবে সেসব জিনিস। কিন্তু জাহাজ যে কবে আসবে এবং তাতে কি কি মাল থাকবে তা যেমন জানতে পারত না বিক্রেতারা তেমনি যারা কিনবে তারাও থাকত অন্ধকারে। হিকি নিজেও সম্ভবত ভুগতেন ওই অসুবিধেতে। তাই হিকির গেজেটের অনেকখানি জুড়েই থাকত শুধু বিজ্ঞাপন। সেসব

বিজ্ঞাপন যেমন মজার তেমনি তৎকালীন প্রবাসী ইউরোপীয়দের জীবনধারা ও মানসিকতার ছবিও পাওয়া যেত তাতে।

হিকির গেজেটে একদম প্রথম সংখ্যা থেকেই বিক্রির জন্য যেসব বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতে থাকে তাতে একটি মূল্যবান সামগ্রীর নাম থাকতই—বোঝা যায় সেটি তৎকালীন ইউরোপীয়দের অত্যন্ত পছন্দসই জিনিস। সেটি হল চীন থেকে আমদানি করা সিল্ক। দ্বিতীয় তৃতীয় সংখ্যাতেই বিখ্যাত নিলামদার উইলিয়ামসন বিজ্ঞাপন দেন, ১৭৮০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির নিলামে অন্যান্য জিনিসের মধ্যে থাকবে ইংল্যান্ড থেকে আসা প্রচুর হ্যাম, ফিশ সস, মিট সস, স্যালাড অয়েল, টুপি, তরোয়াল, সিল্কের মোজা, পিয়ানো, গিটার ইত্যাদি।

গেজেটের ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ১ জুলাইয়ে প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপনে বলা হল ইংল্যান্ড থেকে আসা একটা রাজহংসমুখী বিরাট গাড়ি বিক্রি হবে। সে বিজ্ঞাপন দেখে প্রলোভিত হন শ্রীমতী হেস্টিংস। কিন্তু হেস্টিংস সেটি দেখে তাঁর স্ত্রীকে লেখেন, "প্রিয়তমে, আমি ঐ বিরাট গাড়িটি দেখেছি, বড্ড বেয়াড়া চেহারা ওটার। তার ওপর চারিদিকে ফাটা দাগ। আমার মনে হয়, অনেক কালের পুরানো গাড়ি ওটা। ওটা আমার একদম পছন্দ নয়। কাজেই⋯।"হেস্টিংসের পছন্দ না হলেও গাড়িটা সম্ভবত বিক্রি হয়ে যায় মাস খানেকের মধ্যেই। কেননা, তিন চারটে বিজ্ঞাপনের পর আর এসম্পর্কে কোন বিজ্ঞাপন বের হয়নি।

বিজ্ঞাপন ছাড়াও প্রথম সংখ্যাতে সবার নজর কাড়ে 'পোয়েটস কর্ণার' বা 'কবিদের জন্য'। কবিতা লিখতেন স্বয়ং হিকি এবং আরো কেউ কেউ। কিছুদিন বাদে কবিতার মধ্যে সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের হুলও দেখা দিল। তবে প্রথম সংখ্যার কবিতাটি ছিল নেহাতই কবিতা। মজার কথা, প্রায় ৮ বছর ভারতবাসের পরও হিকি তাঁর কবিতা 'দি সিজনস' বা ঋতুর জন্য ভারত নয়, বেছে নেন ইংল্যান্ডের ঋতুকেই। আর ঐ মানসিকতা শুধু হিকি নয়, এখানকার সব ইউরোপীয়েরই—তাই কবিতাটি ভাল লাগে সবারই। হিকি লেখেন,—

The flow'rs of July can't compare
To the fragrance that—hangs on her lips,
Nor the plenty of August declare
The nectar that thence one might sip.

শুধু প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অথবা ওই জাতীয় কিছু বিমূর্ত বিষয় নিয়েই হিকি কবিতা প্রকাশ করতেন না, সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়েও করতেন। এমনই একটি কবিতা বেরোয় গেজেটের দশম সংখ্যার ১ এপ্রিল তারিখ। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্স ও আমেরিকার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তাকে ব্যঙ্গ করে দু'বছর বাদে হিকি লেখেন,—

Rejoice, Americans rejoice !
Praise ye the Lord with heart and voice ;
The treaty's sign'd with faithful France,
And now like Frenchmen, sing and dance !
Say, yankies don't you feel compunction
At your unnatural, rash conjunction ?

এধরণের বিষয় ছেড়ে হিকি যখন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তাঁর এই 'পোয়েটস কর্ণার'-এ কলম ধরলেন তখন সেটা হয়ে উঠল মস্ত আলোচনার বিষয়। হেস্টিংসের অপকীর্তি নিয়ে বেশ কয়েকটা কবিতা লেখেন হিকি। তার মধ্যে একটিতে শ্রীমতী হেস্টিংসের কাছে আবেদন করে লেখেন, প্রকৃত বৃটিশ স্ত্রীরা যেমন তাঁদের স্বামীদের সংশোধন করেন তেমন ভাবে শ্রীমতী হেস্টিংসেরও উচিত দুষ্ট হেস্টিংসকে শায়েস্তা করা।

ইউরোপীয়দের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন সংবাদ ছাপার সূত্রেই হিকি পত্রিকার নবম সংখ্যাতে ঘোষণা করেন, তাঁর বাড়ির বাইরে তিনি একটি 'এডিটর' বক্স' বসাচ্ছেন যে-কেউ তাতে পত্রিকাতে প্রকাশের জন্য চিঠি ফেলতে পারেন। এরপর থেকেই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে থাকে পাঠকদের চিঠি। সেসব চিঠিতে যেমন কলকাতা এবং অন্য জায়গার অধিবাসীদের (অবশ্যই ইউরোপীয়) অভাব-অভিযোগ

এবং অসুবিধের কথা থাকত, তেমনি প্রশাসন-এর দুর্নীতি এবং অন্যায় আচরণের খবর প্রকাশ পেত।

গেজেটে প্রকাশিত চিঠির অভিযোগ থেকে জানা যায়, এদেশীয় শ্রমজীবীরা যেমন খুশি তেমন মজুরি দাবি করত এবং ইউরোপীয়দের তাই দিতে হত। বালেশ্বর থেকে আসা পাল্কি বেয়ারা থেকে কুলি পর্যন্ত প্রত্যেকেই জবরদস্তি চালাত বেচারা সাহেবদের ওপর। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১৬শ সংখ্যায় এক পত্রলেখক প্রায় কেঁদে লিখেছেন, ওইসব চাকরবাকর কুলি বেয়ারার দল মুখের ওপর সাফ বলে দেয়, তাদের দাবি মত মজুরি যদি দিতে না চান তবে নিজের কাজ নিজেই করে নিন। ভাবতে পারেন কেমন বেয়াদপ এইসব চাকরবাকরের দল। আরেক পত্র-লেখকের অভিযোগ, তাঁর চাকর নাকি বলে, অন্যের বাড়িতে কাজ করলে মাসমাইনে ছাড়া রোজ কম করে একটাকা সরান যায়, কিন্তু আপনার এখানে তার উপায়টি নেই, তাই গড় করি আপনার চাকরির পায়ে।

আবার সরকার যখন চলতি সব মুদ্রা বাতিল করে সিক্কা টাকা চালু করল তখন লেনদেনে যে সংকট দেখা দিল তা নিয়েও চিঠি প্রকাশিত হয় গেজেটে। প্রথম বছরের ৩৫তম সংখ্যায় অভিযোগ করা হয়, সরকার দেশের সবজায়গায় এই সিক্কা টাকা চালু করতে না পারায় দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে ব্যবসাদার এবং এদেশীয় সাধারণ মানুষকে। পাটনা থেকে এক পত্রলেখক অভিযোগ করেন, পাটনা সিক্কা টাকা এবং মুর্শিদাবাদ সিক্কা টাকার বিনিময়ের ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ বাটা দিতে হয়। ফলে গরিব মানুষদের কাছে মজুরি বা টাকার দামটা কমে যাচ্ছে এবং তারা যা পাচ্ছে তাতে রোজকার খাবার চাল নুনটুকুও কিনতে পারছে না।

এমনিভাবে রোহিলা যুদ্ধ এবং মারাঠা যুদ্ধ সম্পর্কে হেস্টিংসের ভুল নীতির সমালোচনা করে চিঠি এবং খবর বের হতে থাকে গেজেটে। সেনারা কিভাবে প্রবঞ্চিত হচ্ছে তার খবরও ছাপা হয় প্রায় নিয়মিত। ওইসঙ্গে আদালতে কিধরণের বেআইনি কাজকর্ম চলেছে এবং ঘুষ না দিলে যে কিছুই হয় না তাও লেখা হতে থাকে। ফলে হিকির গুণগ্রাহীর

সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে তেমনি বাড়তে থাকে শত্রু। বিশেষ করে হেস্টিংস আর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে প্রচণ্ড-ভাবে ক্ষেপে যান হিকির ওপর। তাঁরা হিকিকে জব্দ করার উপযুক্ত সময়টুকুর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

চরম সংঘাতটা বাধল নবেম্বর মাসে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি শহর কলকাতার উন্নতির জন্য গবর্নর জেনারেল হেস্টিংস একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট সেটিকে আইনে পরিণত করে। ওই আইনে কলকাতার দেখভাল বা শাসনের ভার দেওয়া হয় গবর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিল মনোনীত কমিশনারের ওপর। সেই আইনবলে শহর কলকাতার প্রথম কমিশনার নিযুক্ত হন সুপ্রিম-কোর্টের বিচারপতি রবার্ট চেম্বারস। কমিশনারদের অফিসার নিয়োগের যে ক্ষমতা দেওয়া হয় তাতে এডওয়ার্ড টিরেট্রা (যাঁর নামে আজকের টেরিটি বাজার) নিযুক্ত হন সার্ভেয়ার। নতুন আইনে সার্ভেয়ারের ক্ষমতা অসীম। নগর উন্নয়নের জন্য জারি করা এই আইনে ব্যাপক কর বসানোর যে ক্ষমতা নেওয়া হয়েছিল তাতে কিন্তু চটে গেল কলকাতার বেশিরভাগ ইংরেজ। আর তাদের পক্ষ নিয়ে হিকি ছাপতে থাকলেন একটার পর একটা খবর। ওই ইংরেজের দল নতুন আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গড়ে তোলেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংস্হা এবং তাকে সক্রিয়ভাবে মদত দিতে থাকে হিকির গেজেট। তাদের সভা-সমাবেশের খবর ছেপে আন্দোলনকারীদের সমর্থন এবং সরকারের বিরোধিতা করার জন্য আবেদন জানাতে থাকেন হিকি।

ওই আইনের বিরুদ্ধে তৎকালীন ইংরেজদের বিরোধিতার মূল কারণ অতিরিক্ত কর ধার্যের প্রস্তাব। শহরের রাস্তাঘাট উন্নয়ন এবং পয়ঃপ্রণালী তৈরির জন্য এর দু-এক বছর আগে কর্নেল ক্যাম্বেল একটা পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন সরকারের কাছে। পরিকল্পনা কার্যকর করতে দু লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে তিনি বলেছিলেন। কিন্তু 'অত টাকা' এই অজুহাতে সরকার প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। কিন্তু এখন সেই কাজের

জন্য সেই সরকারই ৬ লক্ষ টাকার বার্ষিক কর বসাতে যাচ্ছেন দেখে প্রতিবাদে মুখর হন সবাই। হিকি তাঁর গেজেটের ৪২ তম সংখ্যায় প্রশ্ন তোলেন এত বাড়তি টাকা নিয়ে সরকার করবেন কি? উত্তরটাও দেন তিনিই। তিনি হেস্টিংসকে 'গ্রেট মুঘল' এবং ইম্পেকে 'পুলবুডি' আখ্যা দিয়ে লেখেন ওই সারাইয়ের কাজটা করবে হেস্টিংস এবং ইম্পের বেনামা কোম্পানী এবং পুরো টাকাটাই তারা মেরে দিতে চায় ওইভাবে। ওই কাজের জন্য যেসব মোটা মাইনের পদ সৃষ্টি করা হবে তাকে বর্তমান সরকারের খয়ের খাঁ-দের বসানোর মতলব করা হয়েছে বলেও হিকি ইঙ্গিত দেন।

এর আগেও হিকি বহুবার হেস্টিংস এবং তাঁর সরকারের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু হেস্টিংস এবার আর হিকিকে বরদাস্ত করলেন না। ৪৩ম সংখ্যাতেই হিকি লিখলেন "কলকাতার ইংরেজরা দেশের মঙ্গলের জন্য এধরণের সংস্থা গড়ে তোলায় হেস্টিংস ভয় পেয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা এতে তাঁর (হেস্টিংসের) নাম কলঙ্কিত হবে।" এই খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পরই হেস্টিংস নিলেন চরম ব্যবস্থা। কলকাতা তথা ভারতের প্রথম খবরের কাগজটির কণ্ঠরোধে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন হেস্টিংস। টুঁটি টিপে মারতে চাইলেন পত্রিকাটিকে। সরকারের কাছ থেকে পত্রিকাটি যেসব সুযোগ-সুবিধে পেত তা প্রত্যাহার করে নিলেন তিনি। কাউন্সিল অব বেঙ্গল-কে দিয়ে তিনি ১৪ নবেম্বর পাশ করিয়ে নিলেন, জেনারেল পোস্ট অফিসের মাধ্যমে হিকি আর তাঁর কাগজ পাঠাতে পারবেন না গ্রাহকদের কাছে। নির্দেশটা এই রকম—

Fort Willium, 14th Nov, 1780

Public Notice is hereby given that as a weekly Newspaper called the Bengal Gazette or Calcutta General Advertiser, printed by J.A. Hicky, have lately been found to contain several improper paragraphs, tending to veleity private characters, and to disturb the peace of the settlement, it is no longer permitted to be circulated thro' the channel of the General Post Office.

ফোর্ট উইলিয়ামের ওই নোটিশে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ'-এর যে কথা আছে তার ইতিহাস কিন্তু একটু অন্যরকম। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট বের করে হিকি শুধু ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের সম্পাদকই হলেন না, ওই সঙ্গে সংবাদপত্রের একচেটিয়া কারবারও চালাতে লাগলেন। হিকির গেজেটের সাফল্য দেখে তখন অনেকেই কাগজ বের করে রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এমনই দুজন হলেন পিটার রিড এবং বি. মেসিঙ্ক।

রিড ছিলেন লবণের এজেন্ট আর মেসিঙ্ক যুক্ত ছিলেন থিয়েটারের ব্যবসার সঙ্গে। তা, তাঁরা দুজনে মিলে 'ইন্ডিয়া গেজেট' নামে একটা খবরের কাগজ বের করবেন বলে ঠিক করলেন। শুরু হয়ে গেল কাজ। একদিকে যেমন ছাপাখানার সাজসরঞ্জাম জোগাড়ের দিকে নজর দিলেন তাঁরা, অন্যদিকে তেমনি হিকির গ্রাহকদের কাছেও আবেদন করলেন, বেঙ্গল গেজেট ছেড়ে ইন্ডিয়া গেজেটের গ্রাহক হতে। খবরটা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন হিকি। হিকি তাঁর গেজেটে আশা প্রকাশ করলেন, নতুনের মোহে তাঁর গ্রাহকরা নিশ্চয়ই তাঁকে ছেড়ে যাবেন না। একে একচেটিয়া ব্যবসায় ভাগ বসান, তার ওপব গ্রাহক ছিনিয়ে নেওয়ার এই চেষ্টা. তার ওপর হিকি যখন শুনলেন রিড এবং মেসিঙ্ক সরকারের কাছে বেশ কিছু সুবিধার জন্য দরবার কবেছে তখন হিকির একবারে নৃত্য করার মত অবস্থা।

রিড আর মেসিঙ্ক সম্ভবত হিকি সম্পর্কে সরকারের মনোভাবটা টের পেয়েছিলেন আগেই। তাই তাঁরা কাগজ বের করার আগে সরকারের কাছে এক আবেদনে বললেন· "কলকাতার বাইরে আমাদের পাঠকদের বিনা ডাকটিকিটে এই কাগজ পাঠাবার অনুমতি দিলে আমরা বাধিত হব। অবশ্য আপনি যেমন বলবেন সেইমত বছরে কিছু টাকা পোস্টমাস্টার জেনারেলকে দিতে আমরা রাজি আছি।" সরকার সঙ্গে সঙ্গে ওই আবেদন মঞ্জুর করলেন। 'বিনা ডাক টিকিটে' কাগজ পাঠাবার অধিকার পেয়ে গেলেন রিড এবং মেসিঙ্ক।

সরকারের এই ঢালাও করুণা পেয়ে দু'জনেই দারুণ খুশি। অসুবিধে একটু হল শুধু ছাপার টাইপপত্র জোগাড়ে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সুরাহা হল সে সমস্যারও।

কলকাতার প্রথম প্রোটেস্ট্যান্ট পাদরি এবং ওল্ড মিশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা জন জ্যাকারিয়া কিয়েরন্যান্ডার নামে এক সুইডিশ পাদরি এব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন রিডদের দিকে।

পাদরি কিয়েরন্যান্ডারের কথাটাই আগে সেরে নেওয়া ভাল। রবার্ট ক্লাইভের আমন্ত্রণে ১৭৫৮ সালে পাদরি কিয়েরন্যান্ডার মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসেন। তখন তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ামের ধর্মযাজক পদে নিয়োগ করা হয়।

কলকাতায় তখনও কোন স্থায়ী গির্জা ছিল না। অবস্থা দেখে কিয়েরন্যান্ডার নিজেই একটা গির্জা বানানোর উদ্যোগ নেন। তারজন্য তিনি নিজে ৮ হাজার পাউন্ড এবং তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী নিজের গয়না দান করেন। এইভাবে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ওল্ড মিশন চার্চের শিলান্যাস হয় এবং ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে গির্জার কাজ শেষ হয়। পাদরি এই গির্জার নাম দেন বেথটেফিলিয়া—দি হাউস অব প্রেয়ার।

পাদরির সঙ্গে হিকির সংঘাতটা বাধে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে। হিকি তখন দেনার দায়ে জেলে। জেলে বসেই ছাপার কাজ তিনি শুরু করে দেন। ওই সময় পাদরি তাঁর কাছে যান একটি খৃষ্টীয় পঞ্জিকা ছাপানর দরদাম জানতে। হিকি প্রতিটি পঞ্জিকা ছাপার জন্য এক টাকা করে চান। পাদরি সব শুনে চলে যান। কিছুদিন পরেই হিকি দেখেন, পাদরি অন্য জায়গায় পঞ্জিকা ছাপিয়ে তিনটাকা করে বিক্রি করছে। হিকি একটু তিরিক্ষি মেজাজের মানুষ চিরকালই। পাদরি তাঁকে না জানিয়ে অন্য জায়গায় পঞ্জিকা ছাপানোতেই চটে গেলেন তিনি। পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হিকি নিজেই পঞ্জিকা ছাপিয়ে একটাকা দরে বেচতে থাকেন। পাদরিও খুব একটা সহজ মানুষ ছিল না। হিকিকে জব্দ করতে এবার

বিনা পয়সায় পঞ্জিকা বিলোতে থাকল পাদরি। ফলে হিকির সঙ্গে সেই থেকেই শুরু হয়ে গেল একটা রেষারেষি।

ব্যাপারটা চরমে উঠল পাদরি কিয়েরন্যান্ডার যখন খৃষ্টবাণী, বাইবেল ইত্যাদি ছাপানোর জন্য লন্ডন গসপেল সোসাইটির কাছ থেকে পাওয়া টাইপ এবং ছাপার সাজসরঞ্জাম রিডদের বিক্রি করে দিলেন তখনই। হিকি ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁর গেজেটের দশম সংখ্যায় পাদরির এই কাজের সমালোচনা করে সরাসরি লিখলেন, "ক্যাপ্টেন গ্রিফিথ কি পরিমাণ সম্পত্তি সোসাইটির জন্য পাদরি কিয়েরন্যান্ডারের হাতে দিয়েছেন তা নিয়ে হিকি কোন প্রশ্ন করছেন না, এই গির্জা তৈরির জন্য ইংলণ্ডের একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি কত টাকা পেয়েছেন তা নিয়েও হিকি কোন কথা বলছেন না, কোন্ অধিকার বলে তিনি সেসব সম্পত্তি গবর্নর এবং কাউন্সিল অব বেঙ্গলকে বিক্রি বা ভাড়া দিলেন তা নিয়েও হিকি কিছু বলছেন না, ধর্মাত্মা পাদরির কাছে হিকির একটাই প্রশ্ন, ক্যাপ্টেন গ্রিফিথ যে কাজের জন্য তাঁর বিরাট সম্পত্তি দান করে গেছেন তার উপস্বত্ব কি অনাথদের এবং সেই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য নয়?"

গেজেটে এ খবর ছাপার পর পাদরি অবশ্য চুপ করে থাকলেন না। সম্ভবত হেস্টিংসের পরামর্শ মতই তিনি একটি মানহানির মামলা আনলেন হিকির বিরুদ্ধে।

ফেরা যাক আগের কথায়, রিডদের ইণ্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। আর নবেম্বর মাসেই হিকির কাছ থেকে ডাকে কাগজ পাঠানোর সুযোগটা কেড়ে নেওয়া হল। হিকি তাতে দমলেন না। তাঁর পাঠকসংখ্যা আগের চেয়ে কমে যাওয়াতে আর্থিক ক্ষতি যেটা হল তা মেনে নিয়েই তিনি কাগজ বিলির জন্য ২০ জন 'হরকরা' নিয়োগ করলেন। ওইসঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'যদি তাঁকে হোমারের মত ছোট ছোট গাথা রচনা করে কলকাতার রাস্তায় বিক্রি করে বেড়াতে হয়, তবুও তিনি সরকারের অন্যায় কাজের বিরোধিতা করা বন্ধ করবেন না।'

হিকির সন্দেহ, শুধু ডাকের সুযোগ কেড়ে নিয়েই নয়, অন্যভাবেও তাঁকে উৎখাত করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন হেস্টিংস। তাঁর এই সন্দেহ বা আশঙ্কার কারণ, কুটে যখন তাঁকে সামরিক বিধি ছাপার কাজ দেন সেসময় ছাপার কাজ জানা টমাস জোনস নামে এক গোলন্দাজের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু ইণ্ডিয়া গেজেট বের করার তোড়জোড় শেষ হতেই সরকার থেকে বলা হয়, জোনসকে আর ছাড়া যায় না।

এই রকম নানা ভাবে হিকিকে জব্দ করার জাল যতই বিস্তৃত হতে থাকল, হিকিও ততই বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। তাঁর সন্দেহ, এসবই করছে হেস্টিংস আর হিকির প্রতিপক্ষরা। শ্রীমতী হেস্টিংসকে তোষামোদ করেই তারা বাগিয়ে নিচ্ছে কাজ। মরিয়া হিকি তাই এবার শুধু হেস্টিংস নয়, শ্রীমতী হেস্টিংসের বিরুদ্ধেও তুললেন সমালোচনার ঝড়। তিনি লিখলেন,—"সেই সহৃদয়া মহিলার কথা যা শুনেছি, তাতে তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান রেখেই বলছি, তাঁর উদার স্বভাবের সুযোগ নিয়ে যদি তাঁর স্বামীকে প্রভাবিত করে আমাকে কোন সুযোগ দিতে বলি এবং তাঁর স্বামীও স্ত্রীর প্রতি অসন্দিগ্ধ ভালবাসায় অভিভূত হয়ে তাঁর অন্যায় অনুরোধ মেনে নেন—তবে সেটা খুব সুখের হবে না……।"

কলকাতার মানুষ ১৭৮০ সালের অক্টোবরে হিকির গেজেটে খবরের এই অংশটা দেখেই টানটান হয়ে বসল। তাদের বুঝতে এতটুকু দেরি হল না—যে এই উদারহৃদয়া মহিলা হলেন শ্রীমতী হেস্টিংস, যার প্রতি হেস্টিংসের অসম্ভব দুর্বলতার কথা কলকাতার ইউরোপীয় সমাজের কারোর অজানা নয়।

স্ত্রীর প্রতি এই আক্রমণে হেস্টিংস যখন আরও প্রতিহিংসাপরায়ণ, হিকি তখন নাটকীয়ভাবে তাঁর গেজেটের প্রথম বছরের ৪৩ সংখ্যায় লিখলেন,—

"কাগজের জন্য তাঁর এখন তিনটি জিনিস হারাবার আছে। সে তিনটি জিনিস হল তাঁর সম্মান, তাঁর স্বাধীনতা এবং তাঁর জীবন। প্রথমটির জন্য তিনি পরের দুটিকে হারাতে রাজি আছেন। তাঁকে অন্যায়ভাবে

আটক রেখেও তাঁর ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত করে, সন্ত্রাস, অত্যাচার চালিয়েও তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না।··· তাঁর যে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষমতা আছে তা কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বা তার প্রভু সম্রাটও তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কোম্পানি বা তার কর্মচারীদের এমন ক্ষমতা দেওয়াটা বৃটিশ সম্রাটের অভিপ্রেতও নয়।"

হিকি তাঁর গেজেটে এরপর থেকেই হেস্টিংস, ইম্পে, কর্নেল পিয়ার্স, সিমন ড্রোজ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরাসরি লিখতে থাকলেন। তাঁর আক্রমণের আঘাতটা বেশি করে পড়তে থাকল শ্রীমতী হেস্টিংসের ওপর। আর তাতেই কিছুটা পত্নীপ্রেমেবশংবদ হেস্টিংস মামলা আনলেন হিকির নামে।

১৭৮১ খৃস্টাব্দের ১২ জুন। হিকি জানালা দিয়ে যা দেখলেন তা প্রকাশিত হল বেঙ্গল গেজেটের ওই বছরের ২১ সংখ্যায়। হিকি দেখলেন,—

"তাঁর বাড়ি ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু ইউরোপীয় সঙ্গে রয়েছে তিন থেকে চার শ' সিপাই এবং পিয়ন। হিকি জানতে চাইলেন—কি চায় তারা? তারা বলল, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাদের পাঠিয়েছেন। হিকির নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হবে প্রধান বিচারপতির কাছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছেন স্বয়ং গবর্নর জেনারেল।"

হিকি কায়দা করে গ্রেপ্তার এড়ালেন। পরদিন আত্মসমর্পণ করলেন তিনি আদালতে। বিচারপতিরা তাঁকে জামিন না দিয়ে আদালত পরদিন পর্যন্ত মুলতুবি রাখলেন। দ্বিতীয়বার হিকি জেলে গেলেন।

মামলায় দুদফা অভিযোগের জন্য ৪০ হাজার টাকা করে মোট ৮০ হাজার টাকার জামিন দেওয়া হল তাঁকে।

অত টাকা কোথায় পাবেন তিনি। তাই জেলেই রইলেন।

মামলা চলতে থাকে। জুরিরা বারবার নির্দোষ বলতে থাকেন কিন্তু বিচারপতিরা খুশি হন না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের পছন্দ মত জুরি বসিয়ে হিকিকে দোষী ঘোষণা করা হল। শাস্তি এক বছর জেল—

দু'হাজার টাকা জরিমানা। হিকি কিন্তু জেল থেকেই চালাতে থাকলেন কাগজ। আক্রমণের ধার তাতে হল আরো তীক্ষ্ন।

একসময় ছাড়া পেলেন হিকি। কিন্তু সে আর ক'দিনের জন্য। হেস্টিংস তাঁর এই পরম সমালোচকটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আবার মামলা করলেন হিকির বিরুদ্ধে। এবার ক্ষতিপূরণের মামলা।

যে ইম্পেকে দিয়ে হেস্টিংস একদিন নন্দকুমারকে জালিয়াত প্রমাণিত করে ফাঁসিতে ঝোলাবার আদেশ জারি করিয়েছিলেন সেই ইম্পেকে দিয়েই কায়দা করে বিচার করালেন হেস্টিংস। শত্রুর মুখ বন্ধ করার জন্য হেস্টিংসের ইঙ্গিতেই ১৭৮২ সালের মার্চে প্রধান বিচারপতি ইম্পে বাজেয়াপ্ত করালেন হিকির প্রেস, ছাপার কাগজ, যন্ত্রপাতি সব কিছু। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হিকিকে তাঁরা করে দিলেন একবারে নিঃস্ব।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবারও চেষ্টা করেছিলেন হিকি।

কিন্তু না, আর পারলেন না। কাগজ বের করা আর সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে। এবার তিনি সরকারের কাছে সামরিক বিধি ছাপানোর জন্য বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন করলেন। অনেক যুক্তি, অনেক টালবাহানার পরও সরকারের কাছ থেকে টাকা পেলেন না হিকি।

জীবনধারণের জন্য এবার তিনি শুরু করলেন ডাক্তারি। চোখে স্বপ্ন, কিছু টাকা জমিয়ে তিনি ফিরে যাবেন তাঁর স্বাধীন দেশ বৃটেনে। বৃটেনে যাবার জন্যই তিনি রওনা হলেন চীনে আরো অর্থের সন্ধানে।

'জাগ্রত বিবেক' হিকির কিন্তু চীনেও যাওয়া হ'ল না। তার আগেই সাড়া জাগানো বহু বড় খবরের সাংবাদিক হিকি নিজেই হয়ে গেলেন সংবাদ। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেট' এ প্রকাশিত হ'ল একটি ছোট্ট খবর –'চীনে যাবার পথে সমুদ্রে জাহাজের মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন জেমস অগাস্টাস হিকি।' কলকাতার মানুষ আবার টানটান হ'ল—শ্রদ্ধায় উঠে দাঁড়িয়ে জানাল—শেষ শ্রদ্ধা।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দ। হিকির গেজেট বন্ধ হয়ে যাবার পর কেটে গেছে সাতটা বছর। এর মধ্যে সরাসরি সরকারি পোষকতায় প্রকাশিত হয়েছে 'ক্যালকাটা গেজেট', প্রকাশিত হয়েছে মাসিক ওরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অব ক্যালকাটা অ্যামিউজমেন্ট, ক্যালকাটা ক্রনিকল ইত্যাদি বেশ কয়েকখানা কাগজ। সরকারের বিরোধিতা করতে গেলে কি ফল হয় তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তখন রয়েছে এইসব কাগজের সম্পাদকদের সামনে। হিকির নাজেহাল অবস্থা দেখে এঁরা সবাই সংযত থাকবেন, সরকারের সব কাজেই 'সাধু' 'সাধু' রব তুলবেন এমন একটা আশা সরকারের ছিল। কিন্তু কথায় আছে চড়ুকে পিঠ, গাজনের বাজনা শুনলেই চড়চড় করে ওঠে, তেমনি কাগজের সম্পাদক হয়ে বসার পরই হিসেব-নিকেশ বদলে যায়। সম্পাদকরা নানা কারণেই অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর হন। ফলে সরকার বা রাজার সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হন তাঁরা। অসি বনাম মসির সে লড়াইয়ে নৈতিক জয়টা যেমন হয় সম্পাদকের তেমনি রাজার ক্ষমতার কামড়ে ক্ষতবিক্ষতও হতে হয় তাঁদের। হিকির পর সরকারের হায়না মুখের কামড়ে এমনি ভাবে আক্রান্ত হন উইলিয়াম ডুয়েন।

ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে আরেক উল্লেখ্য নাম উইলিয়াম ডুয়েন। জাতে মার্কিন আইরিশ। পেশায় মুদ্রাকর। ভাগ্যের সন্ধানেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে বেসরকারিভাবেই এসেছিলেন ভারতে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে।

ডুয়েন ছাপাখানার কারবার শুরু করলেন। কিন্তু সে কারবারের চেয়েও তাঁর নজরটা পড়ল খবরের কাগজ বার করার দিকে। ভারতের তখনকার চারদিকের অবস্থা দেখে তাঁর মনে হল খবরের কাগজের চেয়ে ভাল ব্যবসা বোধ হয় আর নেই। কিছুদিন আগেই হিকির কি হেনস্থা

হয়েছে তা তিনি শুনেছেন এখানকার অনেক ইউরোপীয়ের মুখেই। তবু খবরের কাগজ বের করার ইচ্ছেটাকে মুছে ফেলতে পারলেন না তিনি। ডুয়েনের ইচ্ছেটাকে আরো বেশি উসকে দিল তাঁর দুই আইনজীবী বন্ধু ডিমকিন এবং কাস্যান। তাঁরা তিনজন মিলে কিনে নিলেন 'বেঙ্গল জার্নাল' নামে তখনকার দিনে মোটামুটি চালু একটি কাগজকে। নতুন ব্যবস্থায় কাগজের সম্পাদক হলেন ডুয়েন।

'বেঙ্গল জার্নাল' কাগজটা বের করেছিলেন টমাস জোনস নামে এক ভদ্রলোক। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় কাগজটি। তার ঠিক একবছর আগে, বলতে গেলে সরকারই প্রকাশ করেছেন ক্যালকাটা গেজেট। সেই কাগজ দেখেই বোধ হয় অনুপ্রাণিত হন জোনস। হিকির হাল তিনি চোখের সামনে দেখেছিলেন, তার ওপর সরকারি দাক্ষিণ্যলাভের একটা ইচ্ছে তাঁর মনটাকে ঢেকে রেখেছিল। তাই কাগজ বের করতে গিয়ে তিনি প্রথমেই বিনা পয়সায় সরকারি বিজ্ঞাপন ছাপার সিদ্ধান্ত নিলেন। বলতে গেলে সরকারি খয়েরখাঁর কাগজ হিসেবেই আত্মপ্রকাশ ঘটল সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট'এর। কিন্তু সরকারের একবারে পা-চাটা কাগজকে লোকে তেমন ভালভাবে নিল না। সরকারি দাক্ষিণ্যে বাণিজ্য চললেও জন-সমর্থন যে পাওয়া যায় না, তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন জোনস। তবু কাগজ তিনি চালিয়ে যেতে থাকলেন। কয়েক বছর বাদেই জোনস কিন্তু দেখলেন, সাধারণের কাছ থেকে সম্মান তো জুটছেই না, বরং বাণিজ্যের পথটাও কেমন যেন বন্ধ হয়ে আসছে। কাগজ নিয়ে কি করবেন—এটাই যখন জোনসের ভাবনা, সেই সময়ই ডুয়েন নতুন একটা কাগজ বের করার স্বপ্নে বিভোর। ফলে জোনসের সঙ্গে ডুয়েনের যোগাযোগ হতে দেরি হল না। ডুয়েনকে পেয়ে তাঁর ওপর কাগজের ভার তাড়াতাড়ি তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইলেন জোনস। আর এই দু'পক্ষের চাওয়ার ফল ফলতে দেরি হল না। বেঙ্গল জার্নালের মালিক হলেন ডুয়েন এবং তাঁর দুই বন্ধু। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে বেঙ্গল জার্নাল প্রকাশিত হতে থাকল ডুয়েনের সম্পাদনায়।

প্রথমটায় ডুয়েন মোটামুটি সংযতই ছিলেন। সরকারের সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষে যাওয়ার ইচ্ছেও ছিল না তাঁর। কিন্তু বিধি বাম। একটা খবর ছেপেই সরকারের বিষ নজরে পড়ে গেলেন তিনি। অনেকে বলেন, সে খবর ছাপার পেছনে কোন বদ মতলব ছিল না ডুয়েনের, অন্যদল কিন্তু জোর দিয়ে বলেন, সরকারকে হেয় করতে, ইচ্ছে করেই তিনি ছেপেছেন খবরটা।

১৭৯১ খৃস্টাব্দ। লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে চলছে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। এমনই সময় 'বেঙ্গল জার্নালে' বেরুল খবরটা—'লর্ড কর্নওয়ালিস নিহত'। খবরটা পড়েই কলকাতার ইংরেজ মহলে উঠল 'হায়, হায়' শব্দ। ভারতে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম করা প্রায় দুরাশা এমন একটা হতাশা চেপে বসল তাদের ওপর।

খবরটা সত্যি, না মিথ্যে তা যাচাই করার কথা কিন্তু ভাবলেন না ইউরোপীয়রা। তার কারণ, 'বেঙ্গল জার্নাল' খবরটি প্রকাশ করেছে এক বিশিষ্ট ফরাসির নাম করে। ইউরোপীয়রা ধরে নিলেন, একজন বিশিষ্ট ফরাসি কিছুতেই মিথ্যে করে এমন খবর দেবেন না। ফলে কলকাতার বৃটিশদের মধ্যে যেমন দেখা গেল উত্তেজনা তেমনই হতাশা।

খবরটি প্রকাশ পাওয়ার পরই কিন্তু এল প্রতিবাদ। প্রতিবাদ করলেন অন্য কেউ নয়, স্বয়ং কর্নেল ডি ক্যানপেল। ভারতে ফরাসি দেশের স্বার্থ দেখার জন্য যে কম্যান্ডার ছিলেন, কর্নেল ক্যানপেল হলেন সেই কম্যান্ডার। তিনি বললেন, বেঙ্গল জার্নালের খবরটি ডাহা মিথ্যে। ওই বিশিষ্ট ফরাসি ভদ্রলোক কখনই ওকথা বলেননি।

ওদিকে ততক্ষণে ফোর্ট উইলিয়ামে খবর এসে গেছে, লর্ড কর্নওয়ালিস বহাল তবিয়তে আছেন। মারাঠাদের সঙ্গে সংঘর্ষে এগিয়ে রয়েছে বৃটিশ বাহিনীই এবং খুব শিগগিরই হয়ত মারাঠা বাহিনী হার স্বীকার কিংবা সন্ধি করতে বাধ্য হবে। সব খবর পেয়ে গবর্নর হাউসে সরকার বাহাদুরও নড়ে চড়ে বসলেন। ফরমান গেল ডুয়েনের কাছে, লর্ড কর্নওয়ালিসের মৃত্যুর খবর ছাপার জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাও।

ফরমানটা পেয়েই কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে গেল ডুয়েনের। হিকির মতই ডুয়েনও একজন আইরিশম্যান। এক ধরনের গোঁ আর তার সঙ্গে আবেগ, এটা যেন তাঁদের সহজাত। এর জন্য অনেকে ক্ষ্যাপাটেও বলে থাকেন তাঁদের। যাই হোক, ক্ষ্যাপামি বললে, সেই ক্ষ্যাপামির বীজটাই বোধ হয় অঙ্কুরিত হল ডুয়েনের মনে। তিনি বললেন, কভি নেহি। যা লিখেছি—ঠিক লিখেছি। এর জন্য আবার ক্ষমা কিসের?

সরকার বাহাদুরও চোখ পাকিয়ে বলল, কি এত বড় দুঃসাহস। আমাদের আদেশ অমান্য করা! এবার দেখাচ্ছি বাছাধন, কত ধানে কত চাল। তোমার মত এক আইরিশ হিকিকে শায়েস্তা করেছি, এবার টিট করছি তোমাকেও। ডুয়েনও সমানভাবেই তাল ঠুকছেন, দেখি কার জোর বেশি। যা সত্য বলে জেনেছি তা ছেপেছি, তার জন্য আবার ক্ষমা প্রার্থনা কিসের? দেখি তোমরা কি করতে পার।

অসি-মসির লড়াইয়ে ক্ষমতাটা সরকারেরই বেশি। তাই অন্য কিছু নয়, ডুয়েনকে ভারত থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত একরকম নিয়েই ফেলল সরকার। কিন্তু ডুয়েনের ভাগ্যে লেখা আছে অন্য ব্যাপার, তাই সরকার বহিষ্কারের উদ্যোগ নিলে কি হবে, বাদ সাধলেন ভারতের ফরাসি এজেন্ট। বঙ্গদেশের সরকারকে তিনি জানালেন অভিযোগকারী কর্নেল ক্যানপেল মারা গেছেন, তাই ওই ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা আর কোন ঝামেলা করতে চান না।

ফরাসি এজেন্টের হস্তক্ষেপে বঙ্গদেশের সরকার ডুয়েনকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তটা বদলালেন। ডুয়েন ভারতেই রয়ে গেলেন। কিন্তু সম্পাদকের পদ তাঁকে হারাতে হল। বেঙ্গল জার্নালের আর দুই মালিক ডিমকিন এবং কাস্যান বললেন, ঢের হয়েছে, তুমি নিজে তো ডুবছই, সেই সঙ্গে আমাদেরও ডোবাতে বসেছ। দোহাই তোমার, এবার ক্ষ্যামা দাও, আমরা অন্য কাউকে সম্পাদক করছি।

ডুয়েন বললেন, ভীরু কাপুরুষের দল, বয়েই গেছে আমার তোমাদের

কাগজের সম্পাদক থাকতে। তোমরা আমায় সরাবে কি, আমিই ইস্তফা দিচ্ছি কাগজ থেকে।

বেঙ্গল জার্নাল-এর সম্পাদকের পদ খোয়ালেন ডুয়েন। কিন্তু পদ খুইয়ে চুপ থাকার মানুষ তিনি নন। বিশেষ করে সরকার যখন তাঁর পেছনে লেগেছে, তখন তাদের উচিত শিক্ষা তিনি আগে দেবেন তারপর অন্য কথা।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দেই ডুয়েন বের করলেন ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড। এবার আর ভাগে নয়, পুরোপুরি নিজেই মালিক, নিজেই সম্পাদক। এবার আর কোন ভয় নয়, নিজের কাজের জন্য আর কাউকে কৈফিয়ৎ দেবার ঝামেলা নেই। ডুয়েন চুটিয়ে কাগজ চালাতে লাগলেন। কাগজের প্রচারসংখ্যা বাড়তে থাকল হু হু করে। টাটকা খবর তো তাতে থাকতোই, তার চেয়েও বেশি থাকত সরকারের সমালোচনা, আমলাদের যথেচ্ছাচারের কথা। ফলে ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড যত সকলের নজর কাড়তে থাকল, ডুয়েন ততই সরকারের বিষনজরে পড়তে থাকলেন। তাঁকে জব্দ করার জন্য নিত্য নতুন ফন্দি আঁটতে থাকল সরকার।

হাতে না মেরে ভাতে মারার পথ নিল তখনকার সরকার বাহাদুর। যে কোন কাগজেরই মূল আয়টা বিজ্ঞাপন আর বিক্রি থেকে। সরকার থেকে তাই 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড'এর বিজ্ঞাপনদাতা আর ক্রেতাদের ওপর চাপ দেওয়া হতে থাকল, বয়কট করুন এই কাগজ।

ডুয়েন ব্যাপারটা জানতে পারলেন। বৃটিশ সেনাবাহিনীতে তখন তাঁরও জানাশোনা লোক ছিল প্রচুর। তাঁদের মধ্যে অনেকে ডুয়েনকে ভালও বাসতেন, জোগান দিতেন খবরও। তাঁরাই বললেন, ডর মৎ বন্ধু, আমরা দেখছি কি করা যায়। তা কথা রেখেছিলেন তাঁরা। তাঁদের পাল্টা চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন সরকার বাহাদুর। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড বয়কটের ডাক তাঁরা একরকম তুলেই নিলেন।

মনে হল এবার বোধ হয় ডুয়েনের সামনে ভাল সময় আসছে।

কিন্তু সরকার তখন ঘা-খাওয়া বাঘ। সেনাবাহিনীর চাপে ডুয়েনের কাগজের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাক তুলে নিলেও তাঁরা অন্য অভিযোগে একদিন গ্রেপ্তার করলেন ডুয়েনকে। সেটা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা। একবার নয়, দু' দুবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁর বাড়িতে হানা দিল পুলিশ। দুবার তল্লাসি চলল সেখানে প্রায় বিনা কারণেই।

সুপ্রিম কোর্টের এই গা-জোয়ারি কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন ডুয়েন। তিনি এবার সরাসরি দেখা করতে চাইলেন গবর্নর জেনারেলের সঙ্গে।

ডুয়েনের কাজ-কারবার দেখে মনে মনে বোধহয় কিছুটা ভয় পেয়ে যান সরকার। তাই গবর্নর জেনারেল জন শোর মনে মনে অন্য মতলব আঁটলেন। তিনি ডুয়েনের দাবি মেনে নিয়ে বললেন, বেশতো দেখা করতে চান তো গবর্নর হাউসে চলে আসুন। সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে আপনার কি অভিযোগ আছে শুনি। তারপর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে এখন।

গবর্নর জেনারেল জন শোরের আমন্ত্রণ পেয়ে ডুয়েন ভারি খুশি। ভাবেন এবার সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল মিটিয়ে সব কিছু জানাবেন তাঁকে। কিন্তু ডুয়েন সেদিন জানতেন না, এসবই হচ্ছে খোয়াব। সরকার তাঁকে জব্দ করার জন্যই বেছে নিয়েছেন এই পথ।

খুশিতে ডগমগ ডুয়েন ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের রোদ ঝলমলে এক শীতের দুপুরে এলেন গবর্নর হাউসে জন শোরের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু গবর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল সেখানে। তারপর আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হল খিদিরপুরে। সেখানে ইংলণ্ডগামী একটি জাহাজে আটক রাখা হল তাঁকে। জাহাজ যখন ছাড়ল তখনও রইল রক্ষী। কড়া পাহারায় বিনাবিচারে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই ডুয়েনকে বহিষ্কার করা হল ভারত থেকে। তাঁর একমাত্র অপরাধ, সরকারের সঙ্গে আপস করেননি তিনি, কোন কারণেই

সরকারের সমালোচনা বন্ধ করেননি। ডুয়েনকে যখন ভারত থেকে বহিষ্কার করা হল তখনও ভারতে ছিল তাঁর ৩০ হাজার টাকার সম্পত্তি। কিন্তু যেমন বিনাবিচারে তাঁকে ভারতছাড়া করা হল, তেমনই ওই সম্পত্তির জন্যও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটা কানাকড়িও দিল না ক্ষতিপূরণ হিসেবে।

ডুয়েনকে এইভাবে বহিষ্কার করায় বেশ মৃদুমন্দ একটা ঝড় উঠল। বিশেষ করে দেখা করার নামে ডেকে গ্রেপ্তার করাটা অনেকেই পছন্দ করলেন না। ইংলণ্ডে কোম্পানির ডিরেকটর মহলেও ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা উঠল। ব্যাপার দেখে গবর্নর জেনারেল জন শোর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর বোর্ড অব কনট্রোলের সভাপতি মিঃ ডানডাস-কে একটা চিঠি লিখে বললেন, 'কলকাতার খবরের কাগজগুলো যেমন লাগামছাড়া বদমাইসি করছে তাতে এগুলোকে আর এদেশে প্রকাশ হতে দেওয়া উচিত নয়। বাধ্য হয়েই তিনি উইলিয়াম ডুয়েন নামে এক সম্পাদককে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' সুপ্রিম কোর্টও এই বহিষ্কারটাকে সমর্থন করল। সরকারের সমালোচনা করলেই তাকে ভারত থেকে বহিষ্কার করার নজির হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল এটি।

ডুয়েন ইংলণ্ডে এসেও ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। কিন্তু সব মিলিয়ে তেমন সুবিধে তিনি এখানে করতে পারলেন না। তাছাড়া—সাংবাদিক এবং সম্পাদক হিসেবে কাজ করার, ক্ষমতার কেন্দ্রকে নাড়া দেবার যে ইচ্ছেটা সব সময়ই তাঁর মধ্যে টগবগ করে ফুটত সেটা সফল হবার তেমন সম্ভাবনা ইংলণ্ডে নেই দেখে ডুয়েন একদিন পাড়ি দিলেন আমেরিকায়। অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু ডুয়েনের নাম শোনা যেতে লাগল অনেকেরই মুখে। ফিলাডেলফিয়ার এক কাগজের সম্পাদক হিসেবে ডুয়েন প্রায় রাতারাতি খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। এবং খ্যাতির শিখরে থাকতে থাকতেই জীবনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে ডুয়েন লোকান্তরিত হলেন। কিন্তু হিকির পথ ধরে ভারতবর্ষে সাংবাদিকতার যে ধারণাটা তিনি তৈরি করেছিলেন তা

যেমন একইভাবে বইতে থাকে তেমনি মার্কিন সাংবাদিকতার ইতিহাসেও ঠাঁই করে নেন তিনি অনায়াসেই।

তবে তখন সবাই যে হিকি-ডুয়েনের পথ ধরে সরকারী দুর্নীতি বা অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন একথা ভাবা কিন্তু ভুল। বরং অনেক সম্পাদকই সমঝোতার পথে আখের গুছিয়ে নেবার ফটকাবাজিতে মাতেন।

কিন্তু সবদেশে সবসময়ই কিছু দুঃসাহসী থাকেন, তাঁদের জন্যই তৈরি হয় ইতিহাস। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রশাসন বিশেষ করে সেনাবাহিনীর অসন্তোষ, দুর্নীতি এবং বৈষম্য নিয়ে বেশ কিছু খবর বেরুতে থাকে কাগজে। ব্যাপারটা ছিল সরকারের সম্পূর্ণভাবেই না-বরদাস্ত। আর সেটাই স্বাভাবিক।

ভারতে বৃটিশ শাসন তখন সর্বত্র কায়েম হয়নি। যেসব অঞ্চল বৃটিশ অধিকারে এসেছে, সেখানেও শক্তভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগটাও তখন অনেক কম। তাই প্রশাসনকে বেশিরভাগ সময়ই নির্ভর করতে হত সেনাবাহিনীর ওপর। সেই সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিরূপ খবর বেরুলে সরকার বাহাদুর যে খাপ্পা হবেন এটাতো জানা কথাই।

জানা থাকলেও গরম খবরের খোঁজ পেলে কোন সময়ই সাংবাদিকরা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। তার ওপর সেসব গরম খবর পাঠকদের হাতে দেওয়া মাত্র গরম তেলেভাজার মত কাগজ বিকুচ্ছে দেখে সংবাদপত্রগুলো বাণিজ্য করার লোভটাকে ঠেকাতে পারত না। আসলে তখন ইউরোপ থেকে সবাই ভারতে আসত বাণিজ্য করতে। লাভের কড়ি গুছিয়ে নিয়ে দেশে পায়ের ওপর পা তুলে জমিদারি চালানোর স্বপ্ন নিয়ে সবাই আসত ভারতে। তখনকার সংবাদপত্রের মালিকরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাই সেনাবাহিনীর খবর ছাপার ব্যাপারে কোনরকম নীতি বা শাসনের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা এসব ছাপাতেন। তা নিয়ে সম্পাদকদের ঝামেলায় মধ্যেও পড়তে হত প্রায়ই।

কিন্তু পয়সার লোভটা এমনই ব্যাপার যার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতেই রাজি হয়ে যান এসব সংবাদপত্রের মালিক। নীতি, আদর্শ নয়, তাঁরা বুঝতেন টাকা। তাই সরকারি দণ্ডের ভয় না করে যেমন ছাপতেন খবর, তেমনি ফাঁপরে পড়লেই নীতিকে শিকেয় তুলে চেয়ে নিতেন ক্ষমা। ১৭৯১ থেকে ১৭৯৮ খৃঃ পর্যন্ত চলতে থাকে এটা। ব্যাপারটা যেন বাচ্চাদের চোর-চোর খেলার মত, ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখলেই 'আব্বা' দেওয়া অথবা বুড়িকে ছুঁয়ে রেহাই পাওয়া। সরকার ব্যাপারটা যে না বুঝতেন তা নয়, তবে যে কোন কারণেই হোক ১৭৯৮ খৃস্টাব্দের আগে এব্যাপারে তেমন বাড়াবাড়ি কিছু তাঁরা করেননি।

১৭৯৮ খৃস্টাব্দে ভারতে গবর্নর জেনারেল হয়ে এলেন মার্কুইস অব ওয়েলেসলি। ৩৭ বছরের রক্ত গরম টগবগে যুবক। ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরদের কোন রকম তোয়াক্কা না করেই ওয়েলেসলি ভারত শাসন করে গেছেন। ভারত শাসনের সেই সময়টাতে ওয়েলেসলি আদৌ যদি বোর্ড অব ডাইরেক্টর অথবা বৃটিশ পার্লামেন্টের কথা ভেবে থাকেন, তাহলে ভেবেছেন ওঁরা শুধুই দর্শক। দুচোখ মেলে তাঁর শাসনের বহরটা দেখাই তাঁদের কাজ। বৃটিশ সংসদ অথবা কোম্পানির ডাইরেক্টরদের প্রতি এই তীব্র বিদ্বেষ, অবিশ্বাস—এদেশের লোকদের পক্ষে হয়ত কিছুটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু ওয়েলেসলি শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন কড়া হেডমাস্টার। পান থেকে চুন খসলেই হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিতেন [illegible]। অথচ মানবিকতাবোধটাও তাঁর মধ্যে ক্রিয়া করত তীব্র ভাবেই।

এই মানবিকতাবোধই তাঁকে 'সাগরসঙ্গমে সন্তান বিসর্জন' দেওয়ার বা 'সতী' হওয়ার ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সক্রিয় করে। ওই সঙ্গে ফৌজদারি আইনে যেসব কঠোর শাস্তি দেবার বিধি ছিল তার কয়েকটাকে তিনি বাতিলও করেন। তা-বলে ভাবার কোন কারণ নেই যে ভারতীয়দের জন্য তিনি একবারে গদ-গদ হয়ে উঠেছিলেন। বরং

ভারতে যে সামরিক শাসনের পত্তন তিনি করে যান তা ৩৭ বছর চালু থাকে। সেটা যে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি তা নতুন করে বলার দরকার নেই।

বিচিত্র মানুষ এই ওয়েলেসলি। ভারতীয়দের কতকগুলো কুসংস্কার এবং কু-প্রথা দূর করার জন্য সক্রিয় হলেও বৃটিশ শাসনকে জোরদার করাতেই যেমন তিনি ছিলেন তৎপর, তেমনি ভারতে যেসব ইউরোপীয় থাকতেন তাঁদের সম্পর্কেও কোন উঁচু ধারণা ছিল না তাঁর। ভারতের জীবন সম্পর্কে বন্ধুকে চিঠি লিখছেন ওয়েলেসলি, "সন্ধ্যেবেলাটা আমাকে হয় আমার প্রজাদের সঙ্গে অথবা একা একা কাটাতে হয়। প্রথম দল এত অশ্লীল, অজ্ঞ, নির্বোধ যে তাদের সঙ্গে গল্প করার কথা প্রায় ভাবাই যায় না—মহিলারা তো যেমন কুদর্শনা তেমনি কথা বলার অযোগ্য।……আমার অবস্থাটা রয়েল টাইগারের মত। আমার চিন্তার ভাগ নেবার মত একটা বন্ধু শিয়াল পর্যন্ত আমি খুঁজে পাচ্ছি না।" ওয়েলেসলি তাঁর পূর্বতন গবর্নর জেনারেল জন শোর সম্পর্কেও বলেছেন নিম্নকুলোদ্ভব, প্রাচ্যদেশের ভাবধারায় মানুষ, কোম্পানির সাধারণ চাকরি করার মত শিক্ষার অধিকারী ওই লোকটাকে গবর্নর জেনারেল করাটাই হয়েছে মস্ত বোকামি। ওয়েলেসলি বারবারই ভারতে বসবাসকারী ইউ-রোপীয়দের আগাগোড়া সংস্কার করার কথা বলেছেন। ওয়েলেসলির আশংকা ছিল কলকাতার এই সব ইউরোপীয়কে ঠিক ঠিক সংশোধন করতে না পারলে এরা সরকারের পতন না ঘটালেও সরকারের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠবে।

ভারত বা ভারতে আসা ইউরোপীয়দের সম্পর্কে এমন ধারণা যাঁর তিনি যে ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিকে খুব সুনজরে দেখবেন এমন ভাবটা কিছুটা দুরাশাই। সেজন্যই ওয়েলেসলির আমলটা সংবাদপত্রের সম্পাদকদের কাছে খুব একটা সুখের সময় হয়ে ওঠেনি। ওয়েলেসলির শাসন এবং বৃটিশ সরকারের এই নীতির প্রথম বলি হলেন ডঃ চার্লস ম্যাকলিন। ভারত থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হল কোনরকম

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই। তার আগের কয়েক বছর ধরে ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সাংবাদিকরা যে সুযোগ ভোগ করছিলেন---তার অবসান ঘটল। বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ওপর আবার খড়্গহস্ত হলেন সরকার বাহাদুর। ওয়েলেসলির আমলের সরকারের শ্লোগান হল—ক্ষমা নয়. সমঝোতা নয়—শাসন—কড়া শাসন।

ডঃ চার্লস ম্যাকলিন ছিলেন সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল হরকারু'র সঙ্গে যুক্ত। সরকারের কতকগুলি অনুচিত কাজের প্রতিবাদ করে সরকারের বিষ নজরে পড়লেন তিনি। শুরু হল তাঁর সঙ্গে সরকারের সংঘাত। সরকার নানাভাবে জব্দ করতে চাইলেন ডঃ ম্যাকলিনকে।

ম্যাকলিনের নামে যেসব চিঠিপত্র আসত ডাকঘর কর্তৃপক্ষ তার অনেকগুলি খুলে দেখতে লাগলেন। ম্যাকলিন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই চটে গেলেন। বেঙ্গল হরকারুতে এসম্পর্কে কিছু না লিখে তিনি হল্ট ম্যাকনলি সম্পাদিত 'টেলিগ্রাফ' কাগজে লিখলেন, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র খুলে দেখার কোন অধিকার পোস্টমাষ্টার জেনারেলের নেই, ব্যক্তিগত চিঠি খুলে দেখে তিনি অন্যায় করছেন। নিজের নামেই তিনি টেলিগ্রাফে আরেকটি চিঠিতে গাজিপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণ সম্পর্কেও কড়া ভাষায় একটা সমালোচনা লিখলেন। সে সমালোচনা দেখে রেগেমেগে সরকার টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার হুমকি দিলে পত্রিকার সম্পাদক ম্যাকনলি ক্ষমা চেয়ে নিলেন কিন্তু ম্যাকলিন বললেন, তিনি যা লিখেছেন, ঠিকই লিখেছেন, এনিয়ে তিনি কারো কাছে ক্ষমা চাইবেন না।

কথাটা শোনামাত্র সরকার ফুঁসে উঠল, কি, এতবড় সাহস সামান্য একজন সাংবাদিকের। এইসব বেয়াদপ সাংবাদিককে শায়েস্তা করার অস্ত্রটা সরকারের হাতে ভালই ছিল। ম্যাকলিনের ভারতে আসার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন কোনরকম বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই ম্যাকলিন ভারতে এসেছেন। তথ্যটা পেয়েই একবারে 'ইউরেকা' বলে হাঁক ছাড়ার মত অবস্থা সরকারের। ম্যাকলিনকে তাঁরা

বহিষ্কার করলেন ভারত থেকে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব ডিরেক্টর বাংলাদেশ সরকারের এই কাজের ওপর তাঁদের সমর্থনের শিলমোহরটা মেরে দিলেন—ওইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন বেয়াদপ সমালোচকদের টিট করার সহজ রাস্তা এটাই।

ম্যাকলিনকে ভারত থেকে বহিষ্কারের নির্দেশটা দেন ওয়েলেসলি। নির্দেশে বলা হয়, ম্যাকলিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে ন্যায়াধিশালয়ের কাজের সমালোচনা করেছেন, ক্ষমতা মোতাবেক এক সরকারি অফিসার যে কাজ করেছেন তার নিন্দা করেছেন। এরকম বিপজ্জনক ব্যক্তিকে আর ভারতে রাখা চলে না—ওকে বহিষ্কার করাটাই সবচেয়ে কম শাস্তি এবং সেই শাস্তিই ম্যাকলিনকে দেওয়া হল। ডঃ ম্যাকলিন কিন্তু ইংলণ্ডে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন না বরং ওয়েলেসলির বিরুদ্ধে তিনি এমন আন্দোলন গড়ে তুললেন যে ওয়েলেসলি শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সে অবশ্য ভিন্ন কাহিনী।

এদিকে ম্যাকলিনকে বহিষ্কার করার প্রায় পরে পরেই 'এশিয়াটিক মিরর' নামে সাপ্তাহিকের সম্পাদক চার্লস কে ব্রুস এমন একটি লেখা ছাপলেন যাতে ওয়েলেসলি আরো খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ওয়েলেসলি তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, সেসময় তাঁকে যে শুধু মহীশুরের টিপু সুলতান বা প্রতিপক্ষ ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে তা নয়, তাঁকে কলকাতার ইউরোপীয়দের সঙ্গেও লড়াই করতে হয়েছে একই ভাবে। কলকাতার ইউরোপীয়দের সম্পর্কে এই ধারণার সমর্থনেই ওয়েলেসলি 'এশিয়াটিক মিরর'-এর ওই খবরটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। চার্লস 'এশিয়াটিক মিররে' ইউরোপীয় এবং ভারতীয় জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দিয়ে টিপুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সেনার একটা হিসেব দিয়ে এই লড়াইয়ের যৌক্তিকতা নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। খবরটি দেখেই কম্যাণ্ডার ইন চিফ স্যর অ্যালুর্ড ক্লার্ক-কে এক চিঠিতে ওয়েলেসলি লেখেন, "এই সম্পাদকের জাতকে টিট করতে আমি প্রথম সুযোগেই কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দেব। এর মধ্যে তুমি যদি এইসব

সম্পাদককে চুপ করাতে না পার তাহলে জোর করে তাদের কাগজ বন্ধ করে দেওয়া এবং তাদের ইংলণ্ডে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়াটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।”

কথায় এবং কাজে ওয়েলেসলি যে খুব একটা আলাদা মানুষ ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া গেল এটা লেখার এক মাসের মধ্যেই। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসেই সংবাদপত্র দমনে ওয়েলেসলি জারি করলেন পাঁচটি কুখ্যাত নির্দেশ। ওই পাঁচটি নির্দেশ হল—

১। প্রতিটি সংবাদপত্রের তলায় মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে।

২। প্রতিটি সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং মালিককে তাঁদের নাম-ধাম সরকারের সচিবের কাছে পেশ করতে হবে।

৩। রবিবার কোন কাগজ প্রকাশ করা চলবে না।

৪। সরকারের সচিব পরিদর্শন করার আগে কোন সংবাদপত্র কোন কিছু ছাপাতে পারবে না।

৫। এসব নির্দেশ না মানার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে চড়িয়ে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়া।

সেনসর কর্তৃপক্ষ হিসেবে কি করতে হবে, না হবে তা নিয়েও সচিবের জন্য কিছু নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হয়। ওই নির্দেশিকায় বলা হয় কাগজে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা, সেনা চলাচল, জাহাজের খরচ, নৌ অথবা সেনা প্রস্তুতি, সরবরাহ ব্যবস্থা, ভারতীয় রাজ্যের কাছে বৃটিশ শক্তির সম্মান খাটো করেছে এমন কোন বৃটিশ সংবাদপত্রের সংবাদ সার, শত্রুপক্ষ তথ্য পেতে পারে এমন কোন সংবাদ, কোম্পানির এলাকায় উত্তেজনা বা সংঘর্ষ ঘটতে পারে এমন খবর, কোন ভারতীয় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ বা শান্তির সম্ভাবনা সম্পর্কিত যে কোন বিবৃতি এবং সবরকম ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচার ও কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অখ্যাতিকর মন্তব্য প্রকাশ করা চলবে না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের সংবাদপত্র-গুলিকে এই আইন মেনে কাজ করতে হয়েছে। তখনকার খবরের কাগজ সম্পর্কে ওয়েলেসলির ধারণাটা এত খারাপ ছিল যে, তিনি সরকারি

উদ্যোগে একটা কাগজ বের করতে চান। কিন্তু খরচের কথা ভেবে কোম্পানি তাতে সায় না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেধরণের কোন কাগজ বের হয়নি। তবে মিশনারিরা কলকাতায় প্রেস বসিয়ে একটি কাগজ বের করতে চাইলে ওয়েলেসলি কিন্তু তাঁদের সাফ জানিয়ে দেন, না, কলকাতায় বসে কোন কাগজ বের করা চলবে না। ওয়েলেসলির এই জবাবে মিশনারিরা ক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁরা আর কোন কথা না বলে ওলন্দাজ অধিকৃত শ্রীরামপুরে গিয়ে প্রেস বসালেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই কাগজও বের করতে থাকেন। এদিকে কলকাতার বিভিন্ন কাগজের সম্পাদক কিন্তু ওয়েলেসলির ওই কুখ্যাত পঞ্চবিধিকে মোটামুটিভাবে মেনে নিয়েই কাগজ বের করতে থাকেন। তাঁদের ধারণা ছিল পঞ্চ-বিধি মানলেই কাগজ চালানোটা সহজ হবে।

সম্পাদকরা অনায়াস হবার স্বপ্ন যতই দেখুন, নিয়মকানুন যতই মানুন ওয়েলেসলির ভ্রূ কিন্তু সোজা হয় না। মেজাজটাও হয় লা-শরিফ। বারবার তাঁর মনে হতে থাকে সম্পাদকরা তাঁকে ফাঁকি দিচ্ছেন। সরকারি অনুমোদন না নিয়েই তাঁরা খবর ছাপছেন। সময়মত প্রুফও পাঠাচ্ছেন না 'সেনসর' করার জন্য। ওয়েলেসলির এই ভাবনাটা আজও লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সরকারি খাতায় প্রস্তাব হয়ে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ২২ মে তারিখে ওই প্রস্তাবটি নেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবে ছিল,—

"মুখ্যসচিবকে না দেখিয়ে খবর ছাপানোর ঘটনা বেশ কয়েকটি ঘটেছে। তাই সম্পাদকদের নির্দেশ দেওয়া হোক যে, কোন অবস্থাতেই মুখ্যসচিব অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে শিক্ষাসচিবের অনুমোদন ছাড়া তাঁদের কাগজে কোন খবর ছাপতে পারবেন না। তাঁদের আরো জানিয়ে দেওয়া হোক, বেলা তিনটের পর যেসব কাগজপত্তর পেশ করা হবে সেগুলি পরের দিনের আগে পাওয়া যাবে না।"

গবর্নর জেনারেল নিজেই বেশ কড়া ভাষায় চিঠি লিখে হুঁশিয়ারি দিলেন এশিয়াটিক মিরর, ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকারু, ক্যালকাটা গেজেট, মর্নিংপোস্ট, ওরিয়েণ্টাল স্টার এবং টেলিগ্রাফের সম্পাদকদের।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের সময় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে ইণ্ডিয়া গেজেট, হরকারু, মিরর, পোস্ট, অর্ফান প্রেস, স্টার এবং টেলিগ্রাফ কাগজকে জানিয়ে দেওয়া হল—

"বর্তমান যুদ্ধের সময় আপনারা আপনাদের কাগজে নৌ বা জাহাজ চলাচল সম্পর্কে কোন খবর দিতে পারবেন না। কোম্পানি এবং দেশীয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী এবং সরকারি অনুমোদনে 'ক্যালকাটা গেজেট' যেসব খবর ছাপছে সেগুলি শুধু অন্যরা ছাপতে পারবেন। কেননা অন্য কিছু ছাপলে শত্রুরা সেগুলি কাজে লাগাতে পারে এবং কোম্পানির এলাকায় উত্তেজনা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে পারে।"

এই যে সব চিঠি তা যে বোর্ড অব ডাইরেকটর অনুমোদন করেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু বোর্ডের সভাপতি ডানডাস ওই অনুমোদন প্রস্তাব থেকে ওয়েলেসলির কাজের সমর্থনসূচক বাক্যটি কেটে দেন।

যাইহোক, ওয়েলেসলি নিজেও কিন্তু অবসর নেওয়ার পর তাঁর নিজের কাজকর্ম এবং নীতি বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলেন, ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতি তাঁর আচরণটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। তিনি নিজেই বলেছিলেন, সংবাদপত্র সম্পর্কে তার ওই নির্দেশগুলো বোধ হয় একটু বেশি কড়া হয়ে গিয়েছিল।

ওয়েলেসলির ওইসব পরবর্তী ভাবনার কথা এখন থাক। সংবাদপত্রের ওপর সরকারি বাধানিষেধের নিগড় কিন্তু ক্রমেই দৃঢ় হতে থাকে। যেমন ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ এপ্রিল গবর্নরের এক নির্দেশে কাগজের ওপর বেশকিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। সেই সঙ্গে সবরকম জনসভাও নিষিদ্ধ করা হল।

এই সব কড়াকড়ির ফলটা কিন্তু হল উল্টো। এতদিন যা প্রকাশ্যে হচ্ছিল তা এবার হতে থাকল গোপনে। ফলে আগে যতটুকু যা প্রচার হচ্ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কথা প্রকাশ করে দেওয়া হতে থাকল। গড়ে উঠতে থাকল চোরাগোপ্তা প্রেস— লেখক বা মুদ্রাকরের নাম ছাড়াই

প্রকাশিত হতে থাকল বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি। ব্যাপার দেখে নির্দেশ জারি হল, যে-কোন ছাপা কাগজে মুদ্রাকরের নাম দিতেই হবে। ওইসব গুপ্ত হ্যান্ডবিলের কয়েকটি ছেপে ছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের ওপর আক্রমণ করে ছাপা হয়েছিল ওইসব হ্যান্ডবিল। ব্যাপারস্যাপার দেখে তখনকার গবর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো শ্রীরামপুরের মিশনারিদের বলছেন, ঢের হয়েছে, আর শ্রীরামপুরে থেকে কাজ নেই। আমি জায়গার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনারা কলকাতায় চলে আসুন। মিশনারিরা প্রায় এককথায় নাকচ করে দিলেন সে আহ্বান। বললেন প্রেস কলকাতায় নিয়ে যেতে গেলে প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যাবে। অত টাকা খরচ করার সাধ্য তাঁদের নেই। তবে প্রতিশ্রুতি দিলেন, শ্রীরামপুর থেকে ছাপা হলেও ছাপার আগে সবকিছু সরকারকে দেখিয়ে তাঁদের অনুমোদন নিয়েই তা ছাপা হবে।

দেখতে দেখতে এসে গেল ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ। মিন্টোর বদলে গবর্নর জেনারেল হলেন লর্ড হেস্টিংস। তিনি এক নির্দেশে বললেন, সংবাদপত্র, ক্রোড়পত্র, অতিরিক্ত সংস্করণ, বিজ্ঞপ্তি, হ্যান্ডবিল এবং অন্যান্য ছাপা জিনিস প্রকাশের আগে মুখ্যসচিবকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের বিধি এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দের নির্দেশটি হেস্টিংসের আমলেও বলবৎ থাকল কিন্তু এগুলি প্রয়োগের ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা বা উদারতা দেখা যেতে লাগল। হেস্টিংসের ওই নির্দেশ সংবাদপত্রগুলিকে কিছুটা সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নজির হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল। কিছুদিন পরেই হেস্টিংস আগাম সেনসর ব্যবস্থার বিলোপ ঘটালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেনসর করার দায়টা সম্পাদকদের ওপরই চাপিয়ে দিলেন। যেসব খবর জনস্বার্থ অথবা সরকারের স্বার্থের পরিপন্থী সেগুলি না ছাপানোর কথা তাঁদের আগেই বলে দেওয়া হল।

তৎকালীন মুখ্যসচিব উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলি এবং মর্নিংপোস্টের মালিক সম্পাদক লিটলের মধ্যে একটা সংবাদ নিয়ে যে

জোর লড়াই বাধল তার জের হিসেবেই হেস্টিংস আগাম সেনসর প্রথার বিলোপ ঘটান।

সেটা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের কথা। সেনসরের জন্য মর্নিংপোস্টের একটি নিবন্ধ হিটলে মুখ্যসচিবের কাছে পেশ করেন। সবকিছু দেখে বেইলি তার থেকে খানিকটা অংশ বাদ দিয়ে দেন। হিটলে কিন্তু সে নির্দেশ না মেনে পুরো নিবন্ধটি ছেপে দিলেন।

সামান্য একজন সম্পাদক নির্দেশ অমান্য করেছেন দেখে সরকারি আমলা বেইলি-তো ক্ষেপে লাল। তিনি আইন অনুযায়ী হিটলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গেলে হিটলে তাঁকে প্রায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলেন, আরে রাখো, তোমার ওসব আইন। ও আইন তোমার মত ইউরোপিয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—আমার ক্ষেত্রে নয়।

তার মানে ?

তুমি জানো না বুঝি, আমার বাবা একজন ইউরোপিয়ান এবং বৃটিশ প্রজা হলেও আমার মা একজন ভারতীয়। ওই অর্থে আমি ভারতীয় বংশোদ্ভব—আমি সুপ্রিম কোর্টের ওই আইনের আওতায় পড়ি না।

যুক্তি শুনে থ' মেরে গেলেন বেইলি। পরামর্শ নিলেন আইন বিভাগের। তাঁরাও সব খতিয়ে দেখে বললেন, হ্যাঁ কথাটা ঠিক। হিটলেকে আইন অনুযায়ী বহিষ্কার করা যায় না।

তবে ? তবে কি করা যায় এসব বেয়াড়া সম্পাদকদের নিয়ে ?

রাস্তাটা বের করলেন হেস্টিংস। বললেন এক কাজ কর, ওই আগাম সেনসর ব্যবস্থাটা তুলে দাও, সব দায় চাপিয়ে দাও সম্পাদকদের ওপর। গোলমেলে কিছু বেরুলে ফল ভোগ করতে হবে এখন থেকে তাদেরই।

হেস্টিংসের কথায় সায় দিলেন আর সবাই। ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট হেস্টিংসের নির্দেশে জারি হল নতুন বিধি।

সংবাদপত্র শাসনে ওয়েলেসলির শাণিত অস্ত্রগুলো নিয়েই সরকারি কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে অস্ত্র ব্যবহার করতে করতে কিছুটা ধারও কমে যায় আবার ব্যবহারের

ইচ্ছেটাও তেমন থাকে না। ফলে আমলা এবং সম্পাদকদের মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে জন অ্যাডাম সেনসর অফিসার হওয়ার পরই ওই ভোঁতা অস্ত্রে আবার শান-পালিশ পড়ল। সম্পাদকদের সঙ্গে সংঘাতটাও কিছুটা তীব্র হ'ল।

জন অ্যাডাম মাত্র ১৬ বছর বয়সে কোম্পানির এক সামান্য পদে বহাল হন। তারপর কঠোর পরিশ্রমের ফল হিসেবে পান মুখ্যসচিবের পদ। তাই সবসময়ই ধরে আনতে বললে বেঁধে আনার মত তাঁর কাজ। আগাম সেনসরের নেশায় তাই তিনি বিয়ের নোটিশ কিংবা মৃত্যুর খবরের প্রুফও দেখতে চাইতে থাকলেন। ফলে সৃষ্টি হ'ল একটি অস্বস্তিকর অবস্থা।

ওদিকে তখন ভারতসনদ আইন গৃহীত হয়েছে। কলকাতার ইউরোপিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য একইসঙ্গে একই জাহাজে অ্যাংলিসিয়ান চার্চ কর্তৃপক্ষ টমাস ফ্যানশ মিডিলটনকে কলকাতার বিশপ করে এবং প্রেজ্‌বিটেরিয়ান চার্চ কর্তৃপক্ষ স্যামুয়েল জেমস ব্রাইসকে স্কটিশ গির্জা সেণ্ট এনড্রুজের প্রধান করে পাঠালেন। কিন্তু জাহাজেই কে বড় তাই নিয়ে দুই পাদ্রী ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। জাহাজে যে ঝগড়ার শুরু কলকাতায় নেমেও তা থামল তো নাই বরং বাড়ল। সে ঝগড়ার খবর হেস্টিংসের মত সহনশীল মানুষকে এত বিরক্ত করল যে তিনি গোটা ব্যাপারটা ইংলণ্ডে বোর্ড অব ডাইরেকটরকে জানিয়ে দিলেন। ওদিকে মিডিলটন এক রবিবার অন্তর এক রবিবারে ব্রাইস-কে তাঁর গির্জা ব্যবহার করতে দিতে অস্বীকার করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাইস অনেক উঁচু চূড়াওয়ালা গির্জা বানিয়ে মিডিলটনকে টেক্কা দিলেন। ওই সঙ্গে 'এশিয়াটিক মিরর' নামে একখানা সাপ্তাহিক বের করে নিজের মত প্রকাশ করতে থাকলেন।

ব্রাইসের এই কাগজের সঙ্গে মিডিলটন লড়াইয়ে নামতে পারলেন না তেমন করে। অন্যের ভরসায় অর্থাৎ অন্য কাগজকে দিয়ে নিজের লড়াইটা চালানো অসুবিধাজনক সেটা কিছুদিনের মধ্যেই মালুম পেলেন মিডিলটন। তাই তিনি প্রভাবিত করতে থাকলেন সরকারি কর্তৃপক্ষকে।

ওদিকে আগাম সেনসর নিয়ে ব্রাইসের সঙ্গে প্রথমে স্কট এবং পরে অ্যাডামের মতান্তর চলতেই থাকল। অবস্থাটা এমন দাঁড়াল যে ব্রাইস সুরাহার জন্য দরবার করলেন হেস্টিংসের কাছে। হেস্টিংস কিন্তু ব্রাইসকে তেমন একটা পছন্দ করতেন না। আর করতেন না বলেই, অ্যাডামের প্রতি তাঁর সহানুভূতি উথলে উঠল, অনায়াসেই নিজের উদার-নীতিকে শিকেয় তুলে তিনি সমর্থন জানালেন অ্যাডামকে। আর স্বয়ং গবর্নর জেনারেলের মদত পেয়ে অ্যাডাম আরো পরিকল্পিতভাবেই হয়রান করতে থাকলেন ব্রাইসকে।

অবস্থাটা যখন এইরকম, সেইসময়ই আগাম সেনসর নিয়ে একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল কর্তৃপক্ষের মনে। ১৮১৮ খৃস্টাব্দেই নিউ-সাউথ ওয়েলস মামলায় বিচারকরা রায় দেন, বর্তমান ব্যবস্থায় প্রকাশিত সমস্ত আপত্তিকর অংশের জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদক বা মুদ্রক দায়ী নন, দায়ী যে সেনসর কর্তৃপক্ষ সেগুলি ছাপার অনুমতি দিয়েছেন তাঁরা। এর সঙ্গে আবার দেশীয় সম্পাদকদের ক্ষেত্রে বহিষ্কারের অস্ত্রটাও অচল। তাই ঝামেলা এড়াতে হেস্টিংস অন্য পথ নিলেন। লন্ডনে কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য বিরোধিতা করলেও হেস্টিংস সব দায় সম্পাদকদের ওপর চাপাবার ব্যবস্থা পাকা করলেন। জারি করলেন নতুন ফরমান।

ওই ফরমানে বলা হল, সম্পাদকদের শুভ বুদ্ধি, বিচার বিবেচনার ওপর আস্থা রেখে সরকার আগাম সেনসর ব্যবস্থা তুলে নিচ্ছেন। কিন্তু বর্তমান আইন বা এদেশে প্রচলিত বৃটিশ নীতি বিরোধী কিছু প্রকাশ করলে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদকরাই দায়ী থাকবেন এবং সেক্ষেত্রে গবর্নর জেনারেল অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। ওইসঙ্গে প্রত্যেক সংবাদপত্রকে মুখ্যসচিবের অফিসে একটি করে কপি জমা দিতেও বলা হয় মুখ্যসচিব জে. অ্যাডাম স্বাক্ষরিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে।

ওয়েলেসলির পঞ্চবিধির জায়গায় চালু হ'ল হেস্টিংসের বিধি চতুঃষ্টয়। ওই বিধিতে সব কিছু দায় চাপিয়ে দেওয়া হ'ল

সম্পাদকদের ওপর। তবে কি ধরনের খবর ছাপা যাবে অথবা যাবে না মোটামুটিভাবে তার একটা নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া হ'ল। বিধি চতুষ্টয়ের সেই নির্দেশিকায় সম্পাদকদের নিচের খবরগুলি ছাপতে বারণ করা হ'ল—

১. কোম্পানির ডাইরেক্টরদের কর্মপদ্ধতি বা তাঁরা যেসব ব্যবস্থা নেবেন তার অথবা ভারত সরকার সম্পর্কে ইংলন্ডের সরকারি কর্তৃপক্ষের কোন কাজের সমালোচনা, স্থানীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক কাজকর্ম সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ অথবা কাউন্সিল সদস্যদের, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অথবা কলকাতার বিশপের আচরণ সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য।

২. স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণ সম্পর্কে যে কোন ধরণের হস্তক্ষেপ অথবা তাদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন আলোচনা।

৩. ভারতে বৃটিশ শক্তি অথবা মর্যাদার ক্ষতি করার জন্য উদ্দেশ্য-মূলক ভাবে লেখা কোন ইংরেজি অথবা অন্যভাষার কাগজের সংবাদ বা প্রবন্ধের অনুবাদ।

৪. সমাজের শালীনতা নষ্ট করতে পারে এমন কোন ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি অথবা মন্তব্য।

হেস্টিংস যে কারণের জন্যই প্রাকসেনসরশিপ ব্যবস্থার অবসান ঘটান না কেন, এরমধ্য দিয়ে কিন্তু অসি আর মসির লড়াইয়ে মসির জয়েরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়—পাওয়া যায় ভারতীয় সংবাদপত্রের চলার পথের সঠিক ঠিকানা।

পাদ্রী ব্রাইস লোকটা এককথায় কুচুটে। 'এশিয়াটিক মিরর' কাগজের মালিক এবং সম্পাদক হয়ে তার সেই কুচুটেপনা আরও বেড়েছে। সব সময় মনে হয় তার পিঠভর্তি ঘামাচি—সেই ঘামাচির কামড়ে সে চিড়-বিড় করে নেচে বেড়াচ্ছে আর পেছনে লাগার জন্য নিত্য নতুন লোক খুঁজে বেড়াচ্ছে। মিডিলটন কিংবা স্কট, অ্যাডামের পর সে তার আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নেয় কলকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে। হয়ত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরালো সমর্থন না পাওয়ার জন্যই পাদ্রী ব্রাইস চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ চালিয়ে যায় তাদের ওপর। সে আক্রমণে ধার না থাকলেও জ্বালাটা ছিল বেশি। তাই কলকাতার ব্যবসায়ীরা পাল্টা জবাব দিতে অন্য কাগজ নয়, নিজেরাই একটা কাগজ বের করতে চাইল! তাদের সেই ইচ্ছেটা আরও জোরদার হ'ল জেমস সিল্ক বাকিংহামকে পেয়ে।

জেমস সিল্ক বাকিংহাম—এক অদ্ভুত মানুষ। যেমন উল্লেখযোগ্য তাঁর ব্যক্তিত্ব, তেমনি অভিজ্ঞতা। একটা মানুষের যে এত বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ থাকতে পারে তা সিল্ক বাকিংহামকে দেখার আগে কল্পনা করাটাও বেশ শক্ত।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বাকিংহামের জন্ম। সৌভাগ্যের সন্ধানে ভারত যাত্রার আগেই তাঁর জীবনে ঘটে গেছে অনেকগুলো ঘটনা। প্রতিটি ঘটনার মধ্য দিয়েই কিন্তু বাকিংহামের নীতিনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন একটি মনের পরিচয় পাওয়া গেছে।

এক সময় তিনি একজন আরব কিংবা তুর্কি'র মত চষে বেড়িয়েছেন সারাটা মুসলিম দুনিয়া। সেখানে মুসলমানদের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্কও গড়ে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর বিচিত্র মানসিকতাই তাঁকে এই

সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রথম থেকেই মানুষের রীতি-নীতি, তার সমাজের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে একটা আশ্চর্য মমত্ববোধ দেখা যেত বাকিংহামের মধ্যে। তাই যখন যেখানে যেতেন, সেখানকার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতেন তিনি – সেই সঙ্গে নির্দ্বিধায় সেই সমাজের কল্যাণের জন্য যতটুকু পারা যায় ভাল করার চেষ্টা করতেন। সে কারণে যেখানে যেতেন সেখানেই মানুষের সঙ্গে একটা মরমী সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা পড়তেন তিনি।

মিশরের মহম্মদ আলির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত হৃদ্য এবং ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই তিনি আলিকে প্রশাসন এবং জাতির উন্নতি সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিতেন। মিশরের এই উৎসাহী শাসক-টিকে তিনি বুঝিয়েছিলেন, কেমন করে পাশ্চাত্যের সুফলটুকু মিশরে আনা যায়। ভারত সম্পর্কে একটা কৌতুহল তাঁর প্রথম থেকেই ছিল। তাই মিশর থেকে ভারত যাওয়ার একটা কম দূরত্বের রাস্তা বের করার জন্যও তিনি তৎপর হলেন।

সেই তৎপরতার মধ্যেই তিনি ভারত যাবার একটি সংক্ষিপ্ত পথের পরিকল্পনাও মহম্মদ আলির কাছে পেশ করলেন। তিনি দেখালেন ভূমধ্যসাগর থেকে রেড সি পর্যন্ত যদি একটা খাল কাটা যায় তাহলে এই যাত্রাপথের দূরত্ব কমে যাবে অনেকটাই। আর দূরত্ব কমে গেলে মিশরীয়রা যে বাণিজ্যের বাড়তি সুযোগ পাবে তাও বোঝালেন।

তিনি বললেন, তরুণ মিশরীয়দের ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাবার দরকার নেই। তারচেয়ে বেশি করে তাদের ইউরোপের কলকারখানাতে পাঠানো হোক, কেন না, শুধু শিক্ষায় নয়, হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা দিয়েই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটা বদলানো সম্ভব। আর অর্থ-নৈতিক কাঠামো বদলের জন্যই তিনি মিশরে আমেরিকার আটলাণ্টিক অঞ্চলের দীর্ঘ আঁশের তুলো চাষ করতে বললেন।

বাকিংহামের এইসব কথাবার্তা শুনে মনে হতে পারে তিনি বোধ হয় একজন উঁচুদরের অর্থনীতিবিদ। কিন্তু তাঁর জীবনীর পাতাগুলো

আরো একটু উলটালেই দেখা যাবে. অর্থনীতিই শুধু নয়, সাহিত্যের প্রতিও তাঁর সমান অনুরাগ। বায়রণ, স্কট কিংবা ওয়াশিংটন আরভিং-এ তাঁর সমান আগ্রহ—সমান দখল। আবার এরই পাশাপাশি তিনি দ্রুত মাল পরিবহনের জন্য বাষ্পীয় পোত, বিনা ঘোড়ার গাড়ি বা গ্যাসবেলুন ; নিয়েও সমান তালে ভাবনা চিন্তা করে গেছেন। এখানে আবার সক্রিয় তাঁর বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা।

তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অ্যানথ্রোপলজি বা নৃতত্ত্বের প্রতিই তাঁর আগ্রহটা ছিল বেশি। সামাজিক নৃতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনাতো তিনি করতেনই ওইসঙ্গে ফিজিক্যাল অ্যানথ্রোপলজি নিয়েও রীতিমত গবেষণা চালিয়ে গেছেন। আর সেই সব গবেষণাকে কিছু কিছু প্রকাশ করেছেন তিনি পরে।

একটা ম্যামথ আর একটা জ্যান্ত হাতির মধ্যে পার্থক্য কি তা যেমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন, তেমনি একটি বাঁদরের মুখমণ্ডলের রেখার সঙ্গে নিগ্রো, ইউরোপীয়, আমেরিকান, গ্রীক কিংবা রোমের মানুষের পার্থক্য কি এবং কতটা তা নিয়ে সুন্দর তুলনামূলক আলোচনা করে তিনি বিস্মিত করেছেন সবাইকে।

বাকিংহাম একসময় নাবিক হিসাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশের পর দেশ। কিন্তু এসময়ও তিনি তাঁর নীতিজ্ঞান থেকে সরে আসেন নি। সেসময় তিনি ছিলেন মস্কটের ইমামের একটি নৌ-বহরের কম্যাণ্ডার। একসময় মাদাগাস্কার থেকে একটি জাহাজের কনভয় নিয়ে যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে কেমন করে তিনি জানতে পারলেন ওই সব জাহাজে ক্রীতদাস নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জানতে পেরেই প্রতিবাদ করলেন তিনি। ক্রীতদাস ব্যবসাটা যে চলতে পারেনা একথাটাও বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইমাম সেসব কথায় কানই দিলেন না। প্রতিবাদে সঙ্গে সঙ্গে বাকিংহাম নৌ-বহরের কম্যাণ্ডারের পদে ইস্তফা দিলেন। আর সেখান থেকে চলে এলেন ভারতে।

বাকিংহাম বাসা বাঁধলেন কলকাতায়। ততদিনে তাঁর প্রতিবাদী

চরিত্রের কথা জানা হয়ে গেছে গবর্নর জেনারেল এবং কলকাতার বিশপেরও। কলকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জন পামারও তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছেন ততদিনে। গবর্নর জেনারেল, বিশপ এবং শহরের অন্যতম ব্যবসায়ী যে লোকের গুণগ্রাহী, তিনি যে একজন সাদামাঠা লোক নন, তা বোঝা যায় এর থেকেই। তাই খুব সহজেই কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন বাকিংহাম। সেই প্রতিষ্ঠাই তাঁকে সুযোগ এনে দিল কলকাতার প্রথম দৈনিকটির সম্পাদক হবার। সে অবশ্য পরের কথা। সে সময় তিনি আর সরকারের কাছের লোকও নন। তবু একদিন তিনি ছিলেন তাঁদেরই লোক। আর তাই কাগজের কথাবলার আগে বলা যাক সেইকথা।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের কথা। মাদ্রাজ থেকে একদল বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, আইনজীবি এবং সরকারি কর্তা এলেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য ভারতের সংবাদপত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য লর্ড হেস্টিংসকে অভিনন্দন জানান। অবশ্য এই অভিনন্দন জানানোর পেছনে প্রতিবাদ জানানোর একটা ব্যাপারও ছিল। মাদ্রাজের প্রশাসন সে সময় সংবাদপত্রের ওপর যে স্বেচ্ছাচারীর মত অত্যাচার চালাত। হেস্টিংসকে এভাবে অভিনন্দন দিয়ে মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের চেতনা ফিরিয়ে আনারও এটা ছিল একটা প্রয়াস। বলা যায় ঝি-কে মেরে বৌকে শেখানোর মত ঘটনা এটি। কিন্তু কলকাতায় প্রায় রাজকীয় তত্ত্বাবধানে যে ভাবে অভিনন্দন সভাটি হ'ল তাতে চাপা পড়ে গেল ওই প্রতিবাদের ব্যাপারটি। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই অভিনন্দন জানানোর ব্যাপারটিকে সবচেয়ে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন জানালেন বাকিংহাম। তখন তিনি কলকাতার সবচেয়ে চালু দ্বি-সাপ্তাহিকটির সম্পাদক। কিন্তু এই কাগজ নিয়েই পরে সরকারের সঙ্গে দূরত্ব তাঁর বাড়তে থাকল। এবং একদিন সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরেই জড়িয়ে পড়লেন তিনি এবং তাঁর কাগজ। শেষের সে কথা বলার আগে বরং বলা যাক সেই আগের কথাই। বলা যাক কাগজ বের করার ইতিহাসটা।

সে ইতিহাসের সূত্র রয়েছে শুরুতেই। সে ইতিহাসের কেন্দ্রে রয়েছে

পাদ্রী ব্রাইস। পাদ্রী ব্রাইসের অকারণ অথচ গা-জ্বালানো ভাষার আক্রমণে তিতিবিরক্ত কলকাতার ব্যবসায়ীরা একটা যোগ্য জবাব দেবার কথা ভাবছিলেন অনেক দিন থেকেই। এবার জন পামার এগিয়ে এলেন সে কাজে। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতার ব্যবসায়ীরা ঠিক করলেন, এবার তাঁরাই একটি সংবাদপত্র বের করবেন। সংবাদপত্রটির নামও ঠিক হয়ে গেল— 'দি ক্যালকাটা ক্রনিকল অব পলিটিক্যাল কমার্সিয়াল এণ্ড লিটারারি গেজেট'—সংক্ষেপে ক্যালকাটা জার্নাল। ঠিক হ'ল কাগজটি হবে ৮ পাতার এবং সপ্তাহে দু বার প্রকাশিত হবে এটি। সব ঠিক হওয়ার পর প্রশ্ন উঠল, সবই তো হ'ল কাগজের সম্পাদক হবে কে?

কেন, জন পামার। হঠাৎই কে যেন একজন বলে বসে।

কাগজ বের করার সখ যতই থাকুক, ব্যবসা ছেড়ে সম্পাদক হবার মত বোকা মানুষ পামার নন। তাই বক্তার ওকথার উত্তরে তিনি বলেন আরে ওকথাটা আমি আগেই ভেবে রেখেছি। আমি নয়, একজন ভাল সম্পাদক আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।

তাই নাকি? কে তিনি?

তোমরা তাঁকে সবাই চেন। নাম তাঁর জেমস সিল্ক বাকিংহাম।

বাকিংহাম! তিনি কি রাজি হবেন?

সেটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি দেখছি সব।

বেশ তো, আপনি যদি এব্যাপারটা দেখেন তাহলে আমরাও নিশ্চিন্ত আর বাকিংহাম যদি রাজি হয় তাহলে এ কাগজের আর কোন ভাবনা নেই। এ কাগজ নির্ঘাৎ দাঁড়িয়ে যাবে এবং ব্রাইসের হুল ফোটানোরও যোগ্য জবাব দেওয়া যাবে।

পামার আবার হেসে বলেন, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের কাগজের সম্পাদক হচ্ছেন জেমস সিল্ক বাকিংহামই।

বাকিংহামকে কথাটা বলতে প্রথমে একটু গাঁইগুঁই করেছিলেন তিনি। কিন্তু পামার তাঁকে বললেন, দেখুন ব্যাপারটির সঙ্গে আমার সম্মান জড়িয়ে আছে। কাজেই আর না করবেন না।

জন পামারের সে কথায় বাকিংহাম বললেন বেশ আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হবে।

অল্প চেষ্টাতেই বাকিংহামকে সম্পাদকের পদ নেওয়াতে রাজি করাতে পেরেছেন ভেবে পামারের মুখে উঠল জয়ের হাসি। হাসি মুখেই তিনি বললেন, তাহলে সম্পাদক সাহেব, বলুন কবে থেকে কাগজ বের করা হবে!

বাকিংহাম বললেন, এটাতো সেপ্টেম্বর মাস। তাহলে অক্টোবরের প্রথম থেকে কাগজ বের করা যাবে এখন।

পামার হিসেব করে বললেন তাহলে ২ অক্টোবর বেরুবে আমাদের কাগজের প্রথম সংখ্যা, কেমন।

হ্যাঁ ২ অক্টোবর।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২ অক্টোবর। কলকাতার স্ট্যান্ডে দেখা গেল নতুন দ্বি-সাপ্তাহিক কাগজ 'ক্যালকাটা জার্নাল'। প্রথম সংখ্যাতেই হিট করল কাগজ। কলকাতার মানুষের মনে সাড়া জাগাল 'ক্যালকাটা জার্নাল'। প্রথম সংখ্যা থেকেই পাওয়া গেল সম্পাদকের রুচিবোধ, জ্ঞানের ব্যাপ্তি এবং কল্পনা শক্তির পরিচয়। শুধুই কেচ্ছা, খেয়োখেয়ি আর একঘেঁয়ে খবরের আসরে ক্যালকাটা জার্নাল-এর সাহিত্যের আমেজ প্রবাসী ইউরোপীয়দের নতুন করে মনে করিয়ে দিল দেশের কথা—তার সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত ক্যালকাটা জার্নাল-এর পাতায় পাতায় বায়রণ, স্কট, আরভিং-এর কাব্য-গাথার স্বাদ নিয়ে পাঠকরা মুগ্ধ, সেইসঙ্গে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব নিয়ে সরস আলোচনা, স্থানীয় খবর এবং অভাব অভিযোগের চিঠির সুসম বিন্যাস, কলকাতা এবং জেলায় জেলায় পত্রিকাটির পাঠক সংখ্যা বাড়িয়েই চলল। ক্যালকাটা জার্নাল হয়ে উঠল পাঠকদের এক মস্ত আশ্রয়।

বাকিংহাম তাঁর কাগজে নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণা করলেও, হিকি তাঁর গেজেটের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের যে কাঠামো তৈরি করে গিয়েছিলেন বাকিংহাম সে কাঠামোকে সযত্নে একপাশে সরিয়ে রাখলেন না, অথবা বলা যায় হিকি যে জনরুচি তৈরি করে গিয়েছিলেন

তাকে উপেক্ষা করার মত দুঃসাহস বাকিংহামের হয়নি। তাই হিকির গেজেটের মত ক্যালকাটা জার্নালেও স্হান করে নিল পাঠকের মতামত বিভাগটি।

ক্যালকাটা জার্নালের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, চিঠিপত্রের মধ্যে ফ্যাশনের কথার চেয়েও স্হানীয় অবস্হার কথা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। আশপাশের সামাজিক অবস্হার চেয়েও কলকাতার জীবন অথবা কড়া চাঁছাছোলা ভাষায় নিন্দার চেয়েও গঠনমূলক সমালোচনার ব্যাপারটিই ঠাঁই পেয়েছে এসব চিঠিতে।

রাজনৈতিক মতবাদের দিক থেকে বাকিংহাম ছিলেন কিছুটা উদার-নৈতিক। তিনি ইংলন্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক দল হুইগ যা পরে পরিবর্তিত হয় উদারনৈতিক দলে তার সদস্য ছিলেন। দল এবং মত-বাদের প্রতি তাঁর এই আনুগত্যের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত তাঁর পত্রিকার বিদেশী সংবাদ এবং মন্তব্য সংকলনের ক্ষেত্রে। তিনি ইংলন্ডের পত্রপত্রিকার যেসব মন্তব্য ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশ করতেন তার সবই হত হুইগদের মতামত।

বাকিংহাম খুব ভাল করেই জানতেন, ক্যালকাটা জার্নালের জন্মের পেছনে রয়েছে স্হানীয় সংবাদপত্র এবং প্রশাসনের প্রতি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অসন্তোষ। ব্যবসায়ীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, তৎকালীন সংবাদ-পত্রগুলি এবং স্হানীয় প্রশাসন কেউ চায় না, তাঁরা ব্যবসা করে দুটো লাভের পয়সা দেখুন। তারা চায় না নিজেরা ছাড়া আর কেউ সৌভাগ্য লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পাক। তাই পদে পদে বাধা সৃষ্টি করা তাদের কাজ বলে ব্যবসায়ীরা মনে করতেন এবং সেই মনে করা থেকেই তাঁরা নিজেদের কাগজ হিসাবে ক্যালকাটা জার্নাল প্রকাশ করেন। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসায়ীদের সুবিধে অসুবিধে, তাদের প্রয়োজন এবং অভাব অভিযোগের কথাগুলি মাথায় রেখে বাকিংহামকে কাগজ বের করতে হত। আর তাই কাগজের অনেকখানি জুড়েই থাকত বাংলা সরকারের আইনকানুন এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা।

বাকিংহাম সরকারের ওপর তাঁর আক্রমণটা চালিয়ে যেতেন ডাক-বিভাগ, পুলিশ, সামরিক সংস্থার দুর্নীতি এবং অপদার্থতা ও বাড়া-বাড়ি নিয়ে প্রশ্ন তুলে। খাদ্যশস্যের একচেটিয়া ব্যবসার দিকে সরকারের নজর না দেওয়া নিয়েও তিনি বেশ কড়াভাবে সমালোচনা করেন। ওই-সঙ্গে ভারতীয়দের সতীপ্রথার তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি লেখেন, এজাতীয় একটি কুসংস্কার এবং বর্বর প্রথার বিলোপ ঘটানোর জন্য সরকার চরম ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে সরকার তাঁর প্রজাদের ভালমন্দ সম্পর্কে একবারেই উদাসীন! শুধু খাজনা আদায় করলেই কি শেষ হয়ে যাবে সরকারের কাজ?

দিনের পর দিন এধরণের কড়া সমালোচনা শুনতে কারই বা ভাল লাগে? স্বাভাবিক ভাবে সরকার এসব সমালোচনার একটা জবাব দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

শুধু যে সরকারি কর্তৃপক্ষ বাকিংহামের শত্রু হ'ল তা নয়, অন্য খবরের কাগজের মালিকরাও ক্রমেই চটতে থাকল বাকিংহামের ওপর। যদিও তাদের সেই রাগটিকে ছেলেমানুষি ছাড়া অন্য কিছু বলা উচিত নয়, তবু-রাগ রাগই। তার বিষটা সবসময়ই শরীরকে পঙ্গু করতে চায়। আর সেই বিষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাকিংহামকে নিতে হল নানা পথ।

বাকিংহামের কাগজ কেন বেশি করে লোকে কিনবে? বাকিংহাম কেন তাঁর কাগজে নিত্য নতুন বিষয় জুড়বেন? কেন তাঁর কাগজ এত ভাল হবে? এই জাতীয় সব অভিযোগ তুলে তখনকার অন্য কাগজের মালিকেরা ফুঁসতে থাকে। নানা ভাবে তারা বাকিংহামের পেছনে লাগতে থাকে।

ক্যালকাটা জার্নালের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত ক্যালকাটা গেজেট আর মর্নিংপোষ্ট অচল হয়ে যায়। অবশেষে তারা আত্ম-সমর্পনই করল। দুটি কাগজই মিশে গেল ক্যালকাটা জার্নালের সঙ্গে। ফলে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে যে ক্যালকাটা জার্নালের যাত্রা শুরু মাত্র ২০৭ জন গ্রাহক নিয়ে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেই তার সংখ্যাটা হল দ্বিগুণ। ১৮২০

খৃষ্টাব্দেই ক্যালকাটা জার্নাল হল ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্রের অন্যতম এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা জার্নাল যখন তার সাফল্যের চূড়ান্ত পর্বে তখন তার গ্রাহক সংখ্যা পেঁছে গেছে হাজারের ঘরে। গ্রাহকদের অধিকাংশই হলেন সরকারি অফিসার, সামরিক অফিসার এবং ব্যবসায়ীকুল। প্রচার সংখ্যার চেয়ে বড় কথা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১মে ক্যালকাটা জার্নাল দ্বি-সাপ্তাহিক থেকে পরিণত হল দৈনিক কাগজে। সারা ভারতের মধ্যে ক্যালকাটা জার্নাল হল প্রথম দৈনিক।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র এবং প্রথম দৈনিকের সূতিকাগার হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হল কলকাতা। কলকাতার মাথায় অনেক সম্মানের পালক গোঁজা থাকলেও এই দুটি পালকের প্রতি রয়েছে কলকাতার এক আশ্চর্য মমতা—রয়েছে এক অনুচ্চারিত গর্ববোধ।

এসব ইতিহাসের কথা। সম্মানের সুখের স্মৃতির পাশাপাশি অবশ্য রয়েছে বেদনার রক্তাক্ত অধ্যায়ও। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য নানা জঘন্য নীচতার নীরব সাক্ষী আজও কলকাতা।

বাকিংহামের কথাই ধরা যাক, তিনি মনপ্রাণ দিয়ে একটি কাগজ বের করছেন—তাঁর সম্পাদকীয় মেজাজে হার মানাচ্ছেন সবাইকে—এটা সহ্য করতে পারে না অনেকেই। সুস্থ প্রতিযোগিতা নয়, নোংরা চরিত্র হননের পথে তখনকার অনেকগুলি পত্রপত্রিকা বাকিংহামকে আক্রমণ করতে থাকে। সে আক্রমণের মধ্যে থাকত না সত্যের লেশমাত্র। সেসব জঘন্য আক্রমণের কথা শুনে আজও লজ্জায় মুখ লুকোতে হয় মানুষকে। বাকিংহামের কাগজের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে নোংরা কুৎসা রটনায় যারা মেতেছিল তাদের অন্যতম হলেন সেই পাদ্রী ব্রাইস।

ব্রাইস পাদ্রী হলে কি হয়, ধর্ম প্রচারের চেয়ে তাঁর নজরটা ছিল অন্যের কেচ্ছাকাণ্ড প্রচারের দিকেই। যে কোন কারণেই হোক, কলকাতার ব্যবসায়ী মহলকে পাদ্রী ব্রাইস খুব একটা ভাল চোখে দেখতেন না। যখন তখন যা তা ভাবেই তিনি ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতেন তাঁর 'এশিয়াটিক মিরর' কাগজে। তারই জবাব দিতে পামারের নেতৃত্বে ব্যবসায়ীরা

'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ করেন বাকিংহামকে সম্পাদক করে। ফলে ব্রাইসের আক্রমণের লক্ষ্য যে বাকিংহাম হবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ? ব্রাইস তাঁর কাগজে বাকিংহামের চরিত্র হননের জন্য একবারে উঠে পড়ে লাগলেন।

এশিয়াটিক মিররে ব্রাইস লিখলেন, রবিবার দুপুরে বাকিংহাম বেশ কিছু যুবতীকে নিয়ে চৌরঙ্গীতে 'কোয়াড্রিল' নাচের মহড়া দিয়ে পবিত্র 'রবিবার'-কে অপবিত্র করছেন।

বাকিংহামও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনিও তাঁর কাগজে ব্রাইসকে একবারে তুলোধোনা করে ছাড়লেন। ক্যালকাটা জার্নাল এবং এশিয়াটিক মিরর-এর মধ্যে এই নিয়ে চলতে থাকল তরজার উতোর চাপান। শেষ পর্যন্ত কিন্তু পিছু হঠতে হল পাদ্রী ব্রাইসকেই। ধর্মযাজক বা পরছিদ্রান্বেষী হিসাবে ব্রাইস যত দরের মানুষই হোক না কেন, সাংবাদিকতার দিক থেকে তিনি বাকিংহামের কাছে একবারেই দুগ্ধপোষ্য শিশু। তাই কেচ্ছাকান্ড বা খেউর তিনি যতই গান না কেন, পাঠকরা কিন্তু তাঁর কাগজকে তেমন একটা পছন্দ কোন সময়েই করতেন না। এখন অকারণে বাকিংহামের চরিত্র হনন করতে গিয়ে এমন একটা অবস্থার মুখোমুখি ব্রাইস হলেন যে এশিয়াটিক মিরর কাগজটা বন্ধ করে দিতেই তিনি বাধ্য হলেন। ফলে বাকিংহাম আরো নিষ্কণ্টক হলেন।

সেসময় কলকাতায় আর যে ৮টি কাগজ ছিল তার দুটি ( ক্যালকাটা গেজেট ও মর্নিংপোস্ট ) মিশে গেল ক্যালকাটা জার্নালের সঙ্গে এবং এশিয়াটিক মিরর উঠেই গেল। ফলে ক্যালকাটা জার্নালের ব্যবসা বাড়তে থাকল বেশ দ্রুত লয়েই। কিছুদিনের মধ্যেই ক্যালকাটা জার্নালের জন্য নতুন বাড়ি তৈরি হল, ইংলন্ড থেকে এল নতুন আধুনিক ছাপার মেশিন এবং টাইপপত্তর। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ছিল ৪০ হাজার পাউন্ড। এর মধ্যে বাকিংহাম নিজে ছিলেন তিনচতুর্থাংশ অংশের মালিক এবং এক চতুর্থাংশের মালিক ছিলেন একশ জন ব্যবসায়ী। তাঁরা একশ পাউন্ড মূল্যের শেয়ার কিনে ওই এক

চতুর্থাংশের মালিক হন। সেইসময় কাগজের বার্ষিক লাভের পরিমাণ ছিল মোট বিনিয়োগের ৩০ শতাংশের মত। বাকিংহামের নিজের বার্ষিক আয় ছিল ৮ হাজার পাউণ্ডের মত।

কাগজের এই আর্থিক স্বচ্ছলতা বাকিংহামকে প্রশাসনের প্রতি আরও মারমুখি করে তোলে, অন্যদিকে ক্যালকাটা জার্নালের সাফল্য সমকালীন অন্য কাগজগুলিকে আবার ঈর্ষান্বিত করে তোলে। সাংবাদিকতা বা সংবাদ পরিবেশনে বাকিংহামের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ওই কাগজগুলি প্রায়ই বাকিংহামের ব্যক্তিজীবন নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলে তাঁকে যেমন নাজেহাল করার চেষ্টা করত, সেইসঙ্গে নিজেদের কাগজের প্রচার বাড়াবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালাত।

সমকালীন সংবাদপত্রগুলির ঈর্ষা এবং বাকিংহামের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ এত তীব্র ছিল যে তারা বাকিংহামের নৈতিক জীবন, তাঁর ধর্ম এমন কি রাজভক্তি সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন করে বাজার গরম করার এবং ক্যালকাটা জার্নালের বিক্রি কমাবার চেষ্টা করত। কিন্তু একদিকে বাকিংহামের দক্ষতা অন্য দিকে তাঁর প্রতি ব্যবসায়ীমহলের উদার সমর্থন সে সব আক্রমণকে যে শুধু প্রতিহত করত তাই নয়, অনেক সময় সেসব আক্রমণ বুমেরাঙের মত আঘাত করত আক্রমণকারী কাগজগুলিকে।

ওইসব কাগজ বাকিংহামের চরিত্র হননের জন্য যেসব অভিযোগ তুলত তার অনেক গুলি ছিল যেমন হাস্যকর তেমন বেশ কিছু ছিল তাদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রসূত। অনেক সময়ই অভিযোগ করা হোত, বাকিংহাম অন্যের লেখা চুরি করে নিজের নামে ছাপেন, তাঁর মত পয়লা নম্বরের অকৃতজ্ঞ জীব এ দুনিয়ায় আর নেই, যাঁরা তাঁর বিপদের সময় তাঁকে সাহায্য করেছেন, সুযোগ পেলেই বাকিংহাম তাঁদের ছোবল মারেন —এই ধরণের আরো নানা কথা। একটি কাগজতো লিখে বসল, বাকিংহাম মোটেই খৃষ্টান নন। আরব দুনিয়ায় ভ্রমণের সময় তিনি জাত ধর্ম খুইয়ে মুসলমান হয়েছেন—এইরকম সাতসতেরোর কথা।

এসব অভিযোগের মুখের মত জবাব বাকিংহাম দিতেন। অন্যদিকে সরকারি মহলও এসব অভিযোগকে মোটেই পাত্তা দিত না। চিঠি পত্রের

আকারে ছদ্মনামে কাগজে এইসব অভিযোগ প্রকাশ করা হোত। সরকারি মহল সেসব সাক্ষ্য প্রমাণকে অবাস্তব এবং মূল্যহীন বলেই মনে করতেন। কিন্তু এব্যাপারে তাঁদেরও যে কিছু করণীয় আছে এটা ভুলে যেতেন অনায়াসেই। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বিকৃত অভিযোগ করা যাবে না বলে ফারমান জারি করলেও, বাকিংহামের বিরুদ্ধে যারা প্রতিদিন এ ধরণের মিথ্যা অভিযোগের বেসাতি চালিয়েছে তাদের এক-জনের বিরুদ্ধেও সরকার একটি আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়নি। বরং তাঁরা এসব অভিযোগ বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন আর বাকিংহামকে মিথ্যে অভিযোগের জালে জেরবার হতে দেখে বেশ উদাত্ত কণ্ঠেই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতেন।

এর অবশ্য কারণ ছিল। বাকিংহাম যেমন সমাজ এবং সমকালীন জীবনের অনেক ভ্রষ্টাচারকে তুলে ধরতেন তাঁর কাগজের মধ্যে তেমনি সরকারি দুর্নীতি এবং অপশাসন সম্পর্কেও প্রচণ্ড রকম সরব ছিলেন। সরকারের বিরুদ্ধে অমন সরব হওয়ার পেছনে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা সামাজিক দায়িত্ববোধ যতটা না কাজ করেছে তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে সম্ভবত ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা এবং দায়বদ্ধতার বোধটি। কলকাতার ইউরোপীয় ব্যবসায়ীমহলই যে উদ্যোগী হয়ে ক্যালকাটা জার্নাল প্রকাশ করেছে একথা বাকিংহাম ভোলেন নি—ভোলেননি বলেই ব্যবসায়ীদের স্বার্থবিরোধী যে কোন সরকারি বিধি বা ঘোষণার বিরুদ্ধে সবার আগে সরব হতেন তিনি। ফলে সরকারির প্রশাসন কোন সময়ই বাকিংহামের প্রতি সদয় হতে পারেন না।

তাছাড়া প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের সব সময় একটা ধারণা, রাজা যেমন কোন ভুল করতে পারেন না, তেমনি তাঁরাও কোন ভুল করতে পারেন না। অথচ প্রায় প্রতিমুহূর্তে তাঁদের চারধারে ভুলের পাহাড় জমতে থাকে। দুর্নীতি আর ক্ষমতার অপব্যবহার করে তাঁরা যে সম্পদ জমান, যে সম্মান অর্জন করেন, যে উচ্চপদে বসেন—মনে করেন সেটা তাঁদের ন্যায্য পাওনা—তাঁদের ন্যায্য পুরস্কার। অথচ বাকিংহাম তাঁর

পত্রিকায় এইসব অপদার্থ, দুর্নীতিপরায়ণ আমলা, নীতিহীন বিচারক, ধর্মযাজকদের মুখোশটা খুলে দেবার জন্য সব সময় থাকতেন সচেস্ট। গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের পুরনো টোরি সদস্যরা, অ্যাডভোকেট জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি, বিশপ, অ্যাংলিক্যান ধর্মযাজকের দল সবাই বাকিংহামের ওপর ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। সবারই প্রশ্ন, তাঁরা কাজ করছেন, কি করছেন না – সেটা সবার সামনে তুলে ধরার কি আছে? কাগজে সব ছেপে জনগনের কাছে তাঁদের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিতে অমন কালি না লাগালে কি বাকিংহামের ঘুম হচ্ছে না? সেই পাদ্রী ব্রাইস তো সবসময়ই তাঁর এই সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রেসবিস্টে-রিয়ানদের উশকে দিতেন। আর ক্যালকাটা জার্নালে অনিশ্চয়তা এবং দীর্ঘসূত্রিতার জন্য সমালোচিত বিচারবিভাগও ফুঁসতে থাকে বাকিংহাম-কে জব্দ করার জন্য। সব মিলিয়ে সপ্তরথী পরিবৃত অভিমন্যু নয়, বাকিংহাম তখন বহু রথী মহারথীতে ঘেরা নিরস্ত্র এক সাংবাদিক, কিন্তু কিশোর বীর অভিমন্যুর মতই অকুতোভয়। অন্যায় বা দুর্নীতির সঙ্গে কোন রকম আপোস না করে বাকিংহাম আগাগোড়া চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁর সংগ্রাম।

প্রশাসন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে বাকিংহাম একবারে একা ছিলেন একথাটা ভাবলে অবশ্য ভুল করা হবে। কলকতার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জন পামার এবং তাঁর অনুগত ব্যবসায়ী মহল ছাড়াও তাঁকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব প্রগতিশীল হিন্দু ভারতে নবজাগরণ আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু বাকিংহাম মাঝে মাঝে যেমন লাগাম ছাড়া হয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতেন তাতে তিনি অনেক সময়ই তাঁর মিত্রদের কাছে শক্তির প্রতীক না হয়ে একটা বোঝা হয়ে উঠতেন।

হেস্টিংসের রাজনৈতিক সহনশীলতা, ফ্রান্সিস ম্যাকন্যাগাটিনের অপক্ষপাত বিচার এবং ভাগ্যের দাক্ষিণ্যও বাকিংহামকে কম সহায়তা করেনি। কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন হিংসায় উন্মত্ত, প্রতিহিংসা নিতে মরিয়া,

সবসময়ই আক্রমণ করার জন্য তৈরি তখন এ সামান্য সমর্থন আর কতক্ষণ একজনের অভেদ্য রক্ষাকবচ হয়ে থাকতে পারে? একটা না একটা সময়, শত্রুদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা তাই থেকেই যায়। বাকিংহামেরও হ'ল তাই। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে তাঁকে যেমন আইনের মোকাবিলা করতে হয়েছে তেমনি ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখেও পড়তে হয়েছে বেশ কয়েকবার।

বাকিংহামের ওপর এধরণের প্রথম আক্রমণটা আসে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে জনৈক ডারওয়ালের কাছ থেকে। কলকাতায় সেই গ্রীষ্মে সেণ্ট জন গির্জার এক ধর্মসভার সংগঠন নিয়ে বেশ বড় ধরণের একটি গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়। ধর্মসভার নির্বাচিত প্রশাসকদের নাকচ করে দিয়ে গবর্নর জেনারেল এবং তাঁর পারিষদবর্গ, বিশপ এবং বিশেষ ধর্মযাজকদের নিয়ে গঠিত পরিষদ নিজেদের পছন্দ মাফিক লোকদের ওই পদে বসান। এই ব্যাপারটা নিয়ে চারিদিকে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অনেকেই ব্যাপারটায় প্রতিবাদে মুখর হন।

সেসময় সরকারি কাগজ ক্যালকাটা গেজেট বলে, মনোনীত ওইসব ব্যক্তির কর্তৃত্ব নিয়ে কোন সমালোচনা বরদাস্ত করা হবে না। পত্রিকাটি এই মনোনয়নের প্রতিবাদে ডাকা একটি জনসভার নোটিশ ছাপতেও অস্বীকার করে। ফলে জন অসন্তোষ চরমে ওঠে।

বাকিংহাম এই ধর্মসভা নিয়ে কোনপক্ষেই যোগ দেন না। কিন্তু তিনি ঠিক করেন সেই সভায় যাঁরা যা বলেছিলেন তার সবটুকু ছেপে দেবেন। সেইমত তিনি বক্তাদের কাছ থেকে তাঁদের সেদিনের বক্তব্য সংগ্রহ করে নেন। কিন্তু ওই বিশেষ নিয়োগের সমর্থক ডারওয়াল তাঁর বক্তৃতার বিষয়টি দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু বাকিংহাম অন্যদের কাছ থেকে শুনে ডারওয়ালের বক্তব্যটাও তাঁর কাগজে ছেপে দেন।

ডারওয়াল কাগজে তাঁর বক্তৃতা ছাপা হয়েছে দেখেই রাগে লাল। তিনি বাকিংহামকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তৈরি হতে থাকেন।

সেদিন বাকিংহাম তাঁর জুড়ি গাড়িতে করে ময়দানে হাওয়া খাচ্ছেন,

এমন সময় তীব্রবেগে একটি ঘোড়া তাঁর গাড়িকে পার হয়ে গেল। বাওয়ার আগে সওয়ারের হাতের চাবুক সপাং করে এসে লাগল গাড়িতে। একবার নয়, দু-দুবার ঘটল ঘটনাটা। বাকিংহাম দেখেন ঘোড়সওয়ার আর কেউ নন ডারওয়াল। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও হাতের ছিপটি ঘুরিয়ে দুবারই জবাব দেন। তারপর হেঁকে বলেন, ওহে ডারওয়াল, সাহস থাকে তো ঘোড়া থেকে নেমে এস, তোমার লড়াইয়ের সাধ আমি মিটিয়ে দিচ্ছি এখুনি। বাকিংহামের সে চ্যালেঞ্জ কিন্তু ডারওয়াল গ্রহণ করেন না। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান নিরাপদ দূরত্বে।

ডারওয়াল বা তাঁর টোরি স্যাঙাতরা যখন দেখলেন, হামলা করে কিংবা ভয় দেখিয়ে বাকিংহামকে কায়দা করা যাবে না, তখন তাঁরা আইনের পথটাকেই বেছে নিলেন। এর আগে বার দুয়েক সমালোচনার সত্যতা সম্পর্কে মাদ্রাজের অফিসারদের অভিযোগ পেয়ে বাংলাদেশ সরকার বাকিংহামকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। কিন্তু তাতে ফল কিছুই হয়নি। তাই সরকার এবার বাকিংহামের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেবেন বলে ঠিক করলেন। খবরটা জানতে পেরে বাকিংহাম বললেন, আর যাই হোক, এটা একটা সুস্থতার লক্ষণ। এতে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটা ভাল বই মন্দ হবে না।

বাকিংহামের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হ'ল নৌ-পরিদর্শন নিয়ে একটা কড়া সমালোচনা লেখার জন্য। মামলাটি এনে নৌ-সচিব গ্রিনওয়ে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদকের কাছে ২০ হাজার টাকা ক্ষতি-পূরণ দাবি করলেন। মামলায় জয় হল গ্রিনওয়েরই। তবে তিনি ক্ষতিপূরণ পেলেন এক টাকা।

এর প্রায় পরে পরেই বাকিংহামের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি মামলা আনলেন জন অ্যাডাম। হেস্টিংস তখন ছুটিতে। সংবাদপত্র বিশেষ করে বাকিংহামের প্রতি তাঁর একটু দুর্বলতা অথবা উদারতা ছিল। জন অ্যাডামের মত মানুষের সেটা খুব একটা ভাল লাগত না। এখন হেস্টিংস নেই দেখে অ্যাডাম একটা ফৌজদারি মামলা ঠুকে দিলেন।

মামলাটা কাগজে একটা চিঠি প্রকাশ করা নিয়ে। পাঠকের মতামত বিভাগে জনৈক ব্যক্তি ওই চিঠিতে ছদ্মনামে লেখেন, ভারতে এখন মেধা বা যোগ্যতা নয়, প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমেই একজন সব কিছু পেতে পারেন। তাতে আরও বলা হ'ল সংবাদপত্রে অভাব অভিযোগ জানিয়ে এখন কোন ফল পাওয়া যায় না, কেবল যাদের সচিব অথবা সরকারি অফিসারদের সঙ্গে দহরম মহরম আছে তাদেরই সমস্যার সমাধান হয়। চিঠিটি পড়েই অ্যাডাম বললেন, এটা সরকারকে হেয় এবং অবমাননা করার মত ব্যাপার। এখুনি এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তারপর আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাকিংহামের বিরুদ্ধে একটা ফৌজদারি মামলা আনলেন। বাকিংহাম বললেন, চিঠিতে যা বেরিয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবেই পত্রলেখকের মত, ওই মতের সঙ্গে তিনি মোটেই একমত নন, তাই তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা আনার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু কে শোনে কার কথা, মামলা চলতে থাকল। ভারতের বৃটিশ অফিসাররা অবশ্য সাধারণ আইনে এই মামলা চালানোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতে, সাধারণ আইনে মামলা চালালে জুরিরা একটি মুখ্য ভূমিকা নেবেন এবং তাঁদের বক্তব্যের ভিত্তিতেই আসামি বেকসুর হয়ে যাবেন। তাই বিচার হোক বিশেষ আইনে।

এসব নিয়ে টালবাহানা চলার মধ্যেই হেস্টিংস আবার এসে গেলেন। হেস্টিংস এসেই পুরো ব্যাপারটাকে নিজের হাতে তুলে নিলেন। বিষয়টি নিয়ে আর হৈচৈ না করে একটা সমঝোতায় আসার পরামর্শ দিলেন তিনি। প্রস্তাবটায় অ্যাডাম এবং আরো কয়েকজনের মনের সায় না থাকলেও গবর্নর জেনারেলের মুখের ওপর না বলতে পারলেন না কেউ। আর হেস্টিংসও সেই সুযোগ নিয়ে ডেকে পাঠালেন বাকিংহামকে। আলোচনার টেবিলে ঠিক হ'ল বাকিংহাম ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি দেবেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে এগিয়ে আসবেন না। সরকারও ওই মামলা নিয়ে আর এগোবেন না। ফলে মামলাটি আপনা আপনি বাতিল হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত মত কাজ হ'ল। খারিজ হয়ে গেল মামলা কিন্তু তার আগেই এই মামলা নিয়ে বাকিংহামের খরচ হয়ে গেছে ৬০০ টাকা।

এধরণের মামলা, ব্যক্তিগত হামলা, নানা সুযোগ ছাঁটাই ইত্যাদি সত্ত্বেও বাকিংহাম কিন্তু সরকারের সমালোচনা বন্ধ করলেন না। বন্ধ হল না প্রশাসন এবং ধর্মযাজকদের সমালোচনা করে লেখা চিঠির প্রকাশ। আর সেই সূত্রেই নতুন এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লেন বাকিংহাম।

খৃষ্টান ধর্মযাজকরা সে সময় গির্জার দৈনন্দিন কাজকর্ম ফেলে দিনের পর দিন চলে যেতেন দূর অঞ্চলে বিয়ের পৌরোহিত্য করার জন্য। এতে বাড়তি নগদ পয়সা আসত বলে গির্জার কাজে অবহেলা করতে তাঁদের বাধত না। তাঁদের এই আচরণের সমালোচনা করে এক পত্রলেখক কড়া ভাষায় একটি চিঠি লিখলেন। সমালোচনা থেকে প্রধান ধর্মযাজক বা বিশপও বাদ গেলেন না।

চিঠিটি দেখেই প্রচণ্ড রেগে গেলেন কলকাতার বিশপ। প্রশাসন রুষ্ট হল বাকিংহামের ওপর ওজাতীয় চিঠি প্রকাশের জন্য। প্রশাসন বলল চিঠির লেখকের নাম ঠিকানা দিন, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। বাকিংহাম কিন্তু জোর গলায় বললেন, নাম ঠিকানা দেব কেন ? কোন সাংবাদিক কি তার সংবাদ উৎসের কথা প্রকাশ করে ? তাছাড়া আমার মনে হয়েছে চিঠিটি প্রকাশ করলে সমাজের মঙ্গল হবে তাই এটি ছেপেছি।

প্রশাসন জানাল, বাকিংহাম যদি এইভাবে মানুষকে হায়রান করে যান তবে তাঁর লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে এবং তাঁকে এ দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। বাকিংহাম সেই হুঁশিয়ারি পেয়ে আইনের আদালতে না গিয়ে জনতার আদালতের দ্বারস্থ হলেন। বিনাবিচারে নির্বাসিত করার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান জানিয়ে তিনি হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করতে থাকেন।

এসব ঘটনার পর হেস্টিংসের পক্ষে আগের সেই সদয় মনোভাবটা বজায় রাখা কঠিন হল। অবশ্য একথাটাও মনে রাখতে হবে যে, হেস্টিংস এতদিন যে সব সহ্য করে গেছেন তা বাকিংহামের প্রতি তার স্নেহ দুর্বলতার জন্য নয়। অ্যাডাম গোষ্ঠীর শত চাপের মুখেও চুপচাপ থাকার কারণ, বাকিংহাম তাঁর আইনগত অধিকার এবং পরিধির মধ্যে ঘোরাফেরা

করেছেন বলেও নয়, এতদিন হেস্টিংসের চুপ থাকার একটিই কারণ, নির্বাসনকে তিনি মনে প্রাণে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন নির্বাসন রোগের ওষুধ তো নয়ই, বরং রোগের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

এই বহিষ্কার বা নির্বাসন প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, কোন মানুষকে তার রুজি রোজগার থেকে বঞ্চিত করা শুধু অন্যায় নয়, তাকে ধ্বংস করাটা সমাজের পক্ষে একটা দুরাত্মার মত কাজ। বাকিংহামকে বহিষ্কার করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনায় হেস্টিংসের এই সব কথা আজও লিপিবদ্ধ আছে তাঁর পারিষদ পরিষদের কার্যবিবরনীতে। হেস্টিংস মনে করতেন, বাকিংহাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অপব্যবহার করছেন সন্দেহ নেই তবে ওসব লেখা নেহাৎ-ই অবিবেচনাপ্রসূত, কিন্তু ওগুলো খুবই স্বাভাবিক এবং কখনই অবাধ্যতা করার জন্য লেখা হয়নি।

গবর্নর জেনারেলের যুক্তির মুখে চুপচাপ থাকতে বাধ্য হন অ্যাডাম অ্যান্ড কোম্পানি। চুপচাপ থাকলেও ক্যালকাটা জার্নাল-এ পোষাক সংস্কার সম্পর্কে লেখা চিঠিটি নিয়ে বিরোধ তুঙ্গে পেঁছিল। 'স্যাম সোবার-সাইডস'-এর জবানিতে প্রচলিত ইংরেজি পেষোকের অসুবিধের কথা উল্লেখ করে লেখা হয়, কি অসামরিক, কি সামরিক পোষাক, সামাজিক অনুষ্ঠান অথবা বল নাচের আসর—সর্বত্রই এই প্রচলিত পোষাক শুধু বেমানান নয়, অসুবিধেজনকও। লেখাটিতে বলা হয়, স্বয়ং রাজাও এই পোষাক সংস্কারকে পছন্দ করবেন। সরকারের প্রতি সব রকম সম্মান রেখেই 'স্যাম সোবারসাইডস' লেখে,—

সরকারের সচিব এবং অফিসারদের মাধ্যমে না গিয়ে কেউ যদি তার কথা বলতে যায় তাহলে তা কখনই সরকারের কানে ঢোকে না, অথচ এই সচিব এবং অফিসাররা অনুগ্রহ করলে পোষাক বদলের মত সামান্য ব্যাপার তো কোন ছাড়, অনেক বড় ব্যাপারও অনায়াসে করিয়ে নেওয়া যায়। সচিব এবং অফিসারদের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অনুগ্রহ করার ভুরি ভুরি নিদর্শন এই প্রতিবেদকের কাছে আছে, দরকার পড়লেই তা পেশ করা যাবে।

আমলাদের এই ধরণের কড়া সমালোচনা করার কথাটা এর আগে কেউ ভাবেনি। তাই প্রথমটায় তারা একটু চমকে গিয়েছিল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। তারপরই আমলারা নিল আইনের পথ। এক সপ্তাহের মধ্যে বাকিংহামের কাছে সমন এসে হাজির, প্রতিবাদী হয়ে হাজির হতে হবে তাঁকে একটি মামলায়।

বাকিংহাম সমন পেয়ে তৈরি হচ্ছেন এরই মধ্যে পরের সাপ্তাহে স্বয়ং অ্যাডভোকেট জেনারেল এক ফৌজদারি মামলার আসামি করলেন বাকিংহামকে। গবর্নর পরিষদের আলোচনা বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে ঘটনাটা ঢুকিয়ে দিলেন অ্যাডাম।

এরি মধ্যে হেস্টিংসের কানে যখন গুজব-গুঞ্জন এল যে কলকাতার অধিবাসীরা মামলায় বাকিংহামকে সাহায্য করার জন্য চাঁদা তুলতে শুরু করবেন তখন তিনি একরকম ভেঙে পড়লেন। কিন্তু পরে যখন জানা গেল পুরোটাই গুজব, ও খবরের মধ্যে কোন সত্যতাই নেই তখন হেস্টিংসের মধ্যেও ফিরে এল পুরনো সহনশীলতা।

দেওয়ানি আদালত বলল বাকিংহাম নির্দোষ। কিন্তু মামলার খরচ হিসেবে তাঁকে দিতে হল ৬শ' পাউন্ড। ফৌজদারি মামলায় কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দুজন বিচারক বললেন, বাকিংহামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটা ঠিক, অন্যদিকে বিচারপতি ম্যাকনাঘটেন বললেন, না, এটা বিচার করার কোন এক্তিয়ারই এ আদালতের নেই।

দেওয়ানি আদালতের রায় না বেরোনো পর্যন্ত এ মামলার শুনানি বন্ধ রইল। কিন্তু তারপর মামলাটি উঠলে বিচারপতি ম্যাকনাঘটেন বললেন, এ মামলার শুনানি শোনার কোন এক্তিয়ার এ আদালতের নেই এবং আদালতের রায় বেআইনি, নির্মম এবং অত্যাচারমূলক।

হেস্টিংসের উদারতা আর ম্যাকনাঘটেনের আইনি প্যাঁচে আদালতের রাস্তায় বাকিংহামকে শায়েস্তা না করতে পেরে তাঁর বিরুদ্ধবাদী রক্ষণশীলের দল ঠিক করলেন, কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। সংবাদপত্র হাতে পেয়ে বাকিংহাম যেমন ইউরোপীয় সমাজের দুষ্ট ক্ষত হয়ে উঠছে

তেমন সেই ক্ষত নিরাময়ও করতে হবে সংবাদপত্র দিয়েই। বাকিংহামের পাল্টা জবাব দিতে তাঁরা নিজেরাই একটা কাগজ বের করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সিদ্ধান্ত মতই ১৮২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হ'ল 'জন বুল ইন দি ইস্ট'। পত্রিকার মদতদার বা অর্থের জোগানদার হলেন আফিংয়ের এজেণ্ট জন ট্রটার, হিজলির লবণ এজেন্ট এবং ভূমি রাজস্ব সংগ্রাহক রিচার্ড প্লাউডেন, সুপ্রিম কোর্টের করনিক টমাস লেউইন এবং কোম্পানির অধীন ৬টি পদের অধিকারী গ্রিনল।

জন বুল ইন দি ইস্ট প্রকাশের কারণ হিসেবে এঁরা অবশ্য বললেন, সামাজিক এবং সরকারি কর্মীদের নৈতিক বিধিকে তুলে ধরার জন্যই এই কাগজ। কিন্তু প্রতি পদে ক্যালকাটা জার্নালের বিরোধিতা করাই যে এ পত্রিকার কাজ তা তার পাতা ওল্টালেই বোঝা যেত।

বাকিংহাম কিন্তু এই নতুন পত্রিকা দেখে ভয় পেলেন না। বরং সরকারের অন্যায় কাজগুলির প্রতিবাদ তিনি করে যেতে থাকলেন বেশ বলিষ্ঠতার সঙ্গেই। সরকার সে সময় একই লোককে একাধিক পদে নিয়োগ করত। অথচ তখনও কাজ না পাওয়া লোকের সংখ্যাটাও কম ছিল না। তাই বাকিংহাম সরকারের এইভাবে একই ব্যক্তিকে নানা পদে বসিয়ে তোষণের নীতির তীব্র সমালোচনা করতে থাকলেন।

এই সময়ই ডাঃ জেমসনকে ভারতীয়দের জন্য মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেণ্ট পদে নিয়োগ করা হয়। ডাঃ জেমসন এর আগে থেকেই অন্য আরো ৩টি পদে কাজ করছিলেন। তাই তাঁকে এই নতুন পদে নিয়োগ করার তীক্ষ্ন সমালোচনা করলেন বাকিংহাম।

বাকিংহামের সমালোচনার হুলের জ্বালাটা ছিল তীব্র। সেই জ্বালায় জ্বলে ডাঃ জেমসন প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তাঁর রাগ ঠাণ্ডা করতে অ্যাডাম চাইলেন বাকিংহামকে বহিষ্কার করতে। কিন্তু হেস্টিংসের উদারনীতি সেবারও বাঁচিয়ে দিল বাকিংহামকে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাকিংহাম বহিষ্কারের খড়্গ এড়াতে পারলেন না। হেস্টিংসের পর গবর্নর জেনারেলের পদে বসলেন অ্যাডাম এবং

গদিতে বসেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য নিসপিস করতে থাকল তাঁর হাত।

গবর্নর জেনারেল হয়েই অ্যাডাম বার্ষিক ৬শ' পাউণ্ড বেতনে রেভারেণ্ড জেমস ব্রাইসকে স্টেশনারি ক্লার্ক পদে নিয়োগ করলেন। বাকিংহাম যথারীতি এই নিয়োগের সমালোচনা করলেন আর অ্যাডামও এই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে বাকিংহামের লাইসেন্স বাতিল করলেন। ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে সবচেয়ে সরব ব্যক্তিটিকে ভারত ছাড়তে হ'ল। বিদায়ের মুহূর্তে তিনি বললেন, আমি ভারতের মাটি ছাড়ছি সমস্ত মানবজাতির শান্তির জন্য।

শান্তি ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী বাকিংহাম, মানুষে মানুষে ভেদাভেদের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ছিলেন না বলেই ইংলণ্ডের মাটিতে যে রাজনৈতিক দর্শন ও চেতনার বিকাশ ঘটেছিল ভারতের বুকেও সেই চেতনা আনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। তাতে যে শাসক শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হয় একথাটা তাঁর স্মরণে ছিল না, কিংবা তাকে আদৌ আমল দেননি। তাই সরকার যখন সে সব নীতির ওপর খড়্গহস্ত হ'ল, বাকিংহাম তখন ক্যালকাটা জার্নালে লিখলেন, "যে মানুষটি ইংলণ্ডে একজন সম্মানীয়, বুদ্ধিমান এবং সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হন, তিনিই ভারতে, সরকারের এই নতুন নীতির আলোয় একজন ভবঘুরে, বুদ্ধিহীন বা বোকার চেয়ে একটু উন্নত জীব। ইংলন্ডে যেটাকে বলা হচ্ছে স্বাধীন চেতনা, এখানে সেটাকেই বলা হচ্ছে অনুমান, অহমিকা বা ঔদ্ধত্য এবং ওখানে যেটাকে অবাস্তব বলে উপহাস করা হয় এখানে সেটাকেই প্রগাঢ় জ্ঞানের দৃষ্টান্ত বলে ছাপার অক্ষরে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।'' ভারতে বৃটিশ শাসনের এই নয়া প্রতিভূদের অতি অদ্ভূত আচরণের বিরুদ্ধে বাকিংহাম ছিলেন এক জ্বলন্ত প্রতিবাদ—তাই তাঁকে ভারত ছাড়া করার জন্য ওয়েলেসলির নীতির ধারক অ্যাডাম এবং অন্যরা উঠে পড়ে লাগেন। কিন্তু মানুষ বাকিংহামকে ভারত থেকেও বহিষ্কার করলেও ভারতবর্ষের মানুষের মনে সংবাদপত্রের

স্বাধীনতার জন্য, ন্যায়ের পক্ষে সর্বস্ব পণ করে লড়াইয়ের চেতনার যে দীপ বাকিংহাম জ্বালান তা ক্রমেই পরিণত হয় এক জ্যোতির্ময় আলোক ধারায়।

অ্যাডামদের মত মানুষের হৃদয় কিন্তু ওই আলোর স্পর্শ পায় নি। বরং শোষণের দাঁতকে আরো তীক্ষ্ম করতে অ্যাডাম বাকিংহামের বহিষ্কারের পক্ষে সাফাই গেয়ে বলেন, সম্পাদকের চেয়ারে বসার দৌলতে সবকিছু বিচার করার হক জন্মেছে এবং সেই হকে সরকারের যে কোন কাজের মূল্যায়ন এবং সরকারি এবং বেসরকারি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণের সমালোচনা করে বাকিংহাম এবং তাঁর সহযোগীরা তথা-কথিত জনমতের আদালতে হাজির করার যে কথা বলেন তাকে কোন-মতেই সমর্থন করা যায় না।

অ্যাডাম ওইখানেই থেমে না থেকে আরো বলেছেন, এদেশে বসবাস-কারী ইউরোপীয়রা কখনই সরকারের কাজ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে পারেন না। সে ধরণের দাবি করলে এখানকার এই ছোট ইউরোপীয় সমাজে শুধু বিদ্বেষ এবং হিংসাত্মক ঘটনারই প্রসার ঘটবে না, সেইসঙ্গে সরকারের কর্তৃত্বও দুর্বল হয়ে পড়বে।

কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়ার যুক্তিটাকে তুলে ধরেই অ্যাডাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাৎতো করলেনই, সেইসঙ্গে হেস্টিংসের দেওয়া সুযোগ সুবিধেকে ছাঁটাই করে নিয়ন্ত্রণের কঠিন নিগড়টাকে দৃঢ় করলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিলকে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে চিহ্নিত করলেন 'কালা দিবস' হিসেবে। ওই দিনই সংবাদপত্র দমনের জন্য অ্যাডাম সুপ্রিম কোর্টে পেশ করলেন তাঁর 'কালা প্রস্তাব'। স্বাধীনতা নয় নিয়ন্ত্রণ। সুযোগ নয় নিপীড়ন—এই হ'ল অ্যাডামের নয়া অর্ডিন্যান্সের মূল কথা।

সংবাদপত্র হয়ে উঠল রঙ্গভূমি।

লড়াইটা এবার রাজায় রাজায় বা রাজায় প্রজায় নয়, লড়াইটা শুরু হ'ল প্রজায় প্রজায়। রাজা মশাই অবশ্য বেশিদিন দর্শক রইলেন না। নেমে পড়লেন তিনিও ময়দানে।

না নেমে উপায়ই বা কি? লড়াইটা হচ্ছে যে দু'দল প্রজার মধ্যে তার একদল যে তাঁরই সুয়োরানির ছেলে। কিংবা বলা যায়—তারা যে তাঁর বাপের ঠাকুর। স্বয়ং বৃটেনের রাজা রানি যে মহামতি ধর্ম-যাজকদের মান্য করে চলেন, তাঁদেরই ধর্মপুত্রদের পক্ষ না নিয়ে কোম্পানির পরিচালকরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন এতবড় বুকের পাটা তাঁদের ছিল না। তাই মিশনারিদের পক্ষ নিয়ে সংবাদপত্র দমনে মুগুর হাতে নামলেন তাঁরা। তবে মজা হ'ল যুদ্ধটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু রাজায় রাজায়ই দাঁড়িয়ে গেল। কেননা ভারতীয় সংবাদপত্র জগতের নেতা তখন যে রাজা রামমোহন রায়।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের প্রথম সংবাদপত্র। সে কাগজের ভাষা যেমন ছিল ইংরেজি তেমন তার মালিক. প্রকাশক, সম্পাদক সবই ইউরোপীয়। তারপর থেকে ভারতে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে—সবারই ওই একই ধারা।

দেখতে দেখতে এলো ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদ। পাশ্চাত্যের শিক্ষার আলো এতদিনে যেমন পেঁছে গেছে ভারতীয়দের মনের কোনায়, তেমনি পাশ্চাত্যের প্রচার এবং জ্ঞান মাধ্যম সংবাদপত্রের দিকেও নজর গেছে ভারতীয়দের। তারাও মনে মনে একটা উত্তেজনা অনুভব করতে থাকল একটি সংবাদপত্র বের করার জন্য। সে উত্তেজনার পেছনে ক্রিয়া করতে থাকল আরেকটি বোধ—ভারতীয় সংবাদপত্র হবে ভারতের ভাষায় —মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করা হবে নিজেদের দুঃখ কণ্ট, অভাব অনটনের

কথা, প্রচার করা হবে জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর, সন্ধান দেওয়া হবে আলোকিত দুনিয়ার ।

কিন্তু ভারতের প্রথম সংবাদপত্রটি যেমন প্রকাশ করেছিল ইউরোপীয়রা তেমনই দেশীয়ভাষাতে প্রথম সাময়িকপত্রটি প্রকাশের কৃতিত্বও তাদেরই। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে বের করা হয় এই পত্রিকাটি। নাম—'দিগ্দর্শন'। মিশনের পাদরি যোশুয়া মার্শম্যানের ছেলে জন ক্লার্ক মার্শম্যান ছিলেন এর সম্পাদক। মাসিক এই সাময়িক পত্রিকাটি শুধু বাংলা নয়, সমস্ত ভারতীয় পত্র পত্রিকার অগ্রজ।

এই সাময়িক পত্রিকাটির বিষয় বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, মূলত জ্ঞান বিতরণ ছিল এর লক্ষ্য। পত্রিকাটির মাধ্যমে বাঙালীর সাধারণ জ্ঞান এবং সমসাময়িক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা বাড়ানোই ছিল এর কাজ। পত্রিকাটিতে স্পষ্টই বলা হয়েছিল এটি 'যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ'। স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতার স্কুল বুক সোসাইটির কাছে এর চাহিদা গেল বেড়ে। তখনও পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তক তেমন বেশি পাওয়া যেত না। তাই পত্রিকাটি পেয়ে সোসাইটির হাতে চাঁদ পাওয়ার মত অবস্থা হ'ল। তারা একসঙ্গে বহু খন্ড কিনতে থাকেন।

শুধু কেনা নয়, সোসাইটির ১৮১৮-১৯ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দিগ্দর্শন কর্তৃপক্ষকে তাঁরা ওই পত্রিকাটি ইংরেজিতেও প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। সোসাইটির ওই অনুরোধে সাড়া দিয়েই কর্তৃপক্ষ প্রথমে দিগ্দর্শনের ইংরাজী এবং পরে দ্বিভাষিক ইংরেজী বাংলা সংস্করণ বের করেন। দিগ্দর্শনের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১ থেকে ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত, শুধু ইংরেজি ১ থেকে ১৬ এবং ইংরেজি বাংলা দ্বিভাষিক ১ থেকে ১৬ সংখ্যা পর্যন্ত।

১৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সূচীপত্রের ওপর নজর

বোলালেই জানা যাবে এর বিষয়বৈচিত্রের কথা। প্রথম সংখ্যার সূচীপত্রটা এরকম—

আমেরিকার দর্শন বিষয়।— বলুনদ্বারা সদলর সাহেবের আকাশ গমন
হিন্দুস্থানের সীমার বিবরণ।— মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিবরণ।—
হিন্দুস্থানের বাণিজ্য।— শংকর তরঙ্গের কথা।—

সাময়িক পত্রিকা হলেও বাংলা ভাষাতে দিগ্দর্শনের প্রকাশ বাঙালী তথা ভারতীয়দের আবেগকে আরো স্ফীত করল। একথা স্বীকার করে নেওয়া ভাল, এক ধরণের জাতীয়তাবোধের তীব্র আবেগ থেকেই প্রথম ভারতীয় পত্রিকা 'বাঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম। পত্রিকাটি ১৮১৮ খৃষ্টব্দে ১৫ অথবা ২২ মে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকাটির কোন সংখ্যা এখনও পর্যন্ত না পাওয়ায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণের দাবিটিই জোরদার। শ্রীরামপুর থেকে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়েছিল দিগ্দর্শন সম্পাদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৯ মে। তবে একটা কথা, বাঙ্গাল গেজেটি সমাচার দর্পণের আগে কিংবা পরে পরেই প্রকাশিত হোক কলকাতা থেকে কোন ভারতীয় দ্বারা প্রকাশিত সংবাদপত্রের অগ্রদূত যে বাঙ্গাল গেজেটি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ মে 'গবর্নমেণ্ট গেজেট' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কার্যকারণে বাঙ্গাল গেজেটি যদি সমাচার দর্পণের পরে প্রকাশিত হয়েও থাকে তবু ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের ভাবনা শুধু নয়, তৎপরতাতেও বাঙ্গাল গেজেটিরই প্রথম। ওই বিজ্ঞাপনে বলা হয়—

HURROCHUNDER ROY begs leave to infrom his Friends and Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS at No. 45 Chorebagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the

Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language, to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths,

Advertisement for insertion in this Gazette, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same price.

Gentlemen wishing to become subscribers to the Weekly Publication, will be pleased to send their Name to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45 chorebagaun Street, where every information will be thankfully received.

The Price of subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. Calcutta, 12th May, 1818.

এই বিজ্ঞাপন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৩ মে প্রকাশিত সমাচার দর্পণের আগেই বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৯ জুলাই ও 'গবর্নমেন্ট গেজেট' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে হরচন্দ্র রায় জানাচ্ছেন,—

"Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, -- No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he made, and afford him a small share of their Patronage."

এরপর ২৩ এবং ২৪ জুলাই তারিখেও এই একই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল।

এখন 'No publication of this nature having hitherto been before public ......" এই পংক্তিটিকে তুলে ধরে, 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরো কেউ কেউ বলেন, 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণ'-এর আগে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে শ্রীরামপুর থেকে

১৮২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'র প্রথম সংখ্যায় আছে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। এখন এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারত 'বাঙ্গাল গেজেটি-র প্রথম সংখ্যাটি। কিন্তু প্রথম সংখ্যা দূরে থাক 'বাঙ্গাল গেজেটি-র কোন সংখ্যারই সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাই এর জন্ম সময় এখনও অজানাই রয়ে গেছে।

জন্ম সময় যাই হোক, 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাঙালী তথা ভারতীয়দের মনের আবেগ যে প্রকাশের একটা রাস্তা পেয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু কলকাতার প্রথম কাগজ অথবা প্রথম ভারতীয়দের কাগজ হিসেবেই নয়, বাঙ্গাল গেজেটি ভারতীয় সংবাদ-পত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েও ভারতীয়দের কুপ্রথা সম্পর্কে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ জানাবার মত ভাষাও খুঁজে পেয়েছিল। রাজা রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী একটি নিবন্ধ ছেপে পত্রিকাটি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেয়। আর এই সাহসের পেছনে যে রামমোহনের বলিষ্ঠ প্রভাব ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাঙ্গাল গেজেটি-র প্রকাশক এবং মুদ্রাকর ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। হরচন্দ্র রায় ছিলেন প্রেসের মালিক, সম্ভবত সম্পাদকও। হরচন্দ্র রায়ের বাড়ি ছিল শ্রীরামপুরে। রাজা রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভার'-র তিনি ছিলেন এক সক্রিয় সদস্য। সেই সূত্রেই তাঁর মধ্যে রামমোহনের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে। সেই বিকাশের মুহূর্তে সম্ভবত রামমোহন তাঁকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য উৎ-সাহিত করেন। হরচন্দ্র রায় বিলেত থেকে মেসিন আনিয়ে কলকাতার ৪৫ চোরবাগান স্ট্রিটে বেঙ্গলী প্রিন্টিং প্রেস খোলেন। একাজে তিনি মুদ্রাকর হিসাবে পান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে। গঙ্গাকিশোর ছাপার কাজে ছিলেন একজন ওস্তাদ মানুষ। তিনি শ্রীরামপুরের মিশনারি প্রেসে একসময় কম্পোজিটর ছিলেন। পরে কলকাতার ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানায় কাজ করেও তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। শুধু-

তাই নয়, একসময় তিনি বই ছাপিয়ে তা বিক্রি করার ব্যবসাতেও নেমেছিলেন। তাই ছাপার কাজে তাঁর অভিজ্ঞতাটা শুধুই পুঁথিগত নয়, রীতিমত ব্যবহারিক।

হরচন্দ্র রায় এই হাতে কলমে অভিজ্ঞতাসপন্ন মানুষটির ওপরই তাঁর কাগজ ছাপার সমস্ত দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই কাগজটি চলেছিল একবছর অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি এর প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। এই বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে ছিল সম্ভবত গঙ্গাকিশোর এবং হরচন্দ্রর মতবিরোধ। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার বিবরণ থেকে জানা যায়, গঙ্গাকিশোর 'বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়'টি তাঁর গ্রাম বহড়ায় নিয়ে যান।

এই বাঙ্গাল গেজেটি সম্পর্কে একটি কথা বলা যায়, এর প্রকাশের পেছনে রাজা রামমোহন বা তাঁর আত্মীয়-সভার সক্রিয় সমর্থন যেমন ছিল তেমনি এটির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম সংবাদপত্র হিকির বেঙ্গল গেজেট-এর প্রভাবটাও ছিল যথেষ্ট। বলা যায় হিকির বেঙ্গল গেজেটের বাংলাই হচ্ছে 'বাঙ্গাল গেজেটি'। শুধু নাম নয়, বিষয়বিন্যাসেও পত্রিকাটি সম্ভবত হিকিকেই অনুসরণ করে। অন্তত প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে তাই মনে হয়। বাঙ্গাল গেজেটির বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এতে সরকারি বিজ্ঞাপন, আইন ও কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত নানা খবরা-খবর সরল বাংলায় প্রকাশ করা হত। এছাড়া স্থানীয় মানুষের রুচিকর খবর যেমন এতে স্থান পেত তেমনি এতে থাকত দিনপঞ্জী, বিশিষ্ট হিন্দুদের জন্মমৃত্যু এবং বিবাহের খবর। সব মিলিয়ে পত্রিকাটি বাঙালীদের মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রকাশিত হ'ত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বাঙ্গাল গেজেটি স্বল্পস্থায়ী, তার ওপর এর কোন সংখ্যাও পাওয়া যায়নি—তাই কাগজটির সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয়। তবে সরকারি নথিপত্রে তেমন উল্লেখ না থাকায় এটা অনুমান করা বোধহয় ভুল হবে না যে, পত্রিকাটি কোন ব্যাপার নিয়েই সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েনি অথবা পড়ার সুযোগ পায়নি।

বাঙ্গাল গেজেটি উঠে যাওয়ার পর বাংলা পত্রিকা বলতে ছিল কেবল মাত্র সমাচার দর্পণ। পরধর্মের হীনতা অথবা খৃষ্টধর্মের প্রাধান্য প্রমাণ করাটা 'সমাচার দর্পণ' এর উদ্দেশ ছিল না, কিন্তু কোন প্রতিপক্ষ না থাকায় প্রথমদিকে চিঠিপত্রের স্তম্ভে এমন কিছু চিঠি বেরোতে থাকে যাতে সরাসরি হিন্দু ধর্মের ওপর আক্রমণ করা হয়। অন্য কোন কাগজ না থাকায় সেসব চিঠির প্রতিবাদ সমাচার দর্পণে-ই পাঠাতে হোত, কিন্তু দর্পণ সব সময় তা প্রকাশ করত না, বা করতে পারত না। রাজা রামমোহনের এমনি একটি চিঠি দর্পণ প্রকাশ করতে অক্ষমতা জানায়। রামমোহন কিন্তু তাতে চটে গিয়ে নিজেই একটি কাগজ বের করলেন। তার নাম ছিল 'ব্রাহ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন—দি মিশনারি অ্যাণ্ড দি ব্রাহ্মণ নাম্বার ওয়ান' বা ব্রাহ্মণ সেবধি। পত্রিকাটির সম্ভবত তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।

সমাচার দর্পণ এর ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৪ জুলাই সংখ্যায় 'কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশ হইতে কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত' চিঠিটি প্রকাশিত হয়। চিঠিটি পড়েই রামমোহন উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। এটা যে হিন্দু ধর্মের ওপর মিশনারিদের অযথা আক্রমণ সে বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহই রইল না। রাগে রামমোহন সে চিঠির একটি কড়া উত্তর লিখলেন, তারপর নিজের নামে না পাঠিয়ে তাঁর পণ্ডিত শিবপ্রসাদ শর্মার নামে তিনি সেটি সমাচার দর্পণ-এ পাঠিয়ে দেন। দর্পণ কিন্তু চিঠিটি না ছেপে, সে সম্পর্কে লেখে,—

> "শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ শর্মা প্রেরিত পত্র এখানে পঁহুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে পত্রে পূর্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইবার বাধা নাই অন্যথা সর্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই"—
> (১ সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খৃঃ)

দর্পণের এই প্রত্যাখ্যান রামমোহনকে মানসিক দিক থেকে উত্তেজিত করে তুলল এবং নিজেই 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নাম দিয়ে পত্রিকাটি বের করলেন

১৮২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং পরের পাতায় তার ইংরেজি তর্জমা থাকত। এটি শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রকাশিত হলেও এর লেখক যে রামমোহন রায় সে সম্পর্কে লোকের কোন সন্দেহই ছিল না। একদা রামমোহনের সহযোগী পরে প্রতিপক্ষ ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় এসম্পর্কে যা লেখেন তা আবার ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১২ ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত হয়। ভবানীচরণ মন্তব্য করেন,—

> "···· সহমরণ রহিত বিষয়ে তাঁহাকে [ রামমোহন রায়কে ] ইঙ্গরেজী সমাচার পত্র প্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা দুঃখিত নহি ···তিনি ব্রাহ্মণী কেল মেকজিন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সেবধি প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়া মিসনরি প্রভৃতি খ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন ··· ।"

ভবানীচরণের ওই মন্তব্যের মধ্যে শ্লেষের হুল থাকলেও একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটানো, পাশ্চাত্যের জ্ঞানরাজিকে এদেশে পোঁছে দেওয়া এবং সেইসঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মগ্রন্থগুলির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা ছিল রামমোহনের জীবনের অন্যতম ব্রত। জীবনের এই ব্রতটি উদ্‌যাপনের জন্যই রামমোহন তাঁর জীবনকালে অর্থাৎ ১৭৮০ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি পত্র পত্রিকার সঙ্গেই কোন না কোন ভাবে যুক্ত ছিলেন। ওই সময়ে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার মধ্যে ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া, জন বুল ইত্যাদি কয়েকটি ছিল তাঁর মতের তীব্র বিরোধী। অন্যদিকে ক্যালকাটা জার্নাল, বেঙ্গল হরকরা, বেঙ্গল হেরাল্ড ইত্যাদি ছিল তাঁর মতের সমর্থক। এদের মধ্যে ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক সিল্ক বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল খুবই গভীর। অনেকে মনে করেন বাকিংহামের তীব্র প্রশাসন বিরোধিতার পেছনে রামমোহনের ভূমিকাটি ছিল খুবই সক্রিয়। ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ড' এর সঙ্গেও রামমোহন গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এরই মধ্যে মণ্টগোমারি মার্টিন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন,

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার এবং রাজকৃষ্ণ সিংহ এই ছয়জনে মিলে যৌথ কারবার জাতীয় একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের তরফ থেকেই প্রকাশিত হয় বেঙ্গল হেরাল্ড ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৭ মে। সম্পাদক হন মণ্টগোমারি মার্টিন। এঁদের ইচ্ছে ছিল বেঙ্গল হেরাল্ড-এর সহযোগী হিসেবে একই সঙ্গে বাংলা, ফার্সি এবং নাগরী লিপিতে তিনটি পত্রিকা বের করা। সেই মত প্রকাশিত হয় বাংলা পত্রিকা 'বঙ্গদূত'—সম্পাদক হন নীলরত্ন হালদার। অন্যভাষায় কাগজ কিন্তু আর প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ইউরোপে চলে যাওয়ায় এই পত্রিকাগুলির সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্কটা তেমন দীর্ঘ হয়নি। তবে পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে রামমোহনের চিন্তাধারার প্রচার যে ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এসব অবশ্য পরের কথা। এর আগে রামমোহন যেমন ব্রাহ্মণ সেবধি প্রকাশ করেছিলেন তেমনি সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশের ব্যাপারেও নিয়েছিলেন সক্রিয় ভূমিকা।

ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক সিল্ক বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দুজনের চিন্তাধারার মধ্যেও ছিল যথেষ্ট মিল। বিশেষ করে মানুষের স্বাধীন সত্তার বিকাশের ব্যাপারে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন প্রায় একমত। বাকিংহাম তাঁর ক্যালকাটা জার্নাল-এর মধ্য দিয়ে ইংরেজিতে যে ক্রান্তিকারী ভূমিকা নিচ্ছিলেন বাংলা ভাষাতেও তেমন একটা ভূমিকা নেবার জন্য তিনি সম্ভবত রামমোহনকে অনুপ্রাণিত করেন। অন্যদিকে লর্ড হেস্টিংস গবর্নর জেনারেল হয়ে এসে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে যে উদারনীতি অনুসরণ করলেন, কিছু কিছু বিধি নিষেধ যেভাবে তুলে নিলেন তাতেও অনেকে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বলা যায় সেই উৎসাহেরই ফল সম্বাদ কৌমুদী।

এছাড়া সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশের পেছনে আরো একটি কারণ ছিল। সে সময় চালু বাংলা সংবাদপত্র বলতে ছিল শুধু সমাচার দর্পণ।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য-কীর্তন বা অন্যধর্মকে ছোট বা আঘাত না করার একটি নীতির কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, সংবাদ বা সম্পাদকীয় কলমে ঠিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কিছু না লিখলেও পাঠকের মতামতে প্রকাশিত চিঠিগুলিতে অনেক সময়ই হিন্দুধর্মের ওপর সরাসরি আক্রমণ থাকত। এইরকম একটি আক্রমণের জবাব দিতেই প্রকাশিত হয় রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি'। যে কোন কারণেই হোক, সে পত্রিকা বেশিদিন চলেনি। কিন্তু সমাচার দর্পণে হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণ বন্ধ হয় না। তাই হিন্দুরা একটি পাল্টা পত্রিকা প্রকাশের চিন্তা মনে লালন করতে থাকেন এবং সেই বাসনাই প্রসব করে সম্বাদ কৌমুদী।

কলকাতার কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বাদ কৌমুদী নামে বাংলা সাপ্তাহিকটি প্রকাশ করেন। প্রথম থেকেই পত্রিকাটির নীতি নিয়ন্ত্রণে এবং লেখার ব্যাপারে মুখ্যভূমিকা নেন রামমোহন। প্রথম সংখ্যাতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করে বলা হয়,—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।...দেশবাসীর অভাব অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।" পত্রিকাটি বেরুত প্রতি মঙ্গলবার। প্রথম সংখ্যাটি ১৮২১ খৃষ্টাব্দের 8 ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় তা জানা গেছে সমাচার দর্পণের ২২ ডিসেম্বরের একটি খবরে। ওই খবরে সম্পাদক জানাচ্ছেন,

> সম্বাদ কৌমুদী। এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহাতে তিন সংখ্যা পর্যন্ত ছাপা হইয়াছে ইহাতে আমরা অধিক আহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছি যেহেতুক দর্পণ বল কিম্বা কৌমুদী বল অথবা প্রভাকর বল যাহাতে এতদ্দেশীয় লোকদের জ্ঞান-সীমা বিস্তার হয় তাহাতে আমরা তুষ্ট............ ।

সম্বাদ কৌমুদীর প্রথম সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তাই সে কাগজ প্রকাশের পেছনে রামমোহন ছিলেন বা তাতে তিনি নিয়মিত লিখতেন এমন একটা খবরে কৌতূহল হওয়া

স্বাভাবিক। ঠিক কি ভাবে এই মিলমিশ হয়েছিল তা আজ আর জানা সম্ভব নয়। তবে রামমোহন যে কাগজের সঙ্গে ছিলেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সমকালীন নানা লেখায়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি-এপ্রিল সংখ্যায় এশিয়াটিক জার্নাল লেখে, চন্দ্রিকার বিরোধিতা করতেই রামমোহন সম্বাদ কৌমুদী প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির ভাষায়—

"The Cowmoody set up by Baboo Rammohan Roy to counteract the force of the Chandrika, has been engaged in treating on general subjects, taking liberal views on them, though coming only as half the way on religion and politics."

রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাদরি ডবলিউ অ্যাডামও লেখেন,

"He ( Rammohan ) established and conducted two native papers one in Persian, and the other in Bengali, and made them the medium of much valuable political information to his countrymen"—A Lecture on the Life and Labours of Rammohan Roy. by W. Adam, p 20.

সমকালীন এই দুটি উক্তি থেকেই জানা যায়, সম্বাদ কৌমুদীর পিছনে রামমোহনের ভূমিকাটি ছিল মুখ্য। পরবর্তী আরেকটি ঘটনাও অবশ্য একই ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। ভবানীচরণ কাগজটির সম্পাদক হলেও প্রথম ১৩ সংখ্যার পরই তিনি কাগজটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন। রামমোহন পত্রিকাটিতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলে ধর্মহানি এবং পতিত হবার ভয়ে ভবানীচরণ কাগজ থেকে ইস্তফা দেন। কাগজটিতে রামমোহনের ভূমিকা যদি মুখ্য না হতো তাহলে সম্পাদক হিসাবে ভবানীচরণ অনায়াসে রামমোহনের লেখা বন্ধ করে দিতে অথবা অবাঞ্ছিত অংশ গুলি কেটে বাদ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেরকম কিছু না করায় মনে হয়, কাগজটিতে রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা এবং অংশ বেশি ছিল বলেই ভবানীচরণকে কাগজ থেকে সরে আসতে হয়েছিল।

অবশ্য কাগজ যখন বের হয় তখনই এই ধরণের একটি সংঘাতের আশঙ্কা করা গিয়েছিল। কেননা, চিন্তাধারার ক্ষেত্রে রামমোহন এবং ভবানীচরণ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মেরুর মানুষ। তবু তাঁদের মধ্যে সহাবস্থান হয়েছিল একটি সাধারণ লক্ষ্য সামনে থাকায়। হিন্দু ধর্মের ওপর বিধর্মীদের আক্রমণ সম্পর্কে রামমোহন এবং ভবানীচরণ দুজনেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। হিন্দু ধর্মকে যে ওই আক্রমণ থেকে রক্ষা করা দরকার—এব্যাপারেও দুজনে একমত ছিলেন। তাই কাগজ পরিচালনার ক্ষেত্রে একরকম সন্ধি হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। সে সন্ধিটা হ'ল হিন্দুধর্মের স্থিতাবস্থা বা *Status Quo* বজায় রাখা। সেই চুক্তি অনুযায়ীই কাগজের প্রথম দিকের সংখ্যাগুলো বেরুতে থাকে। কিন্তু রামমোহনের মধ্যে যে সংস্কারপন্থী মনটি ছিল—আলোকিত হবার এবং করার যে বোধ ছিল—তা বেশিদিন নিষ্ক্রিয় রইল না। বরং হিন্দুধর্মকে পরধর্মের আঘাত থেকে রক্ষা করার লড়াইয়ের পাশাপাশি তাকে সংস্কৃত করার, তার অনাচারগুলির বিলোপ ঘটানোর ব্যাপারেও তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি। ফলে ভবানীচরণের সঙ্গে তাঁর ঘটল আদর্শের সংঘাত। ভবানীচরণ শিক্ষিত, শক্তিশালী লেখক, কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। হিন্দুধর্মের সবকিছুকেই অপৌরুষেয় বলে মেনে নেওয়ায়ই তাঁর সহজাত অভ্যাস। তার বাইরে নিজের বোধের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে ধর্মকে দেখার ক্ষমতা বা বাসনা কোনটাই তাঁর ছিল না। অথচ আদর্শ-বান মানুষটি আপোস করে চলার নীতিতেও বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই সম্বাদ কৌমুদীতে থেকে মানিয়ে চলা অথবা রুখে দাঁড়ানো কোনটাই না করে তিনি 'জাত ও ধর্ম' বাঁচাতে সম্বাদ কৌমুদীর সঙ্গে সবরকম সংসর্গ ত্যাগ করলেন। ভবানীচরণ সতীদাহের প্রশ্নেই আরো বেশি করে প্রতিক্রিয়াপন্থী রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, যার নেতা তখন রাধাকান্ত দেব তার সঙ্গে হাত মেলালেন। প্রকাশ করলেন সমাচার চন্দ্রিকা এবং একদিন নিজে যে কাগজের সম্পাদক ছিলেন সেই কৌমুদীর সঙ্গে নামলেন লড়াইয়ে। সে লড়াইয়ের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা যাবে

পরে। তার আগে শেষ করা যাক কৌমুদীর সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্কের পর্বটা।

রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর কাগজটির পরিচালন ভার তাঁর বড় ছেলে রাধাপ্রসাদ রায় নিজের হাতে তুলে নেন। কাগজটিতে রামমোহনের অংশ না থাকলে এটা সম্ভব হত বলে মনে হয় না।

তাছাড়া সম্বাদ কৌমুদী প্রথমদিকে অত্যন্ত জনপ্রিয় হলেও সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহনের লেখা প্রকাশিত হতে থাকার পরই তার প্রচার সংখ্যা কমতে থাকে। তা সত্ত্বেও কিন্তু তাতে রামমোহনের লেখা ছাপা বন্ধ হয়নি। নিজের কাগজ না হলে এটা সম্ভব হত কিনা সে-সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা কমার কথা জানা যায় ক্যালকাটা জার্নাল-এর 'ডেঞ্জার অব নেটিভ প্রেস' নামে একটি নিবন্ধ থেকে। তাতে লেখা হয়,—

**The paper which was considered so fraught with danger, and like to explode over all India like a spark thrown into a barrel of gunpowder, has long since fallen to the ground for want of support; chiefly we understand because it offended the cative community, by opposiny some of their customs, and particularly the curning of Hindoo widows····The innocent *Sambad Cowmudy* the object of so much unnecessary alarm, was originally established in the month of December 1821, and relinquished by the original proprietor for want of encouragement in May 1822, after which it was kept alive by another cative till the September following, when, about the commencement of the Doorga Pooja Holidays, it first was suspended, and then fell to rise no more."**

**–The Calcutta Journal, 14 Feb' 1823, PP 618-19.**

জার্নালের এই খবরটি অবশ্য পুরো সত্য নয়, তার কারণ এর পরেও সংবাদ কৌমুদী প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২১ জানুয়ারি সমাচার দর্পণে আমরা দেখছি—

'এক্ষনে শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু রাধাপ্রসাদ রায় কৌমুদী নামে কাগজ করিতেছেন ঐ কাগজের গ্রাহক কেবল সতীদ্বেষী কএক মহাশয়েরা আছেন শুনিয়াছি তাহার ব্যয় নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ মুন্সী ১৬ টাকা আর শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর ১৬ টাকা দেন ইহাতেই তাহার জীবনোপায় হইয়াছে নচেৎ কৌমুদী এতদিনে কোন স্থানে মিলাইয়া যাইতেন........।' সম্বাদ তিমিরনাশক পত্র হইতে উদ্ধৃত।

যাই হোক, রাধাপ্রসাদ রায় শেষ পর্যন্ত কাগজটিকে টিকিয়ে রাখতে পারেননি। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ কাগজটি উঠে যায়।

এসবই আজ ইতিহাস। সম্বাদ কৌমুদীর এই ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, এই পত্রিকাকে একই সঙ্গে দুই বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে। হিন্দুধর্মের যেসব কুসংস্কার শুধু ধর্মের নয়, জাতির উন্নয়ণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, রামমোহন তাঁর নবলব্ধ পাশ্চাত্য চেতনার আলোয় সেই বাধাকে দূরে সরাবার জন্য এই পত্রিকায় একটির পর একটি নিবন্ধ লিখে যেতে লাগলেন, তাঁর এই লেখার তাৎক্ষণিক ফল হ'ল শত্রুবৃদ্ধি। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নানা ভাবেই তাঁকে পযুদস্ত করার চেষ্টা করতে থাকল। এই চেষ্টাতেই রক্ষণশীল হিন্দুরা সম্বাদ কৌমুদীর পাল্টা হিসেবে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৫ মার্চ 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। সম্পাদক সেই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি কলুটোলার ২৫ নং রামমোহন ঘোষের স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকা সম্পর্কে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৩ মার্চ সমাচার দর্পণ-এ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়—

ইস্তাহার। কলিকাতা কলুটোলা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সকল বিজ্ঞ সদ্বিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী নামক সমাচার পত্র ১ প্রথমাবধি ১৩ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার চন্দ্রিকা নামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিগ্দেশীয় বিবিধ সমাচার অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফাল্গুন মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতি সোমবার প্রকাশিত হইবে। এই পত্র গ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে। এবং এতৎ পত্র গ্রহণে আকাঙ্ক্ষী যে মহাশয় হইবেন তাঁহার নাম সম্বলিত পত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটিতে পাঠাইবা মাত্রে তাঁহার নিকট চন্দ্রিকা পত্র পাঠান যাইবেক ইতি।

সমাচার চন্দ্রিকায় অন্যান্য খবর থাকলেও সম্বাদ কৌমুদীর বিরোধিতা করাটাই তার প্রধান কাজ হয়ে উঠল। সম্বাদ কৌমুদী সতী বা সহমরণ প্রথা রদের জন্য উঠে পড়ে প্রচার শুরু করাতে চন্দ্রিকা সহমরণের পক্ষে প্রচার চালাতে গিয়ে কাগজের প্রতি পাতায় রামমোহনের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছে। অবশ্য কৌমুদীও পাল্টা প্রচারে নেমে ভাষাকে খুব একটা বশে রাখতে পারেনি। বরং দুই কাগজের ভাষা অনেকটা তরজার খেউড় পর্যায়ে নেমে আসে। পরস্পরের কুৎসা রটাবার জন্য কাগজ দুটি যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে থাকে তাতে রুচিবান ব্যক্তিরা ক্রমেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। এই বিরক্তিরই প্রকাশ দেখছি ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ৩০ মার্চ 'সমাচার দর্পণে'। দুই কাগজের মসি যুদ্ধের সেই বিবরণ এই রকম—

> প্রেরিত পত্র। ....... সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়েরা পূর্বে এক হইয়া কাগজ প্রকাশ করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহারা ভিন্ন হইয়া সম্বাদ কৌমুদী ও সমাচার চন্দ্রিকা নামে দুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে পরস্পর নিন্দা স্ব ২ কাগজে ছাপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে যেহেতুক সম্বাদ আর সমাচার নামে খ্যাত কাগজ। নানাদেশীয় নানাবিধ নতুন সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল পরগ্লানিসূচক হইলে নামের বিপরীত হয়।...........

এটা অবশ্য লড়াইয়ের একটা দিক। পারস্পরিক এই লড়াই—যার ভাষা নাকি অনেকের কাছে অতি জঘন্য বলে মনে হয়েছিল, তা কিন্তু শুধু এক আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত থাকেনি বরং বেদ এবং বৈদিক ধর্মের সুরক্ষায় এবং অন্যান্য যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি একটা আক্রমণাত্মক আচরণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল এই পত্রিকাগুলির লেখায়। এই প্রথম খৃষ্টবাদ জাতীয় সংবাদপত্র গুলির তীব্র আক্রমণের সামনে পড়ল। এই প্রসঙ্গে 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এর একটি বিশ্লেষণ স্মরণযোগ্য। ওই বিশ্লেষণে বলা হয়,—

> Opposed to each as these papers when, on sati and other questions of their own separation, the both professed to adore the vedas and assumed an offensive attitude towards all other forms of faith. For the first time—christianity now began to be vigorously

assailed from the national press."—Calcutta Review, January 1911, P 27.

তবে সম্বাদ কৌমুদীতে যত না খৃষ্টধর্মের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বলা হয়েছে হিন্দুদের অভাব অভিযোগের কথা, ভারতীয়দের ওপর তথাকথিত ইংরেজদের অত্যাচারের কথা। কৌমুদীর কোন ফাইল এখন পাওয়া না গেলেও এর বিষয়সূচীর কিছু উল্লেখ প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তার 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' বইটিতে উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে সেই বিষয়সূচী হল—

১ "দরিদ্র অথচ সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছাত্রদের বিনাবেতনে বিদ্যাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন।

২ মফঃস্বল, জিলা ও প্রাদেশিক আদালতে 'জুরি' প্রথা প্রবর্তনের জন্য বিনীত প্রার্থনা।

৩ হিন্দুদের জন্য নদীতীরে একটি মাত্র শ্মশান থাকায় অসুবিধা; অথচ খৃষ্টানদের কবরের জন্য বহুল পরিমাণ জমি প্রদত্ত হয়েছে।

প্রথম তিনটি সংখ্যায় এইগুলি আলোচিত হয়েছিল। এছাড়া অন্যান্য সংখ্যায় বিবিধ বিষয়ের আলোচনা হয়। যেমন: ১ বাংলাদেশ থেকে বিদেশের বন্দরে শস্য রপ্তানি বন্ধ করার জন্য আবেদন; ২ বাঙালী মধ্যবিত্তদের পক্ষে য়ুরোপীয় ডাক্তারদের চিকিৎসা পাবার জন্য আবেদন; ৩ কলকাতার রাজপথে ইংরেজ ভদ্রলোকেরা তাঁদের বগিগাড়ি করে যাবার সময়ে দু'পাশের লোকের উপর চাবুক মারেন, চিৎপুর রাস্তার উপর জনতা ঠাকুর দেখবার জন্য যখন ভিড় করে তখন তাদের উপর নির্মমভাবে চাবুক চালোনো হয়—কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এসব নিবারণের জন্য আবেদন।" ইত্যাদি।

এই বিষয় বিন্যাস থেকে বোঝা যায়, কৌমুদী খুব একটা উগ্র ভূমিকা না নিয়ে মোটামুটিভাবে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেয়। তবে সমস্যা তুলে ধরা অথবা প্রতিকার দাবি করার মধ্যে একটা নির্ভীকতার ভাব সহজেই নজরে পড়ে। তাছাড়া হিন্দু ধর্মের ওপর খৃষ্টান পাদরিদের আক্রমণ মোকাবিলায় অথবা সহমরণ

প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করার সময় কৌমুদীর বলিষ্ঠতা রামমোহনের চারিত্রিক দৃঢ়তার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

সম্বাদ কৌমুদীর ক্ষেত্রে তেমন উগ্রতা প্রকাশ না পেলেও রামমোহনের 'মীরাৎ-উল-আখবর' কিন্তু এব্যাপারে সরকারের ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। গবর্নর জেনারেল হয়ে জন অ্যাডাম বিশেষ করে যে পত্রিকাগুলিকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন মীরাৎ-উল-আখবর তার অন্যতম।

মীরাৎ-উল-আখবর ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। কাগজটি ছাপা হোত ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে। প্রথম সংখ্যাতেই রামমোহন এই কাগজ বের করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লেখেন,– —

"সম্পাদক জনসাধারণকে জানাইতেছেন যে, পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য এই শহরে অনেকগুলি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা ফার্সি ভাষায় সুপন্ডিত অথচ ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ—বিশেষত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা—তাঁহাদের পাঠের জন্য একখানিও ফার্সি সংবাদ পত্র নাই; এই কারণে তিনি একখানি সাপ্তাহিক ফার্সি সংবাদপত্র প্রকাশের ভার লইয়াছেন।"

এই পত্রিকাটির মাধ্যমে রামমোহন যে শুধু হিন্দু ধর্মের ওপর খৃষ্টান মিশনারিদের আক্রমণ প্রতিহত করেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তিনি খৃষ্টীয়তত্ত্বের ভ্রান্তির দিকেও আঙুল তোলেন। ব্যাপারটা কি সরকার বাহাদুরের, কি মিশনারি পাদরি কারোই ভাল লাগেনি। বিশেষ করে খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের ওপর তাঁর মন্তব্যে পাদরি এবং শাসককূল একবারে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। ওই একটি কারণেই তারা রামমোহন এবং তাঁর এই কাগজটির ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেন।

ত্রিত্ববাদের অসারতা নিয়ে রামমোহন প্রশ্ন তোলেন," দেহধারী মানুষকে কোন কোন সময়ে দৈবশক্তিবলে তাঁরা ঈশ্বরের সব শক্তি ও গুণের আধার বলেন, অথচ এক টুকরো রুটি ডিভাইন স্পিরিটে পূর্ণ হয়, ক্যাথলিকদের এই বিশ্বাসকে নিন্দা করেন?" রামমোহনের প্রশ্ন, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের একটি অংশ যখন একদিকে দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করছেন, তখন অন্য অংশের সেই বিশ্বাসকে তাঁরা হেয় করেন কী করে?

রামমোহনের এজাতীয় প্রশ্ন যে শাসক প্রভুদের ভাল লাগবে না এটা

জানাই কথা। তাই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র দমনের জন্য গবর্নর জেনারেলের মন্ত্রণা পরিষদের যে দীর্ঘ আলোচনা সভা হয় তাতে ১০ অক্টোবর তারিখে সুপ্রিম কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য উইলিয়াম বাটার-ওয়ার্থ বেইলি দেশীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এক দীর্ঘ ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,—

"বর্তমানে চারিখানি দেশীয় সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হয়; দুইখানি বাংলায় এবং দুইখানি ফার্সিতে। চারিখানি সাপ্তাহিক।… ফার্সি কাগজগুলির নাম—'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল-আখবর।…দ্বিতীয়খানি সুপরিচিত রামমোহন রায়ের। ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্কে সম্পাদকের প্রবণতা আছে—ইহা জানা কথা, এবং সেই প্রবণতার বশে একটি সুযোগ পাইয়া খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে তিনি যেসব মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রচ্ছন্ন হইলেও অনিষ্টকারক।…

ফার্সি এবং বাংলা উভয় ভাষার সংবাদপত্রেই অনেক আপত্তিজনক অংশ আছে। সতীদাহ লইয়া বাংলা সংবাদপত্রে বহু তীব্র আলোচনা প্রকাশ করা হইতেছে। ইউরোপীয় মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে, দেশের লোকেরা স্ব-ইচ্ছার এইসকল আলোচনা চালাইলে মঙ্গলের বিষয় হইবে।"

বেইলি তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণে একটি সত্যস্বীকার অবশ্য করেছেন। তিনি বলেছেন, স্বাধীন দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধু প্রয়োজন নয়, অতি জরুরি ব্যাপার। কিন্তু ভারতের মত দেশে সেইসব সুযোগ সুবিধে সংবাদপত্রকে দেওয়া যায় না। বেইলি এরসঙ্গে ইঙ্গিতে যা বলেছেন, তার সার অর্থ, নিজেদের স্বার্থেই এটা করা যায় না। ওইসঙ্গে বেইলি বলেন, মিশনারিদের পত্রিকাগুলি দেশে জ্ঞানবিতরণে সাহায্য করছে কিন্তু দেশীয় পত্রিকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা এদেশের পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়।

সব মিলিয়ে লর্ড হেস্টিংস তাঁর পারিষদদের মন রাখতেই ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১৭ অক্টোবর ভারতীয় সংবাদপত্রকে কড়া শেকলে বাঁধতে আরো ক্ষমতা চেয়ে ইংলণ্ডে কর্তৃপক্ষের কাছে লিখলেন। অনুমতি

আসার আগেই ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৯ জানুয়ারি হেস্টিংস ইংলণ্ড রওনা হলেন। অস্থায়ী গবর্নর জেনারেল হলেন জন অ্যাডাম।

এই জন অ্যাডাম ছিলেন অত্যন্ত সংকীর্ণমনা মানুষ। অন্যকে কষ্ট পেতে দেখে আনন্দে মেতে ওঠা বা নিপীড়নের যন্ত্রণায় কাতরানো মানুষ দেখে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার মত মানুষ ছিলেন তিনি। তাই অনেকে তাঁকে ছোট ইংরেজ বলে থাকেন। রাজা রামমোহনের জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কলেট তাঁর 'দি লাইফ অ্যান্ড লেটার্স অব রাজা রামমোহন রায়' বইটিতে এই অ্যাডাম সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "The temporary elevation of an inferior official was marked by characteristically official measures for the restriction of liberty." প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় বলতে হয়, "ভারত চিরদিনই ছোট ইংরেজের হাতে অপমানিত হয়েছে ; বড়ো ইংরেজ যা দিতে চেয়েছে, ছোটো ইংরেজ তা সংকুচিত করেছে।"

এই ছোট মাপের ইংরেজ চিরদিনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী। ভারতে তিনি অনেকদিন আছেন। কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারী থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে মুখ্যসচিব এবং এখন একেবারে গবর্নর জেনারেল হয়ে বসলেন। এতদিন তিনি বড় কর্তাদের বারবার বলে এসেছেন, সংবাদপত্রগুলোকে সবসময় চাপের মধ্যে রাখুন, কখনও তাদের ওপর থেকে চাপ আলগা করবেন না, স্বাধীনতার স্বাদ যাতে সংবাদপত্রগুলো না পায় সেদিকে নজর রেখে কড়া আইনকানুন তৈরি করুন। এর আগে হেস্টিংসকেও তিনি বারবার অনুরোধ করেছেন বাকিংহামের ক্যালকাটা জার্নাল পত্রিকাটিই তুলে দিতে। কিন্তু হেস্টিংস তাঁর সে পরামর্শে কানতো দেনই নি বরং সংবাদপত্রের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষকের ( সেনসর অফিসার ) পদটি তুলে দিয়ে সম্পাদকদের ওপরই সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন।

হেস্টিংসের আমলের সেই দিনগুলিতে সংবাদপত্র দমনে তেমন কিছু করতে না পেরে অ্যাডাম রীতিমত ফুঁসেছেন। অন্তরঙ্গজনদের বলেছেন,

এই হেস্টিংসের মত লোকেরাই কোম্পানিকে ডোবাবে। তিনি যদি একবার ক্ষমতা পেতেন তাহলে দেখিয়ে দিতেন।

এবার সেই ক্ষমতা পেয়ে অ্যাডামের একবারে হাতে মাথা কাটার মত অবস্থা। সেইসময়ই বাকিংহাম আবার অ্যাডামের একটি নিয়োগকে সমালোচনা করে ক্যালকাটা জার্নালে একটা কড়া নিবন্ধ লিখলেন। লিখলেন, অ্যাডাম একজন স্কচ তাই স্কচ পাদরি ব্রাইসকে নিয়ম বিরুদ্ধ-ভাবে একাধিক পদে নিয়োগ করেছেন। খবরটা পড়েই অ্যাডাম বললেন, রসো, দেখাচ্ছি তোমায়!

অ্যাডামই তখন গবর্নর জেনারেল। কাউকে তোয়াক্কা করার দায় তখন তাঁর নেই। তাই বাকিংহামকে তিনি বহিষ্কার করলেন। আর ওই-সঙ্গে সংবাদপত্রগুলিকে টিট করতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল একটি অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। এতদিন কেউ যা করেনি, অ্যাডাম তাই করলেন। সংবাদপত্র দমনে ভারতে প্রথম অর্ডিন্যান্স জারির জন্য কুখ্যাত হয়ে রইলেন অ্যাডাম। হেস্টিংস সংবাদপত্রকে যতটুকু স্বাধীনতা দিয়েছিলেন তা হরণ করে অ্যাডাম জারি করলেন মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক ওই অর্ডিন্যান্সটি। অর্ডিন্যান্সটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল ওই বছরের ৪ মার্চ আর একমাস বাদে সুপ্রিম কোর্টে রেজিষ্ট্রি করে জারি করা হ'ল ভারতে সংবাদপত্র দমনের প্রথম কালা অর্ডিন্যান্স।

ওই অর্ডিন্যান্সে বলা হ'ল এখন থেকে জাহাজের খবরাখবর, বিক্রির বিজ্ঞাপন, পণ্যের হাল দর, বিনিময় হার অথবা সম্পূর্ণভাবেই বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ ছাড়া সমস্ত কিছু ছাপা ও প্রকাশ করার জন্য গবর্নর কাউন্সিলের কাছ থেকে মুখ্যসচিবের স্বাক্ষর যুক্ত লাইসেন্স নিতে হবে। ওই লাইসেন্সের আবেদনপত্রে প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং স্বত্বাধিকারীদের নাম ধাম, প্রেসের ঠিকানা, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, ইস্তাহার, বই বা কাগজের নাম অবশ্যই দিতে হবে। প্রকাশক, মুদ্রাকর, মালিকদের কারো ঠিকানা বদল হলে নতুন করে আবেদন করে আবার লাইসেন্স নিতে হবে। গবর্নর জেনারেল ইচ্ছে করলেই আগের লাইসেন্স বাতিল করে

নতুন লাইসেন্সের জন্য আবেদনের নির্দেশ দিতে পারেন। প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছাড়া কোন কিছু ছাপলে বা প্রকাশ করলে প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য চারশ টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে অনধিক চারমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

ওই অর্ডিন্যান্সে প্রেসগুলিকে বৈধ লাইসেন্স ছাড়া কোন বই বা কাগজ ছাপতে নিষেধ করা হয়। নির্দেশ অমান্য করলে হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডও ভোগ করতে হবে।

অর্ডিন্যান্সে কার কাছে কিভাবে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে তা লিপিবদ্ধ করা হয় এবং লাইসেন্স আটক বা প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় ম্যাজিস্ট্রেটদের। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রেসে মুদ্রিত সবকিছুর প্রথম ও শেষ পাতায় মুদ্রাকরের নাম ঠিকানা ছাপার এবং ছাপা কাগজের একটি করে কপি স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাজেয়াপ্ত সাহিত্য বা অন্যকিছুর প্রচারও নিষিদ্ধ করে বলা হয়, প্রথমবার এই বিধি অমান্যকারীর ১০০ টাকা জরিমানা অথবা দুমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং পরের বার থেকে ৮০০ টাকা করে জরিমানা চারমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হবে।

সরকারের এই কালাকানুনের বিরুদ্ধে সবার আগে প্রতিবাদ জানালেন রাজা রামমোহন রায়। মীরাৎ-উল-আখবর বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা পাঠকদের জানিয়েছেন একটি অতিরিক্ত সংখ্যা ছেপে। তিনি বলেন, "এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্যসমাজে নগন্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা (মীরাৎ-উল-আখবর) প্রকাশ বন্ধ করিলাম।"

কাগজের প্রকাশ বন্ধের কতকগুলি কারণও তিনি পত্রিকাটির ওই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন,—

"প্রথমত প্রধান সেক্রেটারীর সহিত যেসকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ

হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানাজাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে—

আব্রুকে বা সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্

বা উমেদ-ই-করম এ খাজা, বা দারবান মা ফরোশ্

অর্থাৎ যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয় কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহাছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়ত অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মানভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে ; এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এইভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ মানুষ স্বভাবতই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহা (গবর্মেণ্টের) নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।—

গদা-এ গোশা—নশিনি ! হাফিজা ! মাখরোশ

রুমুজ ই-মসলিহৎ-ই খেশ্ খুসরোয়ান দানন্দ।

—হাফিজ তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যেসকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া মীরাৎ-উল-আখবর-কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন

উপরোক্ত কারণ সকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতি-শ্রুতিভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ। মীরাৎ-উল-আখবর, শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ।

রামমোহন শুধু মীরাৎ-উল-আখবরের প্রকাশ বন্ধ করেই চুপ করে থাকলেন না, তিনি ওই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেন। সমস্ত কলকাতাবাসীর পক্ষে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বললেন, এই অর্ডিন্যান্স জ্ঞান বিস্তারে বাধা দেবে। সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে দেশী বিদেশী সাহিত্যের কথা জনগণের কাছে পেঁছে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রচার যদি বিঘ্ন সংকুল হয় তাহলে জাতিরই ক্ষতি হবে। এদেশের শিক্ষিতরা যে জ্ঞান অর্জন করে-ছেন তাও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে প্রচার করা যাবে না। তাছাড়া সরকারি কর্মী ও কর্মকর্তাদের অনিয়ম, অনাচার, অত্যাচার বা অন্যায়ের কথাও বিলেতে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। ফলে সরকারও দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা জানতে পারবে না। যে শাসক স্বীকার করেন যে মানুষ ত্রুটি বিহীন নয়, তাঁকে মানতেই হবে যে মানুষ শাসকদেরও অনেক ত্রুটি আছে। এখন সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করলে শাসকরা নিজেদের ত্রুটি অথবা—সাধারণের দুঃখকষ্ট জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন।

সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু রামমোহনের এই আবেদন নাকচ করে দিলেন। বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাকনাউটন তাঁর রায়ে বললেন, পৃথিবীতে এমন কোন শহর, নগর বা স্থান নেই যার অধিবাসীরা কলকাতার বাসিন্দাদের চেয়ে বেশি বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাছাড়া যখন স্বাধীন সংবিধান হবে তখনই যেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করা হয়, তার আগে নয়।

এই রায়ে রামমোহন কিন্তু দমলেন না। তিনি এর বিরুদ্ধে আপিল

করলেন প্রিভি কাউন্সিলে। ওই অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবি জানিয়ে তিনি বললেন, মুঘল সম্রাটদের মধ্যেও অনেকে অত্যাচারী ছিলেন কিন্তু তাঁরাও সংবাদ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কোনরকম বাধানিষেধ আরোপ করেননি। তাঁদেরও জ্ঞান ছিল, এই প্রাচুর্য, এই প্রলোভনের দেশে ক্ষমতার অধিকারীরা সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। তাদের সেই স্বৈরাচারী প্রবৃত্তিকে সংযত করার কাজে সংবাদপত্রই মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে।

আবেদনে রামমোহন এদেশের মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী কোন আইন যাতে এদেশের শাসনকর্তৃপক্ষ জারি করতে না পারেন তার নির্দেশ দিতে বলেন প্রিভি কাউন্সিলকে। ওইসঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় রাখার এবং এদেশের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একটি কমিশন পাঠানোর এবং শাসনের অত্যাচারে জনগণ যাতে উপদ্রুত না হয় তার ব্যবস্থা করার কথাও তিনি বলেন।

প্রিভি কাউন্সিলও আবেদন অগ্রাহ্য করল। কিন্তু ততদিনে দেশবাসীর মধ্যে একটি নির্ভীক চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তাই প্রিভি কাউন্সিল অর্ডিন্যান্সটি বহাল রাখলেও জাতি কিন্তু প্রগতির প্রেরণা পেল। ইংরেজ রাজের সঙ্গে রাজা রামমোহনের এই লড়াই দেশের মানুষকে একটা শক্ত বাস্তব ভূমিতে দাঁড় করাল। সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নিজের স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার শক্তি অর্জন করল। আইন যা দিল না, আন্দোলন মানুষকে তাই দিল—প্রগতির পক্ষে—স্বাধীনতার পক্ষে সমস্ত ভারতবাসীই সরব হল।

বড় ইংরেজ নব-জাগৃতির উন্মেষ ঘটিয়েছে ভারতীয় জীবনে, ছোট ইংরেজ নিজের অজান্তেই ভারতবাসীর মনের বারুদে আগুন দিয়ে স্বাধীনতার জন্য বিস্ফোরণের পথ করে দিয়েছে তৈরি।

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে'—এটা নিছক কোন কবি কল্পনা নয়, এটা সত্য। যখন স্ক্রু বা নাটবল্টুতেও সীমাহীন প্যাঁচ দিতে যাওয়া হয় তখন তার প্যাঁচটাই যায় কেটে। বৃটিশ শাসনে ভারতের অবস্থাটাও হ'ল তাই।

প্রথম থেকেই বড় ইংরেজের চেয়ে ছোট ইংরেজের দাপটটা এদেশে দেখা গেছে বেশি। তার সেই দাপট কখন যে অত্যাচার হয়ে নির্যাতিতের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে তা সে টের পায়নি কখনই। বড় ইংরেজের উদারতা যখন অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীকে বৃটেনের অনুরক্ত করে তোলে সেইসময় ছোট ইংরেজের সংকীর্ণতা তাদের মনে ইংরেজ বিরোধিতা তীব্র করে তোলে। সেই বিরোধিতা থেকেই জন্ম নেয় স্বাধীনতার স্পৃহা।

ওই অর্থে দাক্ষিণ্য দেখিয়ে বড় ইংরেজ ভারতের যত না উপকার করেছে, যত না দিয়েছে সে ভারতকে তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার করেছে ছোট ইংরেজ। সব কিছু কেড়ে নিয়ে সে সমস্ত অন্তরটাকে ভরিয়ে দিতে পেরেছে স্বাধীনতার অভাববোধে—স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের মানসিকতাটা তৈরি করতে পেরেছে অতিসহজে।

ছোট ইংরেজ অ্যাডাম ভারতের সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে কাড়তেই জারি করলেন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের প্রেস অর্ডিন্যান্স। ওই অর্ডিন্যান্সের সমর্থনে বলা হল,—"কেবল ইংরেজি নয়, ফার্সি, বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার দৈনিক ও সাময়িক পত্রে সরকারি প্রশাসন, সামরিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে অযৌক্তিক ও থামোকা মন্তব্য-

গুলিই শুধু নয়, সুভদ্র আলোচনাও দেশীয় শক্তির মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করে, মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের ভারতীয় প্রজাদের মনকে অশান্ত অস্থির করে তোলে আর তার ফলে বিপন্ন করে তোলে ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের নিরাপত্তাকে।"

বৃটিশ শাসনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোট ইংরেজের এই অত্যাচার, অন্যায় অবিচারও যে ভারতবাসীর মনে অসন্তোষের সৃষ্টি করছে তা কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে ছোট ইংরেজের নজরে আসত না। বড় ইংরেজ কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে থেকেই ভারতীয়দের মনের সেই ধিকি ধিকি আঁচের উত্তাপটা টের পেত। পেত বলেই সে এমন কিছু ব্যবস্থা নিত যাতে কিছু দিনের জন্যও সে আগুন চাপা পড়ত ছাইয়ের নিচে। ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্য নয়, বৃটিশ শাসনে আরো সংহতভাবে ভারতবাসীকে রাখার জন্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটত এই দাক্ষিণ্য ও উদারতার প্রকাশ।

অ্যাডাম সংবাদপত্রের ওপর কালা কানুন জারি করার পরেও এক-ধরণের আত্মপ্রসাদ লাভ করেই 'বেঙ্গল হরকারু'র সম্পাদককে এক চিঠি দিয়ে বোঝাতে চান তাঁর আইনটা খোলসে খুব কড়া হলেও অন্তরে বেশ কোমল। তাঁর কথায়,—

"প্রেস রেগুলেসনের ধারাগুলি যদি আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করা হোতো, তাহলে প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রগুলিকে ভৎ'সনা অথবা তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করতে হোতো। নিয়ন্ত্রণ আইনগুলিকে আরো কড়া করতে হোতো, সংযোজন করতে হোতো নতুন নতুন ধারার। কিন্তু সরকার যতক্ষণ পারেন ততক্ষণ সম্পাদককের বিচারবুদ্ধির ওপর সবকিছু ছেড়ে দিতে চান এবং জনস্বার্থ বিঘ্নিত বা বিপন্ন না হলে কখনই হস্তক্ষেপ করতে চান না।"

অ্যাডাম তাঁর বক্তব্যের সমর্থনেই আত্মগতভাবে যেন বলেন, সরকার উদার বলেই, সংবাদপত্রের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চান না বলেই, ইংরেজি মালিকানায় ইংরেজি কাগজগুলিকে নিয়মিত হুঁশিয়ারি পাঠিয়েই ছেড়ে

দিচ্ছেন। ক্যালকাটা জার্নাল বা ক্যালকাটা ক্রনিকল ছাড়া কোন ইংরেজি কাগজেরই লাইসেন্সও কেড়ে নেওয়া হয়নি।

কথাটা সত্যি। কিন্তু ওইসময়ই দেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে বঞ্চিত করা হয়েছে ডাকের সুযোগ সুবিধে থেকে, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারি বিজ্ঞাপন। সরকার বিভিন্ন বিভাগের জন্য যেসব কাগজ কিনতেন তা কেনাও বন্ধ হতে থাকল। এককথায় অ্যাডাম ভারতীয় মালিকানার ভারতীয় ভাষার কাগজ আর ইংরেজ মালিকানার কাগজগুলোর মধ্যে বিভেদের একটা স্পষ্ট সীমারেখা টেনে দিলেন। এরই ফলে ভারতে সূচনা হল 'অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস'এর।

আবার এই কড়াকড়িই ভারতীয়দের মনে সংবাদপত্র প্রকাশের বাসনাকে করল তীব্র। বাধা পেয়ে দুর্বার হয়ে উঠল ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। বিঘ্ন চূর্ণ করার সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠতে থাকল ভারতবাসী এইসব কাগজ প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

এরই মধ্যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। এর আগে তিনি ছিলেন মাদ্রাজের গবর্নর। সে সময় সংবাদপত্র সম্পর্কে তাঁকে খুব একটা সহিষ্ণু মনে হয় নি। বরং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিপক্ষেই কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু এখানে এসে তাঁর আগের মতের বেশ পরিবর্তন হ'ল। তাঁর এই মত পরিবর্তনের পেছনে কাউন্সিলের সদস্য স্যার চার্লস মেটকাফের মস্ত ভূমিকা ছিল বলে সবার ধারণা। তাঁর বুদ্ধি এবং পরামর্শেই তিনি সংবাদপত্রর সম্পর্কে নিয়েছিলেন বেশ খানিকটা উদার নীতি। অন্য-দিকে বৃটেনে ভারত সম্পর্কে যে নতুন মনোভাব দেখা যাচ্ছিল তার সুযোগ নিয়ে তিনি ভারতে নানা সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। বহু ব্যাপারেই প্রকাশ পেতে থাকল তাঁর উদারমনের প্রকাশ। বিশেষকরে সমাজ সংস্কার এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে তাঁর দান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করেন ভারতবাসীরা।

বেন্টিঙ্কের শাসনকালের প্রথম দুটি বছর কিন্তু খুব একটা শান্তিতে

কার্টোন। সেসময় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। অনেক ব্যাপারেই বেণ্টিঙ্ক তাঁর কাছ থেকে বাধা পেতে থাকেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রে'র ( ১৮৩০ - ১৮৩৪ খৃঃ ) আমলে বেণ্টিঙ্ক ভারতে তাঁর বিভিন্ন সমাজ সংস্কারের কাজে ঢালাও সমর্থন পেতে থাকেন। সেই সমর্থনের জোরেই ভারতের সামাজিক ইতিহাসে তিনি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটান সতী প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে। ওইসঙ্গে কুখ্যাত ঠগী বা ঠ্যাঙারেদের সম্পূর্ণভাবে দমন করে ভারতবাসীর মনে তিনি নিরাপত্তার ভাবটি ফিরিয়ে আনেন।

এদেশের সমাজজীবনে এই সব পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে বেণ্টিঙ্ক সক্রিয় সমর্থন পেয়েছেন তাঁর কাউন্সিলের সদস্য মেটকাফ এবং মেকলের কাছ থেকে। আইনবিষয়ক সদস্য মেকলের সাহায্যেই বেণ্টিঙ্ক এদেশের সরকারি ও আদালতের ভাষা হিসাবে ফার্সি'র বদলে ইংরেজির প্রবর্তন ঘটান। একই সঙ্গে তিনি সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিতে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষার প্রচলন করেন এবং ইংরেজিকেই করেন শিক্ষাদানের মাধ্যম। এসব কারণেই বলা হয়ে থাকে, ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয় ঘটিয়েছেন বেণ্টিঙ্ক। তাঁর সময়েই সারা দেশ অনুভব করে এক উদারনীতির আন্তরিক স্রোতকে। প্রশাসনিক স্তরে উদারতার স্রোত বইয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেণ্টিঙ্ক সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও অবসান ঘটান অনুদার নীতির। নতুন সেই নীতির আবহাওয়া সংবাদপত্রজগৎ অনুভব করে তারা আর নির্যাতিত হচ্ছে না, তাদের স্বাধীনতায় কেউ হাত দিচ্ছে না। এই অনুভব, এই মানসিক প্রশান্তি সেই সময়ে ভারতীয় সংবাদপত্রের বিকাশে এক মুখ্য ভূমিকা নেয়।

তবে লর্ড বেণ্টিঙ্কের কার্যকাল দেখে কেউ যদি তাঁকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অতন্দ্রপ্রহরী মনে করেন, সেটা হবে নেহাতই ভুল সিদ্ধান্ত। বরং মাদ্রাজের গবর্নর হয়ে বেণ্টিঙ্ক যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর মনোভাব ছিল, ক্ষমতার চাবুক চালাও, সংবাদপত্রের গলা টিপে রাখ,

তাহলেই সবকিছু ঠান্ডা থাকবে। কেউ ট্যাঁ ফুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারবে না।

কিন্তু বেন্টিঙ্কের কপালে আছে, সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস-এর পূর্ণলাভ। তাই গবর্নর জেনারেল হয়ে পরিষদ হিসেবে তিনি পেলেন মেটকাফকে। মেটকাফ আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাসী। যখনই সংবাদপত্রের ওপর বিধিনিষেধ চাপাবার কথা ওঠে অমনি মেটকাফের কন্ঠে শোনা যায় বিরোধিতার সুর। তিনি বলে ওঠেন, সংবাদপত্র স্বাধীন থাকবে—এটাই বিশ্ববাসী চান বলে আমার বিশ্বাস। স্বাধীনতা অবশ্য অবাধ হতে পারে না। দেশের আইনকে তার মেনে চলতে হবে — ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হতে পারে এমন কোন কাজ থেকেও তাদের বিরত থাকতে হবে। আমার ধারণা, ভারতের সংবাদপত্রগুলি তাই করছে। তাদের কন্ঠরোধ করার জন্য নতুন কোন ব্যবস্থা নেবার দরকার নেই।

মেটকাফের এই ধারণাটা আস্তে আস্তে ঠাঁই করে নিয়েছিল বেন্টিঙ্কেরও মনে। তাই মাঝে মধ্যেই সংবাদপত্র দখলের জন্য মুখিয়ে উঠলেও, শেষ পর্যন্ত কিন্তু বেন্টিঙ্ক বলেন, 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে কোন সরকারি কাজের সমালোচনা করার অধিকার সংবাদপত্রের থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। সেই সমালোচনা যাতে রাজদ্রোহের পর্যায়ে না যায় সেটা শুধু দেখতে হবে। আমি অবিলম্বে এজন্য একটি নীতি তৈরি করতে চাই।'

এটা বেন্টিঙ্কের একবারে বিদায়বেলার অনুভূতি। কিন্তু তার আগেও সংবাদপত্রের প্রতি মমত্বের অনেক নজিরই তিনি রেখে গেছেন। আর বেন্টিঙ্কের এই সুকুমার মনোভাবটি গড়ে তোলার কারিগর হলেন মেটকাফ। মাত্র একবারই তিনি এব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়।

সেটা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রথম বর্মা যুদ্ধের খরচ খরচায় সরকার একবারে জেরবার। যুদ্ধের জন্য যা খরচ হয়েছে তা মেটাতে গিয়ে সরকারি ভাঁড়ার প্রায় ফাঁকা। শূন্য ভাঁড়ারকে পূর্ণ করার জন্য

সরকার বেশ কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিল। সেই ব্যবস্থারই বলি হ'ল সেনাবাহিনীর অফিসাররা। তাদের যে ভাতা দেওয়া হত তা কমিয়ে অর্ধেক করা হল। ফলে অসন্তোষের চোরাস্রোত বইতে থাকে সেনাদলের মধ্যে। বাইরেও চলতে থাকে সরকারের তীব্র সমালোচনা। সংবাদপত্রের পাতাতেও উঠল সমালোচনার ঢেউ।

অবস্থা দেখে বেন্টিঙ্কের মনে পড়ে গেল মাদ্রাজ সেনাদলের ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের কথা। তিনি যেন সবকিছুর মধ্যে দেখতে থাকলেন নতুন একটা বিদ্রোহের—কালো ছায়া। তাই তিনি অর্ধভাতা সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে যে কোন রকম আলোচনা নিষিদ্ধ করে এক নির্দেশ জারি করলেন। মুখ্যসচিব উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলি এব্যাপারে ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বড় সমর্থক। মেটকাফ কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'আমি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমার ধারণা, তাতে আমরা যে কোন কুকর্মকে ঠেকাতে পারি। আমার সেই ধারণা থেকে সরে আসার কোন কারণ এখনও ঘটেনি। তাই এই নিষেধাজ্ঞা জারি না হওয়াই ভাল।'

মেটকাফের সে কথায় সেবার কান দেননি বেণ্টিঙ্ক। তবে পরে কাজ করতে করতেই তিনি বুঝেছিলেন এদেশের শাসন এবং সমাজ সংস্কারের জন্য যেসব ব্যবস্থা নিতে চলেছেন, তা সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। তাঁর নীতির সমর্থনে এগিয়ে এসে সংবাদপত্রগুলি যদি জনমত সংগঠিত করতে থাকে তাহলে সংস্কারের কাজটা যে অনায়াস হয়ে উঠবে, এই বোধটা দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেন্টিঙ্ক সংবাদপত্রের ওপর থেকে বাধা নিষেধ তুলে নিয়ে এক মুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। বিশেষ করে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলি তাঁর কাজকে অনেক সহজ করে দিতে পারে বলে মনে হওয়ায় তিনি প্রচ্ছন্নভাবে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহ দিতে থাকেন।

তার আগে অবশ্য তিনি ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির প্রচার সংখ্যা,

জনমনের ওপর তার প্রভাব ইত্যাদি জানার জন্য এক তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের এক কার্যবিবরণীতে জি, স্টকওয়েল জানাচ্ছেন, ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দু'টি ( বেঙ্গল হরকারু এবং জন বুল ) দৈনিকের প্রচার সংখ্যা যথাক্রমে ১৫৫ এবং ২০৪। দ্বিসাপ্তাহিক ইণ্ডিয়া গেজেট, গবর্নমেন্ট গেজেট এবং ক্যালকাটা ক্রনিকল-এর প্রচার সংখ্যা যথাক্রমে ২৮০. ২৯০ এবং ১৮৯। ফার্সিভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিকটির ( সম্ভবত জাম-ই-জাহান-নুমা ) প্রচার সংখ্যা মাত্র ২৬।

সংবাদপত্র সম্পর্কে এক রিপোর্টে এ, স্টার্লিং জানাছেন, ১৮২৪ থেকে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কলকাতা থেকে দেশীয় ভাষায় ৬টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে তিনটি বাংলা, দু'টি ফার্সি এবং একটি হিন্দী। এছাড়া শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হত একটি বাংলা এবং একটি ফার্সি পত্রিকা। ১৮২৬-২৭ খৃষ্টাব্দেই কলকাতার দু'টি ফার্সি পত্রিকার মধ্যে একটি এবং হিন্দী পত্রিকাটি উঠে যায়। অর্থনৈতিক কারণেই অবশ্য এসব কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। এগুলির প্রচার সংখ্যা যা ছিল তাতে সরকারি অনুদান বা সমর্থন ছাড়া এগুলির টিকে থাকাটা ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার।

স্টার্লিং সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করেন, এদেশে সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ খুব একটা উজ্বল নয়। তাঁর মতে ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র একটা বিলাসের ব্যাপার—কেন না কলকাতার বাইরে এসব কাগজের কোন চাহিদা নেই এবং এদের টিকে থাকার জন্য সরকারি সাহায্যই একমাত্র ভরসা।

স্টার্লিং অবশ্য মুড়ি মিছরি একদর করেননি। বাংলা সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ণটা খুবই উঁচু। তিনি বলেছেন, কলকাতার বাঙালী সম্প্রদায় যেভাবে বাংলা সংবাদপত্রের সমর্থনে এগিয়ে আসেন তাতে বাংলা কাগজগুলি শুধু স্বনির্ভরই নয়, অন্যকে সাহায্য করার মত অবস্থায় রয়েছে তারা।

যাইহোক, ওইসময়ে সংবাদপত্রের প্রসার সম্ভব হয়েছে লর্ড বেন্টিঙ্কের উদার নীতির ফলেই। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল ১৬। অন্যদিকে ইংরেজি দৈনিক এবং সাময়িকপত্র মিলিয়ে ৩৩টি কাগজ প্রকাশিত হত কলকাতা থেকে। এদের মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ২২০৫।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি একটি বড় ধরণের অর্থসংকটের মধ্যে পড়ে। সেই অর্থনৈতিক সংকটের ধাক্কা সংবাদপত্র জগতের ওপরও এসে লাগে। ফলে বিশেষ করে ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি বন্ধ হয়ে যায়, কয়েকটি মালিকানা বদল হয়, এবং বেশ কয়েকটি কাগজ সংযুক্তির মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখে।

অর্থনৈতিক এই সংকটের মধ্যেও লর্ড বেন্টিঙ্কের উদারনীতি সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে কি আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল তা বোঝা যায় ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের তালিকাটি দেখলে। ওইসময় ১৯টি নতুন কাগজ প্রকাশিত হয়েছিল।

ওই উনিশটি পত্রিকার অন্যতম হল 'সংবাদ প্রভাকর'। সংবাদ প্রভাকর শুধু তখনকার দিনের একটা বাংলা কাগজ নয়; আজও ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটা দিকচিহ্ন—একটা মাইল-স্টোন। সংবাদ প্রভাকরই ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিকের অগ্রদূত। আর অগ্রসৈনিকের ভূমিকায় নেমে যে বীরত্ব, যে দক্ষতার পরিচয় প্রভাকর দিয়েছে আজও তার নজির মেলা ভার।

সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ছিলেন স্বভাব কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তকে শুধু স্বভাব কবি না বলে স্বভাব সাংবাদিক বলাই বোধ হয় সঙ্গত। সাংবাদিক জন্মায়, তৈরি করা যায় না—একথাটা ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে আর কারো ক্ষেত্রে বোধ হয় এত সত্য নয়। সব সময় চোখ কান খোলা রেখে চারপাশের সবকিছুকে দেখা অথচ কোনকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়ার অসাধারণ গুণটি ছিল ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে।

সেই সাংবাদিকসুলভ গুণটির প্রকাশ যে শুধু সম্পাদনার ক্ষেত্রে দেখা গেছে তা নয়, তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রেও সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে ওটি। সবকিছুকে দেখার গুণটির জন্য তিনি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে এমন সব জিনিষকে দেখেছেন, এমনভাবে তার বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন — যেটা একমাত্র সৎ, দক্ষ সাংবাদিকের পক্ষেই সম্ভব।

সহজাত সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই ভবিষ্যৎ বক্তার ভূমিকায় বসে তাঁর সংবাদ প্রভাকর সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি লিখেছিলেন—

কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা, পায় প্রভাকর॥

ব্যাখ্যা না করেও বলা যায়, ঈশ্বর গুপ্ত আজ আর গুপ্ত নন, সংবাদ-পত্রকে তাঁর সংবাদ প্রভাকর যে আলোক সরণির ঠিকানা দিয়েছে তা আজও যে কোন পত্রিকার লক্ষ্য।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়েছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে। প্রস্তুতি কিন্তু তারও আগের।

১২১৮ বঙ্গাব্দের ২৫ ফাল্গুন ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম কাঁচরাপাড়ার কাছে কুমারহট্টে। ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বর গুপ্তের লেখাপড়ার প্রতি ছিল কেমন যেন একটা অবহেলা। অথচ তখন থেকেই মুখে মুখে কবিতা লেখায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে একধরণের নির্ভীকতার জন্ম তাঁর ছোটবেলা থেকেই। বয়স যখন খুবই কম সে সময় তিনি হারান তাঁর মাকে। বাবা আবার বিয়ে করলেন। ঈশ্বর গুপ্ত কিন্তু এটাকে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি একরকম পালিয়েই এলেন কলকাতায় মামার বাড়িতে। কলকাতায় এসে যেমন শুরু হ'ল ইংরেজি পড়া, তেমনি প্রস্তুতি চলল ভাবী জীবনের।

ঈশ্বরচন্দ্রের দাদামশাইয়ের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ির বিশেষ জানাশোনা ছিল। সেই জানাশোনার সূত্রেই কলকাতায় এসে ঈশ্বর

গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটল পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের নাতি যোগেন্দ্রমোহনের।

এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ। যোগেন্দ্রমোহনেরও কবিতা লেখার ঝোঁক। তাই ঈশ্বরচন্দ্রর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব জমে উঠতে বেশি দেরি হল না। দুজনে মিলে চলল কাব্যচর্চা। সেই কাব্যচর্চার ফাঁকে হঠাৎ-ই উঠল কথাটা—একটা পত্রিকা বের করলে কেমন হয়?

কথাটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই যোগেন্দ্রমোহন বললেন, হ্যাঁ, এখন নিজেদের একটা পত্রিকার বড় দরকার। ঈশ্বর, তুমি পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা কর।

ঈশ্বর গুপ্ত কিন্তু ভাবেন, ব্যবস্থা কর বললেই তো ব্যবস্থা হয় না। পত্রিকার লেখাটা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু প্রেস, খরচ ইত্যাদি আসবে কোথা থেকে। তাই ঈশ্বর গুপ্ত একটু দ্বিধা নিয়েই বলেন, কিন্তু…

কিন্তু'র ভাবনা আমার। তুমি দেখ, পত্রিকা বের করার জন্য কি কি করতে হয়।

বন্ধুর কথায় বুকে বল পান ঈশ্বরচন্দ্র। তৎপর হয়ে ওঠেন পত্রিকা বের করার জন্য। ঠিক হয় এখন পত্রিকা বের হবে সপ্তাহে সপ্তাহে। তারপর অবস্থা দেখে ব্যবস্থা। পত্রিকার নাম দেওয়া হ'ল সংবাদ প্রভাকর। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

ওদিকে চোরবাগানের ৩২ নং সিমলায় যোগেন্দ্রমোহন একটি ছাপাখানা বসালেন। ছাপাখানার নামও দেওয়া হল সংবাদ প্রভাকর প্রেস।

এরপর পত্রিকার জন্য লাইসেন্স নেওয়া। পাথুরিয়াঘাটা থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আবেদন করলেন পত্রিকার লাইসেন্স মঞ্জুরের জন্য। বয়স তখন তাঁর প্রায় উনিশ। কিন্তু এইসময়ই প্রকাশ পেল তাঁর মাতৃভাষার প্রতি দরদ এবং তীব্র জাতীয়তাবোধের। লাইসেন্সের আবেদনপত্রটি ইংরেজিতে লেখা কিন্তু আবেদনকারীর নামের জায়গায় তিনি গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লিখলেন--ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। এই আবেদনপত্রর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেল সংবাদ প্রভাকর-এর ভবিষ্যৎ ছবিটি।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্রের লাইসেন্স মঞ্জুর হল। ২৮ জানুয়ারি, বাংলার ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘ প্রথম প্রকাশিত হ'ল সাপ্তাহিক সংবাদ প্রভাকর। প্রথম সংখ্যাটি দেখেই সমাচার চন্দ্রিকা তার ৩ ফেব্রুয়ারির সংখ্যায় লেখে.

> পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক সম্বাদ প্রভাকর নামক সমাচারপত্র এতন্নগরে প্রকাশ পাইবার কল্পনা জল্পনা হইয়াছিল সংপ্রতি গত ১৬ মাঘ শুক্রবার তাহার প্রথম সংখ্যা প্রচার হইয়াছে তদবলোকনে বোধ হইতেছে যে তৎপ্রকাশক হিন্দু ধর্মনাশেচ্ছুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন যেহেতুক প্রভাকর প্রকাশকের যুক্তি উক্তিদ্বারা শক্তি ভক্তি ব্যক্ত হইয়াছে সাধু মহাশয়েরা এ সম্বাদ পত্রের সম্বাদ শুনিলে ঔদাস্য না করিয়া অবশ্য সন্তুষ্ট হইবেন।

সংবাদ প্রভাকর-এর পরিকল্পনায় নতুনত্ব আনার চেষ্টা করলেন ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম সংখ্যা থেকেই। খবরের কাগজ তাই দেশবিদেশের খবর এতে থাকতই, আর তার সঙ্গে থাকত আরও নানা পাঁচমিশেলি খবর। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য—সব বিষয়েই থাকত নানা উল্লেখযোগ্য রচনা। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্যটা এদিক থেকে ছিল রীতিমত ভাল। প্রথম থেকেই তিনি লেখার ব্যাপারে পেয়েছিলেন তখনকার পণ্ডিত এবং সেরা লেখকদের সাহায্য। তাঁদের সহযোগিতাতেই সংবাদ প্রভাকর প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্করত্ন, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতির মত লেখকরা যেমন এতে লিখতেন তেমনি দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিক লেখাগুলিও প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাতেই।

সংবাদ প্রভাকর-এর বয়স যখন ১৬ সেই সময় ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরে পুরনো জীবিত লেখকদের এক তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকার ২৯ জনের মধ্যে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, গদাধর তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমনির মত সংস্কৃতজ্ঞদের পাশাপাশি নীলরতন হালদার, অক্ষয়কুমার দত্ত, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, কানাইলাল ঠাকুর, ব্রজমোহন সিংহ প্রভৃতির মত লেখকদের নামও ছিল। ১২৫৪ সালের ২ বৈশাখের ওই সংখ্যা থেকে আরো জানা যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই পত্রিকায়

নিয়মিত লিখতেন, লিখতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ রায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, হরচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতির মত তৎকালীন বঙ্গ সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষরা। এঁরা সবাই এক মতাবলম্বী ছিলেন তা নয়। কিন্তু প্রভাকর প্রায় নিরপেক্ষ থেকে বিভিন্ন মতের মানুষের বক্তব্য পাশাপাশি ছেপে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন মতের ও পথের লেখকদের রচনা প্রকাশের পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভে কিন্তু এক নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন। ভাষার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি ঘটালেন একটা বিরাট পরিবর্তন। বক্তব্যকে সোজাসুজি না বলে তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মধ্যে তা প্রকাশ করে তিনি একদিকে যেমন অভিনবত্ব আনলেন, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের কাছেও সম্পাদকীয়কে অত্যন্ত জোরালো ভাবে উপস্থাপিত করে তাদের চেতনাকে বারেবারে দিতে থাকলেন নাড়া। সেইসঙ্গে কোন কাগজ যে শুধু সম্পাদকীয়র ক্ষেত্রে নিজের মতবাদ প্রকাশ করে বিরুদ্ধবাদীদের মতকেও প্রবন্ধ বা সংবাদ আকারে কাগজে প্রকাশ করতে পারে তার একটা কার্যকর নজির সৃষ্টি করলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরে স্বাজাত্যবোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। ধর্মের প্রতিও ছিল তাঁর একটা আন্তরিক আকর্ষণ। তখনকার বাংলা সমাজ যে ভাবে প্রগতির নামে এক উৎকেন্দ্রিক মনোভাবের শিকার হচ্ছিল, জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে ইংরেজি ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ করছিল, দেশের সম্পদকে ছেড়ে বৃটিশ কৃষ্টির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছিল তাতে ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এক নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করছিলেন তিনি অন্তরে। বিপথগামী বঙ্গবাসীর জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি তাই কথার চাবুক হাতে আঘাত করতে থাকেন জাতিকে তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধের মধ্য দিয়ে। শ্লেষে, ব্যঙ্গে, ক্ষুরধার মন্তব্যে তিনি বাঙালীর চিত্তকে আহত করে তাকে তার ঘরের দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছিলেন তিনি। বলা যায়,

তাঁর এই চেষ্টার ফলে বাংলা এবং বাঙালী আরো অধঃপতিত হবার হাত থেকে অনেকটাই রক্ষা পেয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জীবন ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন, দেশের এই অধঃপতনের মূলে রয়েছে পরাধীনতা। যতদিন না দেশ স্বাধীন হচ্ছে ততদিন শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার ইচ্ছেটা তারমধ্যে তেমনভাবে দানা বাঁধবে না। তাই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখার মধ্য দিয়ে পরাধীন জাতির নিদারুণ মর্মবেদনাকে প্রকাশ করেছেন, দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করেছেন। ইংরেজ অনুকরণকারী নব্যবঙ্গের প্রতি কঠিন বিদ্রূপে তিনি বলতেন,

> "যৎকালীন এক জাতির একরূপ স্বভাবান্বিত ব্যক্তি এক ধর্মাবলম্বী মনুষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিব্যূহের শাসনের অধীন হয়েন, তৎকালীন ভিন্ন ব্যবস্থার অনুরাগী হইয়া কোনমতেই সুখী হতে পারেন না, কারণ তখন তাহাদিগের মনে স্বাধীনতার আলোক সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত থাকে, কিন্তু পরে তত্তৎ ব্যক্তিদিগের পুত্রপৌত্রেরা আর তদ্রূপ দুঃখে দুঃখী হয়েন না, কারণ তাঁহারা স্বাধীনতার সুখ জ্ঞাত নহেন। পরাধীন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করত শুদ্ধ প্রভুভক্তি পরায়ণ হয়েন। অধুনা আমাদিগের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে।...... সকলেই মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেছেন আমাদের স্বাধীনতা লোপ হওনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রভাষা আচার ব্যবহার রীতি-নীতি এবং ধর্মকর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে লোপ হইতেছে,.......হে বন্ধুবর্গ আপনারা প্রণিধান করিলে কেবল ইহাই জানিতে পারিবেন যে, শুধু পরাধীনতাই আমাদের হিন্দু জাতির ঐবম্ভুত দুর্গতি হইয়াছে।" (সংবাদ প্রভাকর, ১লা বৈশাখ ১২৫৫ সাল)

সত্যি কথাটা বলার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন একবারে ভয়শূন্য। বৃটিশ সরকারের ভ্রূকুটি কিংবা রাজদণ্ডের ভয় তাঁকে কোন সময় সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত করতে পারেনি। পারেনি বলেই তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছেন, ভারতবর্ষকে শোষণ করাই বৃটিশ শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। তিনি নির্ভয়ে সরাসরি মন্তব্য করেছেন, বৃটিশরা এদেশে শাসন করার জন্য শুধু নিজের দেশের কথাটা মাথায় রাখেন। তাই তাঁরা যা করেন তা সবই নিজের পাতে ঝোল টানার জন্য, এদেশের মঙ্গল করার জন্য নয়। দ্বিধাহীন কণ্ঠে তিনি বলেছেন—

"ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই দেশের অধীশ্বর হইয়া শুদ্ধ স্বদেশের উপকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কৃত নিয়মাদিও পরিপূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে ; তাঁহারা এদেশের অর্থশোষক হইয়াছেন এবং সেই অর্থে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের দীর্ঘোদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, সুতরাং সাহেবগণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এতদ্দেশীয় মানুষেরা নিঃস্ব হইয়াছেন।" ( ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫ সাল )।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাংবাদিক জীবনে যা সত্য এবং বাস্তব বলে জানতেন তাকেই নির্ভয়ে প্রকাশ করতেন। ইংরেজরা এদেশে কোন ভারতীয়র স্বাজাত্যবোধকে ভাল চোখে দেখেনি। অঙ্কুরেই মানুষের স্বাধীনতার স্পৃহাকে বিনষ্ট করার জন্য সচেষ্ট থাকত তারা। স্বাধীনতা পিপাসুদের সদলে বিনষ্ট করাই ছিল তাদের নীতি। সংবাদ প্রভাকরের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র যখন দেশ ও জাতির পরাধীনতার মর্মবেদনা প্রকাশ করে তার মধ্যে নতুন করে স্বাধীনতার ইচ্ছাকে বলবতী করার জন্য শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন তখন ইংরেজ সরকার নানাভাবে তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করে। ইঙ্গিতে অনেক কঠিন শাস্তির হুঁশিয়ারিও তাঁকে দেওয়া হয়। ঈশ্বরচন্দ্র কিন্তু সেসব অগ্রাহ্য করে তাঁর সাংবাদিকতার কাজ চালিয়ে যান।

ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, রঙ্গরসে ভরা লেখার পাশাপাশি বঙ্গ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা এদেশের মানুষকে এত আলোড়িত করে যে তারা প্রায় সর্বাত্মকভাবে সংবাদ-প্রভাকরের সমর্থনে এগিয়ে আসে। সাধারণের এই সমর্থনে উৎসাহিত হয়েই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ জুন বা ১২৪৬ সালের ১ আষাঢ় থেকে সংবাদ প্রভাকর-কে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত করেন ঈশ্বরচন্দ্র। সংবাদ প্রভাকরই হল বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

ঈশ্বর গুপ্তের বৃটিশ বিরোধিতা একদিকে যেমন ছিল যথাযথ এবং সুক্ষ্ম আবরণে মোড়া অন্যদিকে তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত তাঁর অকুতোভয় চিত্তের এক স্নিগ্ধরূপ। সিপাহি বিদ্রোহের সময় যে নির্ভীকতার সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রোহের খবরাখবর সংবাদ প্রভাকর-এর পাতায় প্রকাশ করে গেছেন তাতে আজও বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়।

শুধু সিপাহি বিদ্রোহ নয়, নীলকরের অত্যাচার, ডালহৌসির বিভেদনীতি, সাঁওতাল বিদ্রোহ—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁকে চিরকালের এক সংগ্রামী সাংবাদিক হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়। যে কারণেই হোক, তখনকার ইংরেজ সরকার তাঁর সেসব রচনার বিরুদ্ধে কোনরকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে না পারায় সাধারণভাবে অনেকের ধারণা, ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বুঝিবা সরসতা, ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক লেখা আর পুরনো কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করেই তাঁর কর্তব্য সমাধা করেছেন। কিন্তু একটু ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সংবাদপত্র সম্পর্কে প্রচলিত সরকারি বিধি-নিষেধগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মান্য করে সুকৌশলে দেশাত্মবোধ প্রচার করার জন্যই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন নি।

শুধু সংবাদ প্রভাকর নয়, সংবাদ রত্নাবলী, পাষণ্ড পীড়ন, সংবাদ সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনাকালেও ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সাংবাদিকতার এই বিরল গুণগুলির প্রকাশ দেখা যায়।

সবরকম বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক উন্নতিবিষয়ক আন্দোলনের সমর্থক এবং নিপীড়িত জনগণের প্রতি সহানুভূতিশীল ঈশ্বর গুপ্তের সমস্ত জীবনটি ছিল সংগ্রামমুখর। সারাটা জীবন তাঁকে একটার পর একটা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সেই চ্যালেঞ্জ, জীবনের দুঃখ এবং দারিদ্র কিন্তু তাঁকে বিব্রত করতে পারেনি—বরং এগুলি তাঁকে করে তুলেছে মহান। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "ঈশ্বর গুপ্ত সমাজকে নিজ বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন।"

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনাবসান হয়, কিন্তু সংবাদ প্রভাকর সম্পাদনার যে ধারা তিনি সৃষ্টি করে যান তা তাঁর মৃত্যুর পরও ছিল সমান দীপ্ত। এবং আজ এতদিন পরেও সংবাদ প্রভাকর-এর দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে ভারতীয় সাংবাদিকতার গগন।

# নীল আকাশে কালো মেঘ

ওই দূরে, একটুকরো কালো মেঘ। ওই মেঘটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। আপনারাও ভাবুন, ওই একটুকরো মেঘেই কিন্তু ছেয়ে যেতে পারে সারা আকাশ। আর তখন……।

না, লর্ড ক্যানিং এতটা স্পষ্ট করে বলেন নি, তবু সেদিন তাঁর কথার সুরে ছিল এই আশঙ্কা।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ। ইংলণ্ডে ভারতের বড়লাটের সম্মানে দেওয়া হ'ল এক ভোজসভা। সেই ভোজসভার মুখ্য চরিত্র লর্ড ক্যানিং সেদিন একটু যেন চিন্তা জড়ানো সুরেই বললেন, "I wish for a peaceful form of office. But I cannot forget that in the sky of India, serene as it is, a small cloud may arise no longer, may at last threaten to burst and overwhelm in ruin."

বছর না ঘুরতেই ক্যানিং-এর আশঙ্কা সত্যি হ'ল। ভারতের বুকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঘটল প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান। ইংরেজ এবং সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত বলে আত্মগর্বীর দল সে অভ্যুত্থানের নাম দেয় সিপাহি বিদ্রোহ। সেদিন শুধু কলকাতা নয়, সারা ভারতের সংবাদপত্রগুলি প্রায় সমস্বরে সিপাইদের নিন্দায় মুখর। বিপ্লবকে বিদ্রোহ বলে তারাও সেদিন ইংরেজ প্রভুদের সুরক্ষার জন্য আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের নাম হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সামরিক হিসাব বিভাগের কর্মী—হিন্দু পেট্রিয়টের কর্ণধার। হিসেবে তাঁর কিন্তু ভুল হল না। সিপাহি বিদ্রোহের সঠিক মূল্যায়ণ করে, তার স্বরূপটি উপলব্ধি করে তিনি বললেন, এটা বিদ্রোহ নয়, মহান জাতীয় বিদ্রোহ, দি গ্রেট ইন্ডিয়ান রিভোল্ট—মহান ভারতের অভ্যুত্থান।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৬মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ "The Atrocities and Retribution" শীর্ষক নিবন্ধে বললেন, "History will, we conceive take a very different view of the facts of the Great Indian Revolt of 1857 from what contemporaries have taken of them."—অর্থাৎ আমরা নিশ্চিত, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহান ভারতীয় অভ্যুত্থানকে সমকাল যে রূপেই চিহ্নিত করুক ভবিষ্যৎ ইতিহাস কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের ছাউনিতে ৩৪ নম্বর দেশীয় পদাতিক বাহিনীর (নেটিব ইনফ্যানট্রি) সিপাই মঙ্গল পান্ডের নেতৃত্বে প্রথম জ্বলে ওঠে বিদ্রোহের আগুন। অসাধারণ তৎপরতায় অচিরে সে আগুনকে নিভিয়ে, সে বিদ্রোহকে দমিত করে ইংরেজ ৮ এপ্রিল ব্যারাকপুরেই ফাঁসি দিল মঙ্গল পান্ডেকে। আত্মসুখে মগ্ন ইংরেজ সেদিন নিজের শক্তি সম্পর্কে হয়ে উঠল অতিগর্বী।

কিন্তু একমাসও গেল না, ইংরেজের সেই গর্ব, সেই সাহস যেন সহসা অন্তর্হিত হ'ল। ১০ মে মিরাটে তিন নম্বর অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল একবারে দাউ দাউ করে। ১৫ মে'র মধ্যে সারা উত্তর ভারতে বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা হ'ল পুরোপুরি বিপর্যস্ত। বৃটিশ সিংহ তখন যেন অসহায় এক মেষ শাবক।

ইতিহাসের সেই বাঁক নেওয়া মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে হরিশ মুখার্জি ২১ মে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এ লিখলেন, আজ ভারতে বৃটিশ শাসনজনিত নিষ্পেষণের দুঃসহ গুরুভারকে অনুভব করে না এমন একটি মানুষও নেই। বৈদেশিক শাসনের কাছে অধীনতা স্বীকারের গ্লানির সঙ্গে শোষণের সেই দুঃসহ গুরুভারের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সেদিন 'The Country and the Government' নিবন্ধে হরিশ লিখলেন, 'There is not a single native of India who does not feel the full weight of the grievances imposed upon him by the very existence

of the British rule in India—grievances inseparable from subjection to a foreign rule,'

আরও একধাপ এগিয়ে 'The future of Indian Government' নিবন্ধে হরিশ আরো খোলাখুলি—আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, সেদিন আগত ওই, যেদিন ভারতীয়দের সমস্যা সমাধান করবে ভারতীয়রাই। বললেন, "The time is nearly to come when all Indian questions must be solved by Indians."

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে যে বিদেশী শাসন বাংলা তথা ভারতের বুকে দৃঢ়ভাবে কায়েম হয়েছিল তার বিরুদ্ধে হরিশ মুখার্জির আগে কেউ এমন দৃপ্ত ভঙ্গিমায় সরব হতে পারেন নি। মাত্র অল্প ক'টি কথার মধ্য দিয়ে একটি পরাধীন জাতির মর্মবেদনা, স্বাধীনতার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষাকে হরিশ মুখার্জি যেমন ভাবে ব্যক্ত করেছেন তেমন ভাবে বলতে এর আগে কাউকে দেখা যায়নি। অথবা বলা যায়, অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরে চেপে রাখলেও তাকে প্রকাশ করার মত সাহস জোগায়নি কারও।

ইতিহাসের সাক্ষ্য, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র প্রভাবে বাঙালী নবীন বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। স্বয়ং ডিরোজিও'র কাব্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ওই স্পৃহা—ওই আকাঙ্ক্ষা যেন প্রথম মৃদু সুরে বেজে ওঠে। তারপর 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়া' সম্পাদক কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতায় অথবা পরবর্তী কালের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজপুত কাহিনীভিত্তিক 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' গোছের কিছু পংক্তি হঠাৎ হঠাৎ-ই ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সে প্রকাশ ঘটেছে রূপকের আড়ালে। খোলামেলা কথায় সরাসরি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বনিত করে তোলেন প্রথম হরিশচন্দ্রই। সেদিনের সেই বৃটিশ শাসনের শক্ত কাঠামোর বুকে দাঁড়িয়ে কোনরকম রাখঢাক না করে সরাসরি বৃটিশ সরকারের নাম ধরে তিনি বলেছেন, আমরা তোমাদের চাই না! আমরা চাই স্বাধীনতা—চাই নিজের মত করে নির্ভীক ভাবে বেঁচে থাকতে।

হরিশ মুখার্জির মৃত্যুর পর তাঁর এই নির্ভীকতা, এই স্বাজাত্যবোধের কথাই তাঁর ঘনিষ্টবন্ধু গিরীশচন্দ্র ঘোষ 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' পত্রিকায় উল্লেখ করে আবেগমথিত কন্ঠে বলেন, "তাঁরই জন্য অতিসম্প্রতি আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করতে শিখেছি।"

হরিশের এই রাজনৈতিক সচেতনতা, বলিষ্ঠভাবে স্বাধীনতার কথা প্রকাশ করার স্পর্ধা, যে কোন সামাজিক বা প্রশাসনিক অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে সরাসরি প্রতিবাদ করার এই সাহসের রূপ, চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত কারণ বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পটভূমিটি একবার বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। কেননা, সেই প্রেক্ষাপটে বিচার না করলে হরিশ চরিত্রের বিশালতা কিংবা ব্যাপকতা বোঝা যাবে না। ফলে হরিশ মুখার্জি এবং তাঁর সাংবাদিকতার মূল্যায়নেও থেকে যাবে কিছু ত্রুটি। সেই বিরাট মানুষটিকে অকারণেই হয়ত করা হবে কিছুটা খাটো। তাই হরিশ মুখার্জি এবং তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট নিয়ে আলোচনার আগে সমকালীন ভারতের ছবিটা একবার দেখা যাক।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমপাদ থেকেই ভারতের বৌদ্ধিক পরিমন্ডলে দেখা দেয় বর্ণালীর দ্যুতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে চিন্তাভাবনা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নতুন জোয়ার এল তাকে অনেকে তুলনা করতে থাকলেন ফরাসি রেনেসাঁ-র-সঙ্গে। সর্বক্ষেত্রে যে চাঞ্চল্য অনুভূত হ'ল তাকে বলা হ'ল জাতির নবজাগরণ। রাজা রামমোহন রায় এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সেই নবজাগরণের মুহূর্তে সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে জানালেন স্বাগত।

কোনটা আধুনিক অথবা কোনটার সংস্কার করা উচিত তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে মত পার্থক্য থাকলেও রামমোহন রায় এবং অন্যান্যদের একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাঁরা মনে করতেন, শুধু অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটানোটাই সংস্কার নয়। একই সঙ্গে তাঁরা বলতেন, আধুনিকতার অন্য নাম পাশ্চাত্যের নিছক অন্ধ অনুকরণ নয়। তাঁরা

বুঝতেন, নিজেদের বিচারবুদ্ধির আলোকে যদি সবকিছুকে বিশ্লেষণ না করা যায় তাহলে অন্ধ অনুকরণের মধ্য দিয়ে সেই সভ্যতার কুফলগুলিই এদেশের বুকে জাঁকিয়ে বসার আশঙ্কা বেশি।

একারণেই ইংরেজ সরকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের নামে যখন যা করতেন তাকেই দ্বিধাহীনভাবে সমর্থন করেননি রামমোহন রায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে সে বিরোধিতার সুর ছিল অত্যন্ত চড়ায় বাঁধা।

তাই দেশের শিক্ষা সংস্কারের নামে বৃটিশ সরকার যখন এখানে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন তখন রামমোহন সরাসরি তার বিরোধিতা করে বললেন, কাণ্ডজ্ঞানহীন সংস্কার জাতির জীবনে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সংস্কৃত শিখে আজকের মানুষের কোন সুরাহাটা হবে? সংস্কৃত পড়লে ব্যাকরণের কিছু কচকচি অথবা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের খোঁজ নেবার অসাড় চেষ্টা হয়ত দেখা যাবে, কিন্তু সেই চিন্তা ভাবনাটা যেমন ব্যক্তির কোন বাস্তব চাহিদা মেটাতে পারবে না, তেমনি তাতে সমাজেরও কোন উপকার হবে না। উল্টে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বোঝা হয়ে উঠবে।

রামমোহন বললেন, সত্যিই যদি শিক্ষা সংস্কার করার সাধু বাসনা সরকারের থাকে তাহলে তাঁরা সংস্কৃত কলেজ না করে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী হোন। উচ্চবিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করুন। রামমোহনের এই দাবি জোরদার হ'ল মেকলের ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবে। মেকলেও বললেন, ভারতবর্ষে এখন সংস্কৃতর পরিবর্তে ইংরেজিকেই শিক্ষার মাধ্যম করা দরকার।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় পাশ্চাত্যের যে প্রভাব পড়তে থাকল এবং সেইসঙ্গে এদেশে খৃষ্টধর্ম বিস্তারে মিশনারিরা যে তৎপরতা দেখাতে লাগলেন তার ফলে একধরণের সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। রক্ষণশীল এবং প্রগতিপন্থীদের মধ্যে যেমন একটা সংঘর্ষ দেখা দিল, তেমনি খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের সঙ্গেও একটা বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠল। বিশেষ করে মিশনারিদের আগ্রাসী মনোভাব,

নিজেদের রাজপ্রতিনিধি মনে করে যা খুশি তাই করার প্রয়াস সংঘর্ষকে করে তুলল আরো তীব্র।

মিশনারিরা খৃষ্টধর্ম প্রচারে এত তৎপর হয়ে উঠল যে তারা গবর্নর জেনারেলের কাছে হিন্দুধর্মকে সুযোগ সুবিধে দেওয়ার বিরুদ্ধে এবং সরকারি আইন সম্পর্কেও স্মারকলিপি পেশ করতে থাকল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৯ মার্চ ৩৭ জন মিশনারির স্বাক্ষরিত এক স্মারকলিপি পেশ করা হয় লর্ড ডালহৌসির কাছে। ওই স্মারকলিপিতে তাঁরা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক অনুদান বন্ধ করে দেবার দাবি জানালেন। আর্জিতে বলা হল, জগন্নাথের পান্ডারা প্রকাশ্যেই মিশনারিদের নিন্দামন্দ করে, নিজেদের সরকার বিরোধী বলে দেখাবার চেষ্টা করে এবং ঢাক ঢোল পিটিয়েই জনগণের কাছে দানের জন্য আবেদন করে ও তার মাধ্যমে এদেশে পৌত্তলিক ধর্মকেই বহাল রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। অতএব হে সরকার বাহাদুর, এদের সবরকম সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখুন খৃষ্টধর্মের স্বার্থেই।

এইসব মিশনারি বা পাদ্রীদের দ্বিতীয় আর্জিটা ছিল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের অষ্টম বেঙ্গল রেগুলেসন সম্পর্কে। ওই আইনে ছিল, "যখন কোন দেওয়ানি মামলায় দুই পক্ষ বিভিন্ন ধর্মের অর্থাৎ একপক্ষ হিন্দু অন্যপক্ষ মুসলমান, তখন কোন পক্ষকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার জন্য সেই ধর্মের বিধি প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে ন্যায়বিচার সাম্য এবং সুবিবেচনার নীতির ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

মিশনারি পাদ্রীরা চাইছিলেন, খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইনের সুরক্ষা। এই আইন প্রবর্তন হতে দেখে হিন্দুরা আশঙ্কা করেন, ধর্মান্তরকরণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই আইন আনা হচ্ছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন রক্ষণশীল হিন্দুদের আরো আতঙ্কিত করে তুলল। সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা আরো তিক্ত হল।

ধর্ম, সামাজিক সংস্কার এবং আধুনিকতা প্রবর্তন নিয়ে রক্ষণশীলদের

সঙ্গে নব্যপন্থীদের এই সংঘাতের দিনে সংবাদপত্রগুলি স্বাভাবিক ভাবেই নীরব থাকতে পারেনি। তারাও কোন না কোন পক্ষের হয়ে বেশ সরব হয়ে ওঠে। সতী বা সহমরণের সমর্থনে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাচার চন্দ্রিকা ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করে বলে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ হিন্দুদের ধর্মীয় আচারগুলি পালনে অক্ষম হবে। ওই সঙ্গে তারা হিন্দুদের উত্তরাধিকার বিধি প্রবর্তনেরও বিরোধিতা করে।

সংবাদপত্রগুলি তখন স্পষ্টতই দুটি ভাগ হয়ে যায়। একদল যেমন রক্ষণশীলদের বক্তব্যকে জোরালো করে তুলে ধরে, অন্যদল তখন পরিবর্তনকারীদের পক্ষে সরব হয়। সমাচার দর্পণ, সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ প্রভাকর, পূর্ণচন্দ্রোদয়, সংবাদ ভাস্কর, বঙ্গদূত, জ্ঞানান্বেষণ ইত্যাদি অনেকগুলি কাগজ সেই সংঘাতের দিনগুলিতে পরিপুষ্ট হতে থাকে। অন্যকথায় বলতে হয়, এই সংঘাত কলকাতা তথা ভারতের সংবাদপত্রগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে এক মুখ্য ভূমিকা নেয়। তখন যে কোন বিরোধকে কেন্দ্র করেই নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে অথবা সেগুলি চলতি কাগজগুলির প্রচার বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। অন্যকথায়, সংঘর্ষ এবং বিরোধ সংবাদপত্রের উদ্ভব, প্রচার ও বিকাশের প্রসূতিসদন হয়ে ওঠে।

কিন্তু সংবাদপত্রের সংখ্যা এবং প্রচার বৃদ্ধির পথে হঠাৎ-ই এক মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়াল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ বৃটিশ শক্তিকে যেমন সবকিছু পুনর্মূল্যায়ণে বাধ্য করল, অন্যদিকে সে বিদ্রোহের ফলে অনেক কিছুর সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রসারকেও ব্যাহত করল। অথচ এই মহাবিদ্রোহের পেছনে কলকাতা বা ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য। সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে ওই মহাবিদ্রোহের মাত্র দু'বছর পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেভারেন্ড লঙ্ লেখেন, "ভারতীয় সংবাদ-পত্রের অভিমতগুলি অনেকসময়ই বিপদের আগাম সংকেত অথবা সেফটি ভালভ হিসেবে কাজ করেছে। একারণেই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইউরোপীয় প্রশাসনিক কর্তারা যদি দিল্লির ভারতীয় সংবাদপত্র

গুলির সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাহলে জানতে পারতেন বিদ্রোহের একটি কালো মেঘ জমে উঠেছে। সে বিদ্রোহে পারস্য এবং রাশিয়ার মদত পাওয়া নিয়ে অনেকে যে আশাবাদী তাও জানতে পারতেন তাঁরা।"

সিপাহি বিদ্রোহের সময় দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে রেভারেণ্ড লঙ্‌ আরো বলেন, "সেই পর্বে (বিদ্রোহ) দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা এবং বলা হয়েছে। সেসব মন্তব্যের কোন কোনটিতে ছিল একটি সশ্রদ্ধ ভাব আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল, দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এত দুর্নীতিপরায়ণ যে এর বিলোপ ঘটানো উচিত।...কিছু কিছু সরকারি কর্তাতো দেশীয় সংবাদপত্রকে দমন করার অথবা সেইসব কড়া প্রথা চালু করার কথাও বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সৎ সরকার এবং সুস্থ শিক্ষার পক্ষে এসবই হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলি অনেক সময়ই বর্ণ-বিদ্বেষের কথা প্রচার করেন (অনেক সম্পাদক তো খোলাখুলিভাবেই ভারতীয়দের গালমন্দ করে থাকেন)। তবু পঞ্জাব যুদ্ধ এবং বিদ্রোহের সময় দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ইংরেজদের দিক থেকে নয়, প্রাচ্যের মনোভাবেই যে দৃষ্টিভঙ্গী নেয়—তার সামগ্রিক সুরটা ছিল মধ্যপন্থী।"

পরবর্তীকালে স্যর জর্জ ট্রেভেলিয়ন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র-গুলি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

> The tone of the press was horrible. Never did the cry for blood swell so loud as among those Christians and Englishmen in the middle of the nineteenth century. The pages of those brutal and grotesque journals published by Herbert and Marat during the agony of the French Revolution contained nothing that was not matched and surpassed in the files of some Calcutta papers·· ····what could be more audacious than to assert that providence has granted us a right to destroy a nation in our wrath ? —to stay and burn, and plunder, not in the cause of order and civilization,

but in the name of our insatiable vengeance, and our imperial displeasure ?

There were cases of incitement to rebelation in the Indian press. In the opinion of the Government, a state of affairs existed which could not be allowed to continue and on June 13, 1857 a new act to regulate the establishment of printing presses and to restrain in certain cases the circulation of books and newspapers was promulgated. —The Competition Wallah-1864, PP. 299-300.

স্যর জর্জ ট্রেভেলিয়নের সার বক্তব্য, তখনকার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির মূল সুরটাকে এককথায় বলতে হয় ভয়ঙ্কর। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি খৃষ্টান এবং ইংরেজদের মধ্যে রক্তের জন্য, হানাহানির জন্য যে সরব চিৎকার শোনা গিয়েছিল তার কোন পূর্ব নজির নেই। ফরাসি বিপ্লবের সময় হারবার্ট এবং মারাট যেসব বর্বর পত্রিকা প্রকাশ করত তারাও লজ্জা পাবে কলকাতার কিছু কিছু অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজের বক্তব্য দেখে। নিজের সমৃদ্ধির জন্য একটি জাতিকে ধ্বংস করার কি অধিকার আছে তাদের ? শান্তি শৃঙ্খলা বা সভ্যতার জন্য নয়, নিজেদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী অসন্তোষের জন্য একটি দেশে থেকে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুঠ করার কি অধিকার আছে তাদের ?

দেশীয় সংবাদগুলির কোন কোনটি যে বিদ্রোহের উত্তেজনা ছড়ায়নি তা নয়। সরকারের মতে অবস্থা এমন হয়েছিল যে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ না করে নাকি উপায় ছিল না।

কিন্তু সত্যিই কী তাই? সত্যিই কী দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বিদ্রোহে উস্কানি দিচ্ছিল, উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল? তখনকার সংবাদপত্রগুলি কিন্তু সে সাক্ষ্য দেয় না। বরং এব্যাপারে তখনকার সংবাদপত্রগুলির সংযম দেখেই অবাক হতে হয়। ইউরোপীয়দের কাগজগুলি যখন ভারতীয়দের রক্তপানের জন্য লকলকে জিব বের করে একের পর এক

উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, তখনও কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্রগুলি মোটামুটি সুস্থ ও সংযত ভাবেই তাদের বক্তব্য পেশ করে যাচ্ছিল।

তা সত্ত্বেও লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ জুন যখন তাঁর কুখ্যাত 'গ্যাগিং অ্যাকট' জারি করলেন, তখন তিনি কিন্তু মুড়ি মিছরি এক করে দেখলেন। উদারনৈতিক শাসনের পক্ষপাতী ক্যানিং অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিকে অকারণ প্রশংসাপত্র দিয়ে, তাদের চরিত্রকে বাহবা জানিয়ে নিজের চরিত্রে দুরপনেয় কলঙ্কলেপন করেছেন। 'দয়ালু ক্যানিং' এই একটি মাত্র কারণে ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে 'সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী ক্যানিং' নামে আখ্যাত রয়েছেন।

লর্ড ক্যানিং তাঁর ওই কুখ্যাত আইনটি জারি করার সময়, আইন পরিষদের সভায় বলেন,

> I doubt whether it is fully understood or known to what an audacious extent sedition has been poured into the hearts of the native population of India within the last few weeks under the guise of intelligence supplied to them by the native newspapers. It has been done sedulously, cleverly, artfully····In addition to perversion of facts, there are constant vilifications of the government, false assertions of its purposes and unceasing attempts to sow discontent and hatred between it and its subjects. The remarks which I have taken occasion to make with reference to the native press, I do not direct to the European press. But I see no solid ground upon which a line can be drawn making off one from the other when the question is to prevent matter calculated to mischief at a crisis like this. For whilst I am glad to give credit to conductors of the European press for the loyalty and intelligence which mark their labours, I am bound by sincerity to say that I have seen passages in some

of the papers under their management, which, though perfectly innocuous so far as European readers are concerned, may, in times like the present, be turned to the most mischievous purposes in the hands of people capable of dressing them up for the native ear. I cannot conceal from the council that I have proposed this measure with extreme reluctance. But there are times in the existence of every state in which something of the liberties and rights which it jealously cherishes and scrupulously guards in ordinary seasons must be sacrificed for the public welfare. Such is the state of India at this moment. Such a time has come upon us. The liberty of the press is no exception.

লর্ড ক্যানিং সেদিন স্পষ্টভাবেই দেশীয় সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন, দেশীয় সংবাদপত্র বুদ্ধি চাতুর্যের আড়ালে সংবাদপত্রের পাতায় যা প্রকাশ করছেন তার প্রভাবে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রাজদ্রোহের ভাবটা বেশ জাঁকিয়েই বসেছে ভারতীয় জনগণের মনে।

নিন্দা করলেও ক্যানিং, কিন্তু দেশীয় সংবাদপত্রগুলির বাগধারা এবং রচনাকৌশলের প্রশংসা করতেও বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেছেন, সংবাদপত্রগুলি ইংরেজ বিরোধিতার বীজ অত্যন্ত সুকৌশলে বুনছে। তাদের এই সুকৌশলী অপকর্মটি রোধ করার জন্যই ক্যানিংকে যে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করতে হচ্ছে একথা তিনি পারিষদদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বারেবারেই।

দেশীয় সংবাদপত্রগুলির নিন্দা ও সমালোচনায় মুখর ক্যানিং কিন্তু তাঁর ওই বক্তৃতাতেই ঢালাওভাবে প্রশংসা করেছেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রেস বা বৃটিশদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির। তাদের সংযম দেখে তিনি নাকি মোহিত হয়ে গেছেন। কিন্তু যেহেতু দেশীয় এবং বৃটিশ পরিচালিত পত্রপত্রিকাকে আইনের চোখে আলাদা করে দেখার

তেমন সুযোগ নেই, তাই নিতান্ত নাচার হয়েই সেগুলিকে যে তিনি তাঁর নতুন আইনের আওতায় আনতে বাধ্য হচ্ছেন সেকথাটা তিনি জানিয়েছেন নিতান্তই বেদনার সঙ্গে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় কাগজগুলির একটি ত্রুটিই শুধু তাঁর নজরে এসেছে, সেটা হ'ল, সেসব কাগজে প্রকাশিত কোন কোন মন্তব্যকে কিছু দুরভিসন্ধিপরায়ণ লোক নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

র্জজ ট্রেভেলিয়ন-এর ভাষায় ইউরোপীয় কাগজগুলির কোন কোন মন্তব্য হ'ল, "প্রতিটি হিন্দু এবং মুসলমান একজন করে বিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক, খুনী।" ট্রেভেলিয়ন বলেছেন, "তখন সংবাদপত্রের প্রতিটি স্তম্ভ জুড়ে থাকত এই ধরণের নিন্দাসূচক বাক্য। কিন্তু আজ বলতেই হয়, এধরণের প্রতিটি মন্তব্যই পাপীর উক্তি, ঈশ্বর নিন্দার সামিল।"

তখনকার ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলির পাতায় পাতায় প্রকাশিত হিন্দুদের রক্তপানের প্ররোচনা কী করে যে ক্যানিং-এর মত মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সেই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। অনেকে বলেন ক্যানিং আমলাতন্ত্রকে বাঁচাতেই একথা বলেছেন। কিন্তু ট্রেভেলিয়নের মতে, ওই অভিযোগ সত্য নয়। আমলাতন্ত্রকে আড়াল করতে নয়, কাজে ঠিক মন না থাকার জন্য ক্যানিং ওইধরণের মন্তব্য করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করেছেন।

সংবাদপত্র দমনে জারি করা লর্ড ক্যানিংয়ের ওই আইনটির মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছর। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে ওই এক বছরের আইনটি চিরতরে চিহ্নিত হয়ে আছে 'কণ্ঠরোধকারী আইন বা গ্যাগিং অ্যাক্ট' হিসেবে। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাডাম যে কুখ্যাত বিধি জারি করেন, এই আইনে তার ধারাগুলিকেই ফিরিয়ে আনা হয়।

ক্যানিংয়ের এই নতুন আইনে সরকারি লাইসেন্স ছাড়া মুদ্রণযন্ত্র রাখা বা ব্যবহার করাটা বেআইনি ঘোষিত হল। লাইসেন্স চাইলেও যে পাওয়া যাবে তা নয়। ইচ্ছে হলে সরকার লাইসেন্স নাও দিতে পারেন

আবার লাইসেন্স দিলেও যেকোন সময়েই সে লাইসেন্স প্রত্যাহার করেও নিতে পারেন তাঁরা। মোদ্দা কথা, লাইসেন্স দেওয়া, না দেওয়াটা সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলে ওই আইনে স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। ওআইনে সরকারকে যে কোন সংবাদপত্র, বই অথবা মুদ্রিত বিষয়কে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। আইনে অবশ্য ইংরেজি এবং দেশীয় ভাষার ক্ষেত্রে কোন রকম পার্থক্য রাখা হয়নি। সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল সে আইন। আইনের মেয়াদ ছিল একবছর এবং সারা ভারতের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য ছিল। আইনে ছিল লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রেস থেকে ছাপা প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, বই বা কাগজে প্রকাশক মুদ্রাকরের নাম, ছাপাখানার ঠিকানা ইত্যাদি স্পষ্ট করে ছাপাতে হবে। ওই সব প্রেস থেকে ছাপানো কাগজপত্রে কোন রকম ভাবেই বৃটিশ সরকার বিরোধী কোন মন্তব্য, সরকারের প্রতি বিদ্বেষ বা নিন্দা ছড়ানোর মত বিষয় থাকা চলবে না। পত্রপত্রিকা বা বইতে কোনরকম ভাবেই দেশীয় প্রজাদের মনে সন্দেহ বা হুঁশিয়ারি জাগিয়ে তোলার মত বিষয় রাখা চলরে না অথবা তাদের ধর্মবিশ্বাস বা ধ্যানধারণা সম্পর্কে সরকারি হস্তক্ষেপের চেষ্টা হচ্ছে এমন কথা লেখা চলবে না। তাছাড়া বৃটিশ সরকার এবং দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার মত কিছু প্রকাশেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ওই আইনে। কেউ যদি বিনা লাইসেন্সে ছাপাখানা রাখে অথবা এই আইনে ঘোষিত নিষিদ্ধ বিষয় ছাপে তাহলে তার বা তাদের পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা দুটি শাস্তিই হতে পারে। বিনা লাইসেন্সে ছাপাখানা রাখা হয়েছে সন্দেহ হলেই সেই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট তল্লাসির পরোয়ানা জারি করতে পারেন এবং বিনা লাইসেন্সে রাখা ছাপাখানার সব কিছু বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। এই আইন মোতাবেক পত্রপত্রিকা বা বই না ছাপলে আইনভঙ্গকারীদের হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অনাদায়ে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধকারী ক্যানিংয়ের এই কুখ্যাত আইনের বলি হয় দ্বারকানাথ ঠাকুর পরিচালিত 'বেঙ্গল হরকারু'। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৯-২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে। পত্রিকার সম্পাদক সিডনি লাম্যান ব্ল্যানকার্ড ইস্তফা দেওয়ার পরই শুধু এই পত্রিকাকে আবার নতুন করে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

এছাড়াও রাজদ্রোহমূলক সংবাদ বা নিবন্ধ প্রকাশের জন্য এই আইনে বেশ কিছু সম্পাদকের বিচার হয়।

এই আইনে সরকারের কাছ থেকে ধমক খান 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হেনরি মীড। পত্রিকাটিতে পলাশির শতবর্ষ বা 'সেন্টিনারি অব পলাশি' নামে এক নিবন্ধে বলা হয়, এদেশের পূর্বতন শাসক গোষ্ঠীর শাসনধারা বিভিন্ন কারণেই আপত্তিজনক। এতে বৃটিশ শাসনের শতবর্ষ পূর্তিতে ইংলণ্ডের জয়গাঁথা গাইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বতন শাসকদের সম্পর্কে লেখা আপত্তিজনক মন্তব্যকে গর্বনর জেনারেল ওই সংকটসময়ে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে করেন। তাই পত্রিকাটির সম্পাদককে ডেকে হুঁশিয়ার করে বলা হয়, ভবিষ্যতে এই ধরণের প্ররোচনামূলক সংবাদ বা নিবন্ধ ছাপলে পত্রিকাটির লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে।

সরকারের কাছ থেকে ধমক খেয়ে সম্পাদক 'দি ফার্স্ট ওয়ার্নিং' নামে এক প্রধান নিবন্ধে ব্যঙ্গ করে লেখেন, "লর্ড ক্যানিং তাঁর গ্যাগিং অ্যাকটের পরীক্ষা চালাবার জন্য প্রথমেই 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া'-কে বেছে নিয়ে আমাদের এক বিরল সম্মানে ভূষিত করলেন।" ক্যানিংয়ের আগের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করে নিবন্ধটিতে বলা হয় যে এখন ক্যানিংয়ের সমর্থনে হাত তোলার জন্য জনা ছয় ইউরোপীয়কেও পাওয়া যাবে না।

পত্রিকাটির এহেন কান্ডে যখন তার লাইসেন্স বাতিল হতে যাচ্ছে, সেসময় পত্রিকার অনুপস্থিত মালিকের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়, ভবিষ্যতে এইধরণের অপরাধ আর করা হবে না। এবারের মত সব কিছু বিবেচনা করে মাপ করে দেওয়া হ'ক। সরকার এই আর্জি মঞ্জুর করেন।

ফলে আইনভঙ্গ করেও শেষ পর্যন্ত 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'র প্রকাশ বন্ধ করতে হয়নি।

উনবিংশ শতকের মধ্যপাদের এই যে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা, তারই পরিপ্রেক্ষণায় আমাদের হিন্দু পেট্রিয়ট ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্মধারার বিশ্লেষণ করতে হবে। তখনকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে অস্বীকার করে যদি বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দু পেট্রিয়ট এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে সে মূল্যায়ণ হবে অসম্পূর্ণ, বিকৃত এবং পক্ষপাতদুষ্টও।

রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'আমাদের ইতিহাসটাই নানা আকস্মিকতার মালায় গাঁথা'। সেই আকস্মিকতার মধ্যে দিয়েই জন্ম হয়েছিল হিন্দু পেট্রিয়টের। সেটা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের কথা। এক ভদ্রলোক একটি ছাপাখানা খোলার জন্য মধুসূদন রায়কে মেশিন এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম কিনে দিতে বলেন। সেই মত, মধুসূদনবাবু সবকিছু কিনলেন, কিন্তু সে ভদ্রলোক ততদিনে ছাপাখানা করার ইচ্ছেটাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলেছেন। এ অবস্থায় একরকম বাধ্য হয়েই মধুসূদন রায় নিজেই বড়বাজারের কালাকার স্ট্রিটে ছাপাখানাটি চালু করলেন।

ছাপাখানা চালু করার পর মধুসূদনবাবুর মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেক সময়ই তাঁর মনে হয়, এটা কুঁজোর চিৎ হয়ে শোওয়ার ইচ্ছের মতই অবাস্তব, তবু ইচ্ছেটাকে দমন করতে পারেন না তিনি। সেটা প্রকাশ করেন অনেকের কাছেই। আর তারই ফলে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হ'ল একটি নতুন ইংরেজি সাপ্তাহিক—'হিন্দু পেট্রিয়ট'।

হ্যাঁ, ছাপাখানা চালু হবার পরই মধুসূদনবাবু একটা সংবাদপত্র প্রকাশের কথা ভাবতে থাকেন। কিন্তু সংবাদপত্র বিশেষ করে ইংরেজি কাগজ চালাবার মত বিদ্যে না থাকায় তিনি একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন অনেকের সঙ্গে। এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় সিমলের গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রায় জাত সাংবাদিক। সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। মাত্র ৪০ বছরের জীবন-কালের মধ্যে তিনি ভারতীয় সাংবাদিকতার একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

এহেন গিরিশচন্দ্র যখন মধুসূদনবাবুর ইচ্ছের কথা জানলেন তখন সেটি বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেই তৎপর হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে পেয়ে মধুসূদনবাবুও কোমর বাঁধলেন কাগজ বের করার জন্য। দুয়ের যোগাযোগে প্রকাশিত হ'ল হিন্দু পেট্রিয়ট। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদনার কাজে গিরিশচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন তাঁরই দুই সহোদর শ্রীনাথ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ। তিন ভাইয়ের চেষ্টায় অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল হিন্দু পেট্রিয়ট।

জনপ্রিয়তা আর আর্থিক দিক থেকে লাভবান হওয়া এককথা নয়। জনপ্রিয়তা পেলেও হিন্দু পেট্রিয়ট-এর প্রচার সংখ্যাটা যেখানে থমকে দাঁড়িয়ে থাকল তাতে মধুসূদনবাবুর উদ্বেগ শুধু বাড়তেই থাকল।

প্রচার সংখ্যা না বাড়ার জন্য গিরিশচন্দ্রকে কিন্তু দায়ী করা যায় না কোনমতেই। দায়ী যদি একান্তই কাউকে করতে হয় তাহলে করতে হয় তখনকার সামাজিক অবস্থা আর বাঙালীর চরিত্রকে। মনে রাখা দরকার, বাঙালী তথা ভারতীয়রা তখন ইংরেজিতে মোটামুটি সড়গড় হয়ে উঠলেও সে সংখ্যাটা ছিল খুবই সীমিত। হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশের সময়ও এদেশে কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি। বেশিরভাগ ইংরেজি-নবিশ তাঁদের বিদ্যে দিয়ে কাজ কারবার চালাতে পারলেও, তাঁদের ওই বিদ্যেটা ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য ও সংবাদচর্চার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অন্যদিকে এদেশে ইউরোপীয়দের কাছ থেকেও ভারতীয়দের দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকাগুলি তেমন একটা সমর্থন পেত না। অবশ্য শুধু ইংরেজি কেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে তখন কোন পত্রিকা প্রকাশই লাভজনক ছিল না। তার একটা মস্ত কারণ, তখনও পর্যন্ত সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাসটা ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠেনি।

এই অবস্থায় মধুসূদনবাবু যত চিন্তিতই হোন না কেন, হিন্দু-পেট্রিয়ট এর অবস্থা খুব একটা খারাপ ছিল না। খারাপ যেটুকু হ'ল তা কিন্তু অন্য কারণে। সে কারণটি বাঙালী চরিত্রের একটি সহজাত ত্রুটি। ঘটা করে শুরু করার স্বভাব আমাদের থাকলেও আমরা যে শেষ করতে জানিনা—এটা প্রায় সর্বজনবিদিত। হিন্দু পেট্রিয়ট-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঘোষভাইরা প্রথম দিকটায় দারুণভাবে মেতে উঠলেও কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের উৎসাহে দেখা দেয় ভাটার টান। এরই মধ্যে মধুসূদন রায় নিজেও বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে ছাপাখানা দেখাশোনার কাজটা তিনি আর ঠিক আগের মত করতে পারতেন না। ফলে আর্থিক অবস্থা হয়ে উঠল আরও সঙ্গিন। এ অবস্থায় মধুসূদনবাবু ছাপাখানা এবং কাগজ বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কাগজটি বিক্রি হবে শুনেই হরিশ মুখার্জি সেটি কিনে নেবার জন্য তৎপর হলেন। কাগজটির একবারে প্রথম পর্ব থেকেই হরিশ মুখার্জি ছিলেন এ কাগজের একজন নিয়মিত লেখক। বিশেষ করে ঘোষ ভাইদের অমনোযোগের কালে হরিশ মুখার্জির লেখাই হিন্দু পেট্রিয়টের পাঠকদের ধরে রেখেছিল। তাই কাগজটির সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্কের জোরেই হরিশ মুখার্জি ছাপাখানা এবং কাগজ দুই-ই কিনে নিলেন মধুসূদন রায়ের কাছ থেকে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস নাগাদ সাঙ্গ হয় হস্তান্তর পর্ব।

হরিশ মুখার্জি তখন মিলিটারি অডিটর অফিসে কর্মরত। তাই তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবান্ধবরা পরামর্শ দিলেন, সরকারি কর্মচারী হয়ে নিজের নামে ছাপাখানা না কেনাই ভাল। পরামর্শমত হরিশ মুখার্জি সবকিছু কিনলেন তাঁর দাদা হারান মুখার্জির নামে। কিন্তু কাগজটির সম্পাদনার দায়িত্বটি পুরোপুরিভাবেই নিতে হল তাঁকে। অফিসের কাজের শেষে বাড়িতে এসে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি কাগজের জন্য কাজ করতে থাকলেন। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁর শরীরে ভাঙন

দেখা দিল, কিন্তু কাগজটি সরকারি কর্মকর্তাদেরও অবশ্য পাঠ্য হয়ে উঠল।

হিন্দু পেট্রিয়ট প্রকাশিত হ'ত প্রতি বৃহস্পতিবার ভবানীপুর থেকে। এর গ্রাহকদের বেশিরভাগই ছিলেন ভবানীপুরের সদর দেওয়ানি আদালতের উকিল এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁদের দিকে তাকিয়েই হরিশ মুখার্জি প্রকাশ করে যান কাগজ।

কাগজটিতে এমন সব খবর বেরুতে লাগল যে অল্প দিনের মধ্যে হরিশ মুখার্জি নামটাই অনেকের কাছে আতঙ্কের বিষয় হয়ে উঠল। অত্যাচারিতের হয়ে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী যেভাবে সরব হয়ে ওঠে তাতে তিনি আমলা, শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী এবং নীলকরদের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে থাকলেন। সবার কাছে তিনি হয়ে উঠলেন ভয়ের বস্তু। হিন্দু পেট্রিয়ট ক্রমেই হয়ে উঠল শোষিত জনের প্রতিবাদের হাতিয়ার। শোষককে আঘাত হানার জন্য তীক্ষ্ম থেকে তীক্ষ্মতর হয়ে উঠল এ কাগজের ভাষা।

তবু কিন্তু ব্যাপারটা হয়ে উঠল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মত একটা সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপার। যে কাগজ থেকে লাভ চুলোয় যাক, খরচের টাকাটাই ওঠে না, তাকে চালিয়ে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, একথাটাই অনেকে বোঝাতে থাকল হরিশ মুখার্জিকে। সেসব কথা শুনে হরিশ মুখার্জি মুখ টিপে টিপে হাসেন আর দ্বিগুণ উৎসাহে করে যান কাজ। পুরো ব্যাপারাটাকেই তিনি নেন একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে। সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই হরিশ মুখার্জি হয়ে উঠলেন এক আপোসহীন লড়াকু নেতা।

কাগজ করতে গিয়ে হরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বৃটিশের মিথ্যা স্বাজাত্যাভিমান অথবা অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ শুধু মুখের কথায় করলে হবে না, তাদেরই লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে, যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে যদি প্রতিবাদ করা যায় তবেই প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তাই তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে তথ্যের যে সমাবেশ ঘটত তার সামনে তথাকথিত ইংরেজ পণ্ডিতরাও নিজেদের অসহায় মনে করত।

তখনকার দিনে যারা 'ছোট ইংরেজ' নামে খ্যাত তারা প্রায়ই ভারতীয়দের 'ব্ল্যাক নেটিব', 'অর্ধসভ্য' ইত্যাদি বলে গালাগালি দিত। বোলতার হুলের মতই সেগুলি হরিশচন্দ্রের হৃদয়কে বিদ্ধ করত। সে জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে হরিশ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে থাকলেন এবং তারই ভিত্তিতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়টে 'হিন্দু এবং ইউরোপীয় সভ্যতার তুলনা' নামে একটি নিবন্ধ লিখলেন। একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য এবং বুদ্ধি চাতুর্যের অপূর্ব সমন্বয় দেখা গেল নিবন্ধটিতে। তিনি প্রথমে ইউরোপীয় সভ্যতার ত্রুটিগুলিকে একের পর এক তুলে ধরলেন। তারপর সেই দোষের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সভ্যতার ত্রুটিগুলি তুলে ধরে তার বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করলেন, ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয়রা হেয় তো নয়ই বরং বহুক্ষেত্রেই ভারতীয় সভ্যতা ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর।

নিবন্ধটির গঠনকৌশল এবং তার যুক্তির কাছে পরাজিত হলেন তখনকার বড় বড় ইংরেজ পণ্ডিতও। তখন ইউরোপীয় পরিচালিত যেসব ইংরেজি কাগজ ছিল তার সম্পাদকরাও এসবের কোন প্রতিবাদ করতে পারেন নি।

একইভাবে তিনি বাঙালীর ধর্মঘট এবং ইংরেজ মজুরদের চক্রান্ত প্রণালী নামে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল তার প্রমাণ ওই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, তখনকার শিক্ষিত শ্রেণীর মত হরিশ মুখার্জি ও এদেশ থেকে ইংরেজদের হঠানোর বা স্বাধীনতার কথা বলেননি। কিন্তু চেয়েছিলেন, ইংরেজ শাসনে ভারতবাসী ন্যায় বিচার পাক, চেয়েছিলেন অকারণে কেউ যেন ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার না করে। অন্য কথায় বৃটিশদের কাছ থেকে তিনি চেয়েছিলেন সুশাসন। তাই যখনই কোম্পানির পক্ষ থেকে একের পর এক অন্যায় করা হতে থাকে তখনই তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেন হরিশ। বিশেষ করে লর্ড ডালহৌসির কাজের সমালোচক ছিলেন হরিশ।

'অত্যাচারী দেশীয় রাজার অধীনে থাকার অপেক্ষা ইংরেজ শাসনে প্রজার বেশী সুখ হইবে' এই ধুয়া তুলে গবর্নর জেনারেল একের পর এক যে ভাবে অযোধ্যা, সেতারা, ঝাঁসী, নাগপুর ইত্যাদি রাজ্য দখল করে নেন তার তীব্র বিরোধিতা করেন হরিশ। তিনি ডালহৌসির শাসন প্রণালীর নানা দোষ দেখিয়ে বলেন, এর ফলে এদেশে ইংরেজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে উঠছে। স্বভাবতই ডালহৌসি হিন্দু পেট্রিয়টের ওপর তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু হরিশ মুখার্জি এ কাগজে ডালহৌসি বা কোম্পানির তীব্র সমালোচনা করলেও আইন বিরোধী কিছু করতেন না, তাই আইন অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবার সুযোগ ছিল না। তবে হরিশকে নানা ভাবে হয়রান করার সরকারি অপচেষ্টার অভাব তখন হয়নি। তা সত্ত্বেও হরিশকে কিন্তু তাঁর নীতি থেকে সরিয়ে আনতে পারেন নি ডালহৌসি।

কিন্তু লর্ড ক্যানিং গবর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর অবস্থার বেশ পরিবর্তন হল। হরিশ মুখার্জি বা হিন্দু পেট্রিয়টের একজন ভক্ত হয়ে উঠলেন ক্যানিং। হিন্দু পেট্রিয়টের সমালোচনাকে তিনি অত্যন্ত মূল্য দিতে থাকলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে তিনি হিন্দু পেট্রিয়টের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। যদি কাগজ আসতে দেরি হত তাহলে তিনি নিজে লোক পাঠিয়ে কাগজ আনিয়ে নিতেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পড়েই তিনি দেশের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারতেন। হরিশ কাগজে যেসব সুযুক্তি দিতেন তাকে তিনি গ্রহণও করতেন। তা বলে হরিশ কিন্তু লর্ড ক্যানিংয়ের অন্যায় কাজের সমালোচনা করতে পিছপা হন নি।

হরিশ মনে প্রাণে ছিলেন একজন সৎ, নির্ভীক সাংবাদিক। কোন অবস্থাতেই তিনি নিজের বিবেককে বিসর্জন দিয়ে সাংবাদিকতা করেননি। তিনি একা জনসাধারণের হয়ে একই সঙ্গে সরকার এবং ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ইংলিশম্যান, ফিনিক্স, হরকরা ইত্যাদি কাগজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এসব কাগজ যখন কলকাতাবাসীকে

নিরস্ত্র করার প্রস্তাব দিল হরিশ তখন দীর্ঘ রচনায় তার অসারতার কথা দেখিয়ে বললেন, কলকাতার দেশীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে আক্রমণের কোনই আশঙ্কা নেই। তাদের সম্পর্কে সন্দেহটা নেহাতই অমূলক।

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে এক ঘোষণায় যখন বললেন, 'সরকার কখনই এদেশের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেনি বা করবেন না' তখন তাকে স্বাগত জানালেন হরিশ।

কিন্তু ক্যানিং যখন ইংরেজের কথায় এদেশবাসীর প্রতি অন্যায় করেছেন তখন তার সমালোচনায় হরিশ পিছিয়ে যাননি। দেশীয় অধিবাসীরা বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখতে পারবে না অথবা রাজদ্রোহ সংশ্লিষ্ট অবৈধ কাজের প্রতিকারের জন্য যখন ১৬ আইন জারি করলেন তখন হরিশ হিন্দু পেট্রিয়টে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, সাধারণ ফৌজদারি আদালতেই ঘর জ্বালানো, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি কাজের বিচার হতে পারে, কোন ব্যক্তি বিশেষের হাতে এ বিচারের ভার দেওয়া উচিত নয়।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় পশ্চিমাঞ্চলে জেনারেল নীল যেভাবে সেখানকার মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় তার প্রতিবাদ করে তিনি লেখেন, "যদি শত্রুনির্যাতন এবং দেশীয় অধিবাসীদের পুরোপুরি ধ্বংস করার জন্য জেনারেল নীলের কাজকে চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়, তাহলে লর্ড ক্যানিং এবং তাঁর পারিষদরা এদেশের শাসনভার কিছু কসাইয়ের হাতে দিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব এদেশ ত্যাগ করুন।"

আবার লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ জুলাই যখন বিদ্রোহী এবং অন্যান্যদের ওপর অযথা অত্যাচার না করার নির্দেশ দেন, তখনও হরিশ লেখেন "বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে যে অযথা প্রতিহিংসার পথ নেওয়া হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সভ্য সরকারের রাজকর্মচারীরা যে এইরকম অবৈধ উপায়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবেন তা আমরা মনে করি না।"

এই ভাবে হরিশ একদিকে ক্যানিংয়ের ভাল কাজের যেমন প্রশংসা

করলেন তেমনি অন্যায় কাজের সমালোচনা থেকেও পিছিয়ে গেলেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসনভার মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে দেওয়ার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্টে যে প্রস্তাব এল হরিশ তাকে জোরালো ভাষায় সমর্থন জানালেন এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১ নবেম্বর ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা জারি হলে তিনি লেখেন, এর ফলে এতদিন ধরে তিনি যা চাইছিলেন তাই হল। নতুন উদার মতের এই ইংরেজ শাসন দেশের উপকার করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য, সরকারের কাছ থেকে সুবিচার আদায়ের জন্য হরিশ মুখার্জি তাঁর হিন্দু পেট্রিয়টে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, ঠিক সেই একই ভূমিকা অথবা তার চেয়েও সক্রিয় এবং জোরালো ভূমিকা নেন নীল আন্দোলনের সময়।

বাংলার মেঘ মুক্ত আকাশে নীল চাষ ক্রমেই হয়ে উঠছিল এক টুকরো ঘন কালো মেঘ। নীলকরদের অত্যাচারে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠছিল বাংলার ঘরে ঘরে। নীলকরদের ওই অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্র জোরালো ভাষায় লিখলেন 'নীলদর্পণ' নাটক আর হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হতে থাকে নীলকরদের অত্যাচারের নানা কাহিনী, সে অত্যাচার দমনে ব্যর্থ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কথা। হরিশ নিজে যেমন লিখলেন জোরালো সম্পাদকীয় মন্তব্য, তেমনি দেশের নানা জায়গার সংবাদদাতাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে থাকলেন।

পরবর্তীকালে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ এই হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদদাতা হিসেবে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে নীলকরদের অত্যাচারের খবর পাঠাতে থাকেন। বলা যায়, শিশিরকুমারের সাংবাদিকতার হাতে খড়িই হয় হিন্দু পেট্রিয়টে। শিশির কুমার ছাড়া কবি মনমোহন ঘোষও ঐ পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে নিয়মিত লিখতেন, এসব সংবাদ এবং হরিশ মুখার্জির কড়া সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে সরকার যেমন নীলকরদের অত্যাচারের ভয়াবহতা টের পেলেন, তেমনি জনগণও নীলকরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হল,

দেখা দিল নীল বিদ্রোহ। বাধ্য হয়েই সরকার নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ডবলিউ, এস, সিটনকার-এর নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করলেন।

সেই কমিশনে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুলাই সাক্ষ্য দিয়ে হরিশ মুখার্জি নির্ভীকভাবেই বলেন, অনেক জমিদার, প্রজা এবং মধ্যবর্তী ভূম্যধিকারী তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরামর্শ চাইতেন এবং তিনি যথাসাধ্য পরামর্শ দিতেন।

তিনি কমিশনকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "এই নীল হাঙ্গামার বিষয়টি আমি খুবই সতর্কতা এবং যত্নের সঙ্গে পর্যালোচনা করে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে এই নীলচাষ প্রজাদের অনিষ্টই করছে। আমার এই অভিমত আমি সব সময়ই প্রকাশ করেছি। ভবিষ্যতে নীলকর এবং প্রজাদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক হবে সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।"

নীলকর কমিশনে জবানবন্দি জেরার সময় হরিশ মুখার্জি নীলকর অত্যাচার এবং তা প্রতিরোধ সম্পর্কে অনেক কথা বললেও, বলেননি সেই হাঙ্গামা প্রতিরোধে অপূর্ব স্বার্থত্যাগের কথা। বলেননি যে তাঁর ভবানীপুরের বাড়িটি হয়ে উঠেছিল বাংলার অত্যাচারিত নীলচাষীদের পরম আশ্রয় স্থল। হরিশ মুখার্জি যে শুধু তাঁদের আইনি পরামর্শ দিতেন বা তাদের সম্পর্কে কাগজে লিখতেন তা নয়, তিনি তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতেন, আশ্রয়ও দিতেন। এরজন্য তাঁর রোজগারের বেশির ভাগ টাকাই খরচ হয়ে যেত, তবু এই সাহায্য দেওয়া থেকে তিনি বিরত হননি।

নদীয়ার নীলকররা কেউ তাঁকে গুলি করে মারবার ভয় দেখিয়েছে, কেউ গোপন চিঠিতে হুমকি দিয়েছে কিন্তু তাতে হরিশ ভয় না পেয়ে আরো বেশি নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখেছেন।

নীলকররা সরাসরি হরিশ মুখার্জিকে খুন না করলেও তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য কিন্তু তারাই পুরোপুরি দায়ী। নিশ্চিন্দপুরের কাচিকাটা নীলকুঠির কুখ্যাত আর্চিবলড হিলস জোর করে হরমনি দাসী নামে

এক গ্রামবধূকে আটকে রেখে ধর্ষণ করে বলে হিন্দু পেট্রিয়টে খবর বেরোলে আর্চিবলড হিলস সুপ্রিম কোর্টে হরিশ মুখার্জির বিরুদ্ধে মামলা আনেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে। কিন্তু সেখানে মামলা না চলায় সেপ্টেম্বর মাসে জর্জ মিয়ার্শ নামে আরেক নীলকর ২৪ পরগণার সাব জজের আদালতে হরিশ মুখার্জির নামে মানহানির মামলা এনে ১০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। এই মামলা চলার সময়ই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ জুন হরিশচন্দ্রর মৃত্যু হয়।

প্রতিহিংসাপরায়ণ আর্চিবলড হিলস কিন্তু হরিশের স্ত্রী ও মার নামে মামলা চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হরিশের স্ত্রী মামলার খরচ বাবদ একহাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আপোস করে নেন। কিন্তু সে টাকাও দিতে না পারায় আর্চিবলড হিলস এক তরফা ডিগ্রি পায়। ডিগ্রিতে হরিশের বাড়ি ক্রোকের হুকুম জারি হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হরিশের কয়েকজন বন্ধু হাজার টাকা জোগাড় করে দিলে বাড়িটি ক্রোকের হাত থেকে রেহাই পায়।

হরিশের বিরুদ্ধে এই মামলা চলার সময় নানাভাবেই আপোসের প্রস্তাব এসেছে। হরিশ তাঁর পত্রিকায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইলেই মামলা তুলে নেওয়া হবে এমন আভাসও দেওয়া হয়। কিন্তু অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের সংগ্রামে কোন আপোস যে চলতে পারে না একথা হরিশ মুখার্জি স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দেন। এবং সবকিছু ঝুকি নিয়ে মামলা চালিয়ে ভারতীয় সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের সামনে এক বলিষ্ঠ আদর্শ রেখে যান। পত্রিকা পরিচালনায় সবসময়ই নির্যাতিতের পক্ষ নিয়ে আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যই পরবর্তীকালে হরিশ মুখার্জিকে 'ফাদার অব ইণ্ডিয়ান জার্নালিজম' বা 'ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক' বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আর তাঁর অকাল মৃত্যুতে অত্যাচারিত নীলচাষীরা কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলেছে,

"অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হলো কারাগার—
নীলবাঁদরে সোনার বাংলা করল ছারখার।"

সেদিন বাংলার আকাশ 'নীল' হয়ে উঠেছিল দুর্যোগের ঘন কালো মেঘে, কিন্তু দমকা হাওয়ার মত হরিশ মুখার্জি তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর দাপটে সেই মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নীলচাষীদের সামনে এনে দিয়েছিলেন মেঘমুক্ত উদার নীল আকাশ। তাই তিনি অমর-চিরকাল।

## কণ্ঠরোধের অপপ্রয়াস

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তার মধ্যেই বদলে গেল সব। বাংলার ছোটলাট অ্যাশলি ইডেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। রাগে তাঁর লাল মুখ আরো লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, কাজটা কিন্তু ভাল করলেন না, এর ফল আপনাকেই ভুগতে হবে।

উঠে দাঁড়িয়েছেন শিশির কুমার ঘোষও। ছোটলাটের সেই রাগের মুখেও স্থির, অচঞ্চল। মাথা উঁচু করে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন তিনি ক'টি কথা, ফল কি হবে তা আমি জানি। জানি বলেই যে কোন পরিণতি মোকাবিলার জন্য আমি তৈরি। তৈরি বলেই আবারও বলছি, সবাইকে এক ভাববেন না। দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদিকও থাকুক। নমস্কার।

নমস্কার করে শিশির কুমার ছোটলাটের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। ছোটলাট অ্যাশলি ইডেন কিন্তু প্রতি নমস্কার করার কথাটাও ভুলে গেলেন। মনে মনে তিনি শুধু গজরাচ্ছেন, সামান্য একজন লোকের এত সাহস! তাঁর মুখের ওপর না বলে গেল। এমন করে সমস্ত প্রলোভনকে এড়িয়ে গেল। বেশ ওকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় তা আমার জানা আছে। শুধু শিশির কুমারকে নয়। শিশির কুমারের মত একরোখা সৎ সাংবাদিকদের টিট করার জন্য চক্রান্তের জাল বিছোতে থাকলেন ছোটলাট। দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধের এক জঘন্য ছক তিনি কষে ফেললেন মনে মনে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র এক বছরের জন্য লর্ড ক্যানিং ভারতীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য জারি করেছিলেন এক আইন। সে আইন সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে।

এক বছর পরেই কিন্তু তিনি তুলে নেন সে আইন। ততদিনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণায় ভারত শাসন ভার তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। নতুন ব্যবস্থায় ভারতের প্রথম গবর্নর জেনারেল সেই লর্ড ক্যানিং।

লর্ড ক্যানিং কিন্তু এখন সারা দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য, জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য, মহারাণীর রাজত্বে অন্যায় হবে না এমন একটা ধারণা তৈরি করার জন্য একটার পর একটা ব্যবস্থা নিতে থাকলেন। তাঁর সেইসব ব্যবস্থায় স্থানীয় ইংরেজরা অনেকেই চটলেন কিন্তু ভারতীয়দের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন দয়ালু ক্যানিং।

এই সময়ে সংবাদপত্র সম্পর্কেও সরকারের নীতি হয়ে উঠল অনেক উদার। অকারণে সংবাদপত্রকে হয়রান করার প্রবণতা থেকেও মুক্ত হ'ল সরকার সব মিলিয়ে সংবাদপত্রগুলি অনেক স্বাধীনভাবেই সংবাদ পরিবেশন করতে থাকল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আবার একটি সরকারি কাগজ বের করার প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু লর্ড ক্যানিং তাতে সায় না দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত কাগজ আর করা হয়ে ওঠেনি। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দেও একই ভাবে সরকারি কাগজ করার প্রস্তাব ওঠে এবং যথারীতি নাকচ হয়ে যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাবটির ভাগ্যও অন্যরকমভাবে লেখা হয় না। ওই সময় লর্ড মেয়ো ভারত সচিব স্যর স্ট্যাফোর্ড নর্থকোটের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

এদিকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পাইওনিয়র' ততদিনে সরকারি কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে ওঠবস করে একরকম সরকারি কাগজ হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে ফেলেছে। তাই সে আলোচনার পর মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত হয়, পাইওনিয়র যখন আছে, তখন আর আলাদা করে সরকারের কাগজ বের করার দরকার কি?

ব্রিটিশ সরকারের কর্তাব্যক্তিদের বেশির ভাগ সময়েই একটা জুজুর ভয় যেন তাড়া করে গিয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেখে তাই তাদের আতঙ্কিত হওয়াটা আজকের বিচারে আর বিস্ময়ের ব্যাপার কিছু নয়, বরং শাসক গোষ্ঠীর তৎকালীন মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপরাটা খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

তবে সরকারের এই ধরণের আতঙ্কই মাঝে মাঝে তাদের সংবাদপত্রের কন্ঠরোধে চক্রান্ত করতে যেন তৎপর করে তোলে। কোন একটি ওজর পেলেই সংবাদপত্রগুলিকে দমন করার জন্য সরকারি কর্তারা তখন উঠে পড়ে লাগে।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মোটামুটি সেরকম একটি ঘটনার সূত্রপাত হ'ল। বিহারে সেবার প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দিল। দেশের বেশির ভাগ বড় ইংরেজি ও দেশীয় ভাষার পত্রপত্রিকা বিহারের ওই অবস্থাটাকে দুর্ভিক্ষ বলেই বর্ণনা করতে শুরু করে। মোটামুটি সেসব খবরের ভিত্তিতেই বঙ্গদেশ সরকার ত্রাণ খাতে প্রায় ৬ কোটি টাকা খরচ করে ফেলে।

ওই সময় অমৃতবাজার পত্রিকা বিহারের গ্রামগুলিতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে সমস্ত অবস্থা দেখে শুনে এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলে, বিহারে খাবারদাবারের টান রয়েছে সত্যি কথা, কিন্তু সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, প্রায় প্রতিবছরই বিহারে এই সময়টা এধরণের অভাব বা খাদ্যে টান পড়ে। অমৃতবাজারের এই খবর সরকারকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করল। তারা আবার পর্যালোচনা করতে শুরু করল।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদপত্রের আরেক প্রবাদ পুরুষ রবার্ট নাইট-এর কথা বলে নেওয়া ভাল। রবার্ট নাইট বোম্বাইতে এসেছিলেন 'বোম্বাই টাইমস'-এর সম্পাদক হিসেবে। পরবর্তীকালে বোম্বাই টাইমস, স্ট্যান্ডার্ড এবং টেলিগ্রাফ মিলে যখন টাইমস অব ইণ্ডিয়া হয় তখনও নাইট ছিলেন তার সম্পাদক। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নাইট ইংলন্ডে

চলে গেলেও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ফিরে এসে তিনি 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'য় তাঁর যে অংশ ছিল সেটা বিক্রি করে দিয়ে 'বোম্বে স্টেটসম্যান' নামে নতুন একটি পত্রিকা শুরু করেন। কয়েকবছর বাদে নাইট পত্রিকাটি বিক্রি করে দেন এবং বোম্বাইয়ের পাট চুকিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। এখানে 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন তিনি। এই সময়ই তিনি বঙ্গদেশ সরকারের কৃষি বিভাগে আণ্ডার সেকরেটারি পদে যোগ দেন এবং এগ্রিকালচারাল গেজেট নামে আরও একটি পত্রিকা বের করেন। দুটি পত্রিকাতেই দুর্ভিক্ষত্রাণ নিয়ে সরকারি নীতির সমালোচনা করে নিবন্ধ প্রকাশ করেন।

নাইট-এর এই নিবন্ধ প্রকাশের পরই সরকারি মহলে আবার প্রশ্ন ওঠে, সরকারি চাকুরে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকেন কি করে। বিষয়টি নিয়ে ঘোঁট পাকছে দেখেই নাইট তাঁর কাজে ইস্তফা দিয়ে ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান নামে একটি নতুন কাগজ প্রকাশ করেন ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। সেপ্টেম্বর মাসেই কাগজটির নাম হয় শুধু স্টেটসম্যান। পত্রিকা প্রকাশের কাজে নাইট কলকাতার ২৪ জন ব্যবসায়ী এবং পাইকপাড়া রাজ এস্টেটের ম্যানেজার ত্রৈলোক্য নাথ চ্যাটার্জি'র সমর্থন পান। সেসময় ইংলিশম্যান এবং ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ বিক্রি হত চার আনা করে কিন্তু স্টেটসম্যান কাগজের দাম ছিল মাত্র এক আনা। ফলে কাগজটি সহজেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিছু দিনের মধ্যেই নাইট শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকাটিও কিনে নিয়ে সেটি কলকাতায় নিয়ে আসেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্টেটসম্যান দৈনিক এবং ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এটি স্টেটসম্যানের বিদেশী সংস্করণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেও বহুদিন পর্যন্ত দৈনিক স্টেটসম্যানের শিরোনাম ছিল স্টেটসম্যান অ্যাণ্ড দি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া।

নাইট এবং স্টেটসম্যান-এর প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করে ফিরে যেতে

হবে বিহারের সেই দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গে। বিহারের ওই দুর্ভিক্ষত্রাণ নিয়ে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক এবং তাঁর অর্থনৈতিক সদস্য স্যর রিচার্ড টেম্পল-এর সঙ্গে বঙ্গদেশের লেঃ গবর্নর বা ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের তীব্র মত বিরোধ দেখা দেয়। অমৃতবাজার পত্রিকা বিহারের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে যে সরেজমিন সংবাদ পরিবেশন করে তার পরিপ্রেক্ষিতে স্যর জর্জ ক্যাম্বেল বাইরে থেকে খাদ্যশস্য আমদানির বিরোধিতা করেন। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক বা স্যর রিচার্ড টেম্পল অবস্থা মোকাবিলায় খাদ্য আমদানির ওপরই জোর দেন। এ অবস্থায় ছোটলাটকে সমর্থন করে নাইট তাঁর ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট এবং এগ্রিকালচারাল গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় বিশেষ নিবন্ধ লেখেন। ওই নিবন্ধে তিনি খাদ্য শস্য আমদানি করার জন্য বড়লাট এবং তাঁর অর্থনৈতিক সদস্যর তীব্র সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনার সূত্রেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং সরকারি কর্মচারীরা সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন কিনা তা নিয়ে আবার বিতর্ক দেখা দেয়। নাইট অবশ্য অবস্থাটা টের পেয়ে আগেভাগেই সরকারি কাজে ইস্তফা দেন।

ওদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৮ জুলাই গেজেট অব ইণ্ডিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলে, সংবাদপত্রের যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সরকারি কর্মীর কর্তব্য সম্পাদনের বিষয়টি জড়িত কিনা তা ঠিক করার এবং কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করার অধিকার সরকারেরই রইল। অথচ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মেকলের তৈরি ভারতীয় দণ্ডবিধি যখন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গৃহীত হ'ল তখন কিন্তু তার থেকে রাজদ্রোহ সংক্রান্ত ধারাটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। এটি বাদ দেওয়ার পক্ষে তখন যুক্তি দেখান হয়, ওই ধারাটি থাকলে সেটিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন। ওই বিধিটির উপযোগিতা সম্পর্কে বহু ইংরেজরই সন্দেহ ছিল। একারণেই লর্ড ক্যানিং এবং সিলেক্ট কমিটি ওই ধারাটি আইন থেকে বাদ দিয়েছিলেন।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো কিন্তু বড়লাট হিসেবে ভারতীয়

দণ্ডবিধি সংশোধনের ব্যাপারটি আবার খুঁচিয়ে তুললেন। ফলে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বড়লাটের পারিষদ জে এফ স্টিফেন রাজদ্রোহ সংক্রান্ত ধারাটি সম্পর্কে আরেকটি সংশোধনী খসড়া পেশ করলেন। তিনি বললেন, অনধাবনতাবশত ভারতীয় দণ্ডবিধি থেকে রাজদ্রোহ সংক্রান্ত ধারাটি বাদ গেছে। তিনি বললেন, যেসব মন্তব্য মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধঘোষণার সামিল, সেগুলিই এই আইনের আওতায় আসবে। ওই ধারায় কঠিন শাস্তি দেয়ার যে বিধি ছিল সে সম্পর্কে আপত্তি তুললে তিনি বলেন, এটি বিচারকদের সাধারণ জ্ঞানের ওপরই ছেড়ে দিতে হবে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, বাংলার কয়েকটি জেলায় যে ওয়াহাবি আন্দোলন হয়ে গেল তাতে মাত্র ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর থেকেই এই আইন প্রয়োগে কর্তাদের সদিচ্ছা এবং বিচার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আইনজীবিরা অনেকেই কিন্তু এর সঙ্গে একমত হলেন না। তারা বললেন আইনের বয়ানটি অত্যন্ত বিভ্রান্তিমূলক এবং এর ব্যাখ্যা থেকে অনেক ত্রুটি বেরিয়ে পড়বে এবং কোন ভারতীয় জুরিই আসমিকে শাস্তি দেবার পক্ষে মত দেবেন না।

এই রকম একটি অবস্থাতেই দুর্ভিক্ষ-নীতি নিয়ে বড়লাট লর্ড নর্থকোট, সচিব লর্ড নর্থব্রুক এবং বাংলার ছোটলাট স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের মতবিরোধ দানা বাধল। দু পক্ষের সেই মতের লড়াইয়ে নাইট সরাসরি ক্যাম্বেলের পক্ষ নিলেন। ক্যাম্বেলকে সমর্থন করে তিনি লিখলেন একাধিক নিবন্ধ।

নাইট অবশ্য শুধু যে দুর্ভিক্ষ-নীতি প্রশ্নে ক্যাম্বেলকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তা নয়, বৃটিশ ভারতে সরকারের ওপর মহলের অনেক নীতিরই তিনি সমালোচনা করেন। যে ভাবে বরোদার গায়কোয়াড় মালহার রাওকে পদচ্যুত করান হয় তার তীব্র নিন্দা করেন নাইট। লর্ড নর্থকোট এসব ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে রেগে যান নাইটের ওপর। তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য সেনসর ব্যবস্থা প্রয়োগ এবং তাঁর লেখাবন্ধ করতে

ব্যর্থ হয়ে, লর্ড নর্থকোট শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

এদিকে নাইট কিন্তু নিজের বক্তব্যে অবিচল থাকেন। তাঁর কথা সরকারি কর্মীরা ইচ্ছে করলেই খবরের কাগজের মালিক হতে পারেন, কাগজ সম্পাদনা করতেও পারেন। বর্তমান আইনে এব্যাপারে তাদের বাধা দেওয়া তো যায়ই না, এমনকি তাদের লেখা আগাম সেনসরও করা যায় না। কাজেই নাইটকে খবরের কাগজে লেখা থেকে বিরত করার কোন অধিকারই লর্ড নর্থকোটের নেই।

জল ক্রমেই ঘোলা হয়ে উঠছে দেখে সরকার ওই আইনের ব্যাখ্যা হিসেবে 'গেজেট অব ইণ্ডিয়া'য় এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল, হ্যাঁ, সরকারি কর্মীরা খবরের কাগজের মালিক বা সম্পাদক হতে পারবেন, তবে তারজন্য তাঁদের সরকারের কাছ থেকে আগাম লিখিত অনুমতি নিতে হবে। আবার সেই অনুমতি যে কোন মুহূর্তে বাতিল করাও যেতে পারে। তবে তাঁদের সে সব লেখা সুভদ্র এবং যুক্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনরকমেই তাঁরা সরকারি নথিপত্র বা তথ্যাদি বিনা অনুমতিতে প্রকাশ করতে পারবেন না। আর সবশেষে, যদি কোন ব্যাপারে সন্দেহ দেখা যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাগজের সঙ্গে যুক্ত থাকাটা তার কর্মসম্পাদনের পথে বাধা হবে কিনা তা সরকারই ঠিক করবেন।

এইসব আইনি ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতেই নাইট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সরকারি কাজে ইস্তফা দেন এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে স্টেটসম্যান পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াও তিনি কিনে নেন এবং দুটি পত্রিকাই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাশাপাশি প্রকাশিত হতে থাকে। পরে অবশ্য পত্রিকা দুটি এক হয়ে যায় এবং স্টেটসম্যান নামটিই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে।

সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকেই ভারত শাসন প্রশ্নে বৃটিশ শক্তি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিতে বাধ্য হয়, শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আস্তে আস্তে ভারতীয়দেরও যুক্ত করার চেষ্টা চলতে থাকে। এই চেষ্টারই প্রকাশ, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাকট। এই আইনে গবর্নর জেনারেলের কাউন্সিল সম্প্রসারিত করা হয় এবং এই প্রথম সেখানে ভারতীয়রাও বেসরকারি সদস্য হিসেবে স্থান পান। তবে লর্ড ক্যানিং ইউরোপীয় সদস্যদের জন্য আলাদা আলাদা দপ্তর নির্দিষ্ট করলেও ভারতীয় সদস্যদের শুধু উপদেষ্টা করেই রাখেন। তা সত্ত্বেও সরকারি কাজে জনসাধারণের আগ্রহটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ওইসঙ্গে খবরের কাগজের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি প্রকাশিত হতে থাকে নতুন নতুন বই।

জনতার এই নবজাগ্রত চেতনা এবং সংবাদপত্র ও বই প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে সরকার যেমন একদিকে খুশি হয় তেমনি এদের স্বাধীনতা যাতে অবাধ না হয়ে ওঠে সেদিকেও কড়া নজর রাখতে থাকে। একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এদের ঘোরাফেরায় সরকার উদার হলেও সামগ্রিক স্বাধীনতায় তারা ছিল তীব্র বিরোধী। তাই সংবাদপত্র এবং বই প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তারা একটি সুসংহত আইন জারির উদ্যোগ নেয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দেই সরকার সংবাদপত্র এবং মুদ্রণযন্ত্র নিয়ন্ত্রণের এবং বৃটিশ ভারতে মুদ্রিত গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য নতুন একটি আইন প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মেটকাফ অ্যাকট নং ১১-এর পরিবর্তে এটি চালু হয়। নতুন আইনে অবশ্য মেটকাফ আইনের সবগুলি ধারাই গৃহীত হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ওই আইনটিই ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১০ নম্বর আইন এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩ ও ১০ নম্বর আইনে সংশোধিত ও ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের রদবদলের পর প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেসন অব বুকস্ অ্যাকট নামে পরিচিত। এই আইনকে নিয়ন্ত্রণ আইন এবং এর দ্বারা সরকার মুদ্রিত সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন বলে ধরা হয়।

সংবাদপত্র এবং বই ছাপা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে জারি করা ১৮৬৭

খৃষ্টাব্দের এই আইনের পরও সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক যে খুব একটা ভাল হয়ে ওঠেনি তা আমরা আগের আলোচনার মধ্যেই দেখেছি। তথাকথিত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সঙ্গে কোন কোন সময় সরকারের একটা বোঝাপড়া হলেও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু তা কোন সময়ই হয়নি। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে বেশির ভাগ সময়েই সরকারের কেমন যেন অসূয়ামূলক মনোভাব ছিল। কর্তৃপক্ষের ভাবখানা ছিল, বেশ তো লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করে খাচ্ছিলে, আবার খবরের কাগজ বের করার শখ হল কেন ?

এই সময়ই ভারতে নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড লিটন। লর্ড লিটনের শাসনকাল নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। তবে সংবাদপত্র দমনে তিনি যে ব্যবস্থা নেন তার জন্য ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল এক কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবেই লেখা থাকবে চিরটাকাল। অথচ লিটন যখন বড়লাট হয়ে এলেন, তখন কি ভারত, কি বৃটেন দু জায়গাতেই সরকারি মহলে ক্রমশ একটা ধারণা দানা বাঁধছিল যে, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যাবে না। দু-একজন যে এ ধারণার বিরোধী ছিলেন না, তা নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী সেই দলেরই একজন লিটন।

অবশ্য লিটন কুখ্যাত ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট চালু করার আগে বিভিন্নজনের মতামত সংগ্রহ করেছিলেন। সে সময় মাদ্রাজের গবর্নর ছাড়া আর সবাই দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবে সায় দেয়। মাদ্রাজের গবর্নর ডিউক অব বাকিংহামই শুধু বলেন, দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র সম্পর্কে অভিযোগ করা হচ্ছে শুধুই কড়া ভাষায় অপ্রিয় সত্য বিবৃতি প্রকাশের জন্য।

বাংলার প্রাক্তন এবং বোম্বাইয়ের তৎকালীন গবর্নর স্যর রিচার্ড টেম্পলও লেখেন, তিনি যখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন সেসময় বাংলার সংবাদপত্রে কোন রকম আনুগত্যের অভাব দেখেননি। বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন-বিষয়ক সদস্য আর্থার হবহাউস (পরবর্তীকালের লর্ড

হবহাউস ) এক জোরালো বক্তব্যে বলেন তিনি সমস্ত সংবাদপত্র অথবা ভারতীয় সংবাদপত্র দমনের যে কোন আইনের বিরোধী।

তখনকার দেশীয় সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে স্যর জর্জ বার্ডউড ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি অব আর্টসে দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে এক বক্তৃতায় বলেন, রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলি যথেষ্ট পরিমাণেই আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

এসব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে লিটন সংবাদ দমনে আইন প্রণয়ণের প্রস্তাবটি সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখলেন। পরিবর্তে তিনি অন্য উপায়ে সংবাদপত্রের সুর বদলাবার কথা ভাবতে থাকলেন। সে ভাবনার মধ্যে সরকারের নিজস্ব সংবাদপত্র চালু করার বিষয়টিও ছিল। কিন্তু সে প্রস্তাবে সাধারণভাবে কারোই সায় পাওয়া গেল না। ফলে লিটনও সেটি কার্যকর করার মত উৎসাহ পেলেন না।

সরকারি সংবাদপত্রের বদলে অনেকেই সংবাদপত্রগুলিকে তথ্য সরবরাহ করার প্রস্তাব দিলেন। তাঁরা বললেন, সংবাদপত্রগুলিকে সরকারই যদি তথ্য জোগায় তাহলে তারা অর্ধসত্য বা মিথ্যা খবরের ভিত্তিতে আজেবাজে মন্তব্য করার সুযোগ পাবে না।

কেমন করে সরকারি ভাবে সংবাদপত্রগুলিকে তথ্য সরবরাহ করা যায় তার এক বিস্তারিত কর্মসূচী পেশ করলেন রবার্ট নাইট। তিনি সরকারকে একটি প্রেস ব্যুরো গঠন করতে বললেন। সামগ্রিকভাবে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক উন্নত করার জন্য নাইট ওই প্রেস ব্যুরোর মাধ্যমে পাবলিক নোটিশ এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক বিষয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথাও বললেন।

নাইট তাঁর চিঠিতে বললেন, এর আগে লর্ড নর্থকোট তথ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং সংবাদপত্রের কাছে মুখ খোলার ব্যাপারে সরকারি অফিসারদের ওপর বাধানিষেধ আরোপ করেই সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটাকে

সংঘর্ষের পথে নিয়ে গেছেন। এ অবস্থায় প্রেস ব্যুরো অবস্থার অনেক উন্নতি ঘটাতে পারে বলে নাইট আশা প্রকাশ করেন।

নাইটের এই প্রস্তাবটিকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন স্যর উইলিয়াম হান্টার। তিনি বলেন, সিল্ক বাকিংহামকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করার পর থেকেই এদেশে ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে ওঠে। তাই সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কটা ভাল করার ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকেই করা দরকার।

মূলতঃ স্যর উইলিয়াম হান্টারের চেষ্টাতেই ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গঠিত হয় প্রথম প্রেস ব্যুরো। প্রথম প্রেস কমিশনার হন রোপার লেথব্রিজ। সি. ই. বকল্যান্ডও কিছুদিনের জন্য প্রেস কমিশনারের কাজ চালান। এঁরা দুজনেই কাগজে কলমে মন্তব্য করেন যে, প্রেস কমিশনারের প্রধান কাজই হচ্ছে ইংরেজি সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটা ঝালাই করা। এক্ষেত্রে সে সংবাদপত্রের মালিক বৃটিশ, না ভারতীয় তা দেখার দরকার নেই।

প্রেস ব্যুরো এবং প্রেস কমিশনার নিয়োগের পর ভাবা গিয়েছিল, সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদল হয়েছে। বাস্তবে কিন্তু দেখা গেল, ইংরেজি সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকার বেশ কিছুটা উদার হলেও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র, বিশেষ করে বাংলা কাগজ সম্পর্কে ক্রমেই অসহনশীল হয়ে উঠছে। দেশীয় কাগজগুলিকে প্রলোভন দেখিয়ে যখন সরকারের খয়ের খাঁ করা গেল না, তখন সরকার সেগুলিকে ভয় দেখিয়ে তাঁবে আনার চেষ্টা করল।

দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের এই আক্রোশমূলক মনোভাবের আলোয় কলকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার।

হরিশচন্দ্র মুখার্জির সম্পাদনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নির্ভীক সাংবাদিকতার যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল তা কিন্তু কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদনার সময় সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। কৃষ্ণদাস পাল প্রথম দিকে হরিশ

মুখার্জির নীতিকে অনুসরণ করলেও বাংলায় ছোটলাট অ্যাশলি ইডেনের টোপ গিলে তাঁর এক অন্ধ সমর্থক হয়ে কাগজটির ঐতিহ্যকে যে নষ্ট করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহই নেই।

হিন্দু পেট্রিয়টকে তাঁবে আনার পরই অ্যাশলি ইডেনের নজর পড়ে অমৃতবাজার পত্রিকার ওপর। অমৃতবাজারের সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ ছোটলাট ইডেনকে মুখের ওপর যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে ঝাল যেমন ছিল, তেমনি ছিল এক স্বাধীন নির্ভীক সাংবাদিকের দেশপ্রেমের প্রবাহ। ইডেন প্রলোভনে শিশিরকুমারকে জয় করতে না পেরে ভয় দেখানোর রাস্তা নিলেন। কিন্তু শিশিরকুমারের বুদ্ধির কাছে এবারেও হারতে হ'ল ইডেনকে।

ইডেনের সেই পরাজয়ের কথা বলার আগে অমৃতবাজারের ইতিহাসটা একটু আলোচনা করে নেওয়া ভাল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার অমৃতবাজার গ্রাম থেকে শিশির কুমার ঘোষ এবং তাঁর ভাইরা অমৃতবাজার পত্রিকা নামে বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু করেন। তার আগে অবশ্য শিশিরকুমারের দাদা বসন্তকুমার ঘোষ ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে 'অমৃত প্রবাহিনী' নামে বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাটি কয়েকমাস বাদেই উঠে যায়। শিশির কুমারের সাংবাদিকতার হাতে খড়ি বছর উনিশ বয়সে হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদদাতা হিসেবে। সে সময় গ্রামে গঞ্জে ঘুরে শিশিরকুমার নীলকরদের অত্যাচারের যেসব খবর পাঠাতেন হরিশ মুখার্জি তা রীতিমত গুরুত্ব দিয়ে ছাপাতেন এবং সে সব খবর রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল তখন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার বাংলা সাপ্তাহিক অমৃতবাজারকে দ্বিভাষিক করে তোলেন। বাংলার পাশাপাশি এক কলমে ইংরেজিতেও খবর প্রকাশিত হতে থাকে। তখন পত্রিকাটি প্রকাশিত হত যশোর থেকেই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পত্রিকাটি প্রকাশের জন্য তাঁরা চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় আসার পর থেকেই পত্রিকাটির একটি সংগ্রামী চরিত্র গড়ে উঠতে

থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২মে এক নিবন্ধে তিনি নীল বিদ্রোহকে বাংলাদেশের প্রথম বিপ্লব বলে উল্লেখ করেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা কিন্তু প্রকাশের কিছুদিন পরেই রাজরোষে পড়ে। একটি নিবন্ধ প্রকাশের জন্য লেখক রাজকৃষ্ণ মিত্র, পত্রিকার মুদ্রাকর চন্দ্রনাথ ঘোষ এবং শিশিরকুমার এবং তাঁর অনুজ মতিলালের বিরুদ্ধে একটা মামলা দায়ের হয়। আট মাস বিচারের পর শিশিরকুমার এবং মতিলাল মুক্তি পেলেও রাজকৃষ্ণ মিত্র এবং চন্দ্রনাথ ঘোষের যথাক্রমে এক বছর এবং ছ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়।

অল্পদিনের মধ্যেই অমৃতবাজার দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপত্র হয়ে ওঠে। পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমার এবং মতিলাল রাজনীতিতেও অংশ নিতে থাকেন। শিশিরকুমার পত্রিকার মধ্য দিয়ে যেমন প্রথম পৌরসভা পরিচালনায় ভোটাধিকারের প্রয়োগের কথা বলেন, তেমনি সংসদীয় শাসন প্রবর্তনেরও দাবি জানান। সরকার যখনই কোন দমনমূলক আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তখন সবার আগে প্রতিবাদে সরব হয় অমৃতবাজার পত্রিকা।

অমৃতবাজারের সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই অ্যাশলি ইডেন বিজ্ঞাপনের লোভ দেখিয়ে শিশিরকুমারকে তাঁবেদারে পরিণত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শুধু শিশিরকুমার বা অমৃতবাজার পত্রিকা নয়, সমস্ত বাংলা তথা দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলিকে জব্দ করার ষড়যন্ত্র করতে থাকেন তিনি।

শাসনপরিষদের তৎকালীন নথিপত্রে প্রায়ই অমৃতবাজার পত্রিকা এবং হালিশহর পত্রিকার নাম থাকত। তাতে বলা হত, এদুটি পত্রিকা যে ভাষায় সংবাদ এবং নিবন্ধ পরিবেশন করে তাতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিপদেই মামলা করা যায়। কিন্তু মামলা করলে পত্রিকাগুলি অযথা প্রচার এবং জনসমর্থন পাবে বলেই মামলা করা যাচ্ছে না। পরিবর্তে এদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেই ব্যবস্থাই হ'ল লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট।

দেশীয় সংবাদপত্র দমনে সরকার যে এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করছে তা আন্দাজ করা গেলেও সরকারের তরফে কিন্তু খুব গোপনেই কাজটা সারা হচ্ছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তাঁর 'নেশন ইন মেকিং' গ্রন্থে বলেছেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আর্জি জানাতে এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি যেদিন লর্ড লিটনের সঙ্গে কথা বলতে যান সেদিন লিটন এবং তাঁর শাসন পরিষদ দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের আইনটি গ্রহণ করেন। সেদিন আলোচনার সময় লিটন কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ব্যাপারটি জানান নি।

মূলতঃ অমৃতবাজারের সমালোচনার হাত থেকে রেহাই পেতে বাংলার ছোটলাট অ্যাশলি ইডেনের প্ররোচনায় লিটন ওই আইনটি আনেন। কিন্তু যাকে জব্দ করতে ওই আইন সেই অমৃতবাজার পত্রিকা কিন্তু সুকৌশলে আইনটিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরকারের সমালোচনা চালিয়ে যেতে থাকল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ মার্চ ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট চালু হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে আইরিশ কোয়েরসিয়ন চালু করা হয়েছিল আয়ারল্যাণ্ডের সংবাদপত্রকে দমন করার জন্য, ঠিক সেই আইনের ধাঁচেই এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। এই আইনে সরকারকে আদালতের দ্বারস্থ না হয়েই দেশীয় ভাষার যে কোন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার অধিকার দেওয়া হয়।

আইনটির মুখবন্ধে বলা হয়, কিছুদিন ধরেই দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বৈধ বৃটিশ সরকারের এবং রাজভক্তদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থায় রাজদ্রোহ এবং বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠী, জাতির মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রচার বন্ধের জন্যই এই আইন চালু করা হচ্ছে।

এ আইনে যে কোন জেলা শাসক বা প্রেসিডেন্সি শহরের পুলিশ কমিশনার স্থানীয় সরকারের আগাম অনুমতির বলে সেই এলাকার যে কোন সংবাদপত্রের মুদ্রাকর বা প্রকাশককে ডেকে মুচলেকা এবং জামিনজমা দিতে বলতে পারবেন। ওই মুচলেকা এবং জামিনজমা রাখার দিন থেকে

একবছর সেই কাগজে আর কোন ভাবেই রাজদ্রোহ বা বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো হবে না লিখিতভাবে এমন মুচলেকাও দিতে হবে। এই লিখিত মুচলেকা দিলে অবশ্য আলাদা করে জামিন জমা বা বণ্ড দেবার প্রশ্ন উঠবে না। কিন্তু জামিন জমা বা বণ্ড দিয়েও যদি কোন সংবাদপত্র একই ধরণের অপরাধ করে তাহলে যে কোন সময় তল্লাসির জন্য পরোয়ানা জারি করে সেই কাগজ এবং প্রেসের জামিনজমাসহ সমস্ত কিছু (মেশিন, টাইপ, কাগজ ইত্যাদি ছাপার সাজসরঞ্জাম) বাজেয়াপ্ত করা হবে। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ছ মাস পর্যন্ত জেল এবং জরিমানাও হতে পারবে। এই শাস্তির বিরুদ্ধে অথবা ক্ষতিপূরণের দাবিতে সংশিলষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য গবর্নর জেনারেল পরিষদের কাছে আপিল করতে পারবেন।

আইনটি জারি হবার পর অ্যাশলি ইডেন অমৃতবাজারকে একহাত নেবার জন্য তৈরি হতে থাকেন। কিন্তু আইনের বয়ান দেখে শিশিরকুমার এবং মতিলাল ঘোষ সাপ্তাহিক অমৃতবাজারের পরের সংখ্যাটিকেই পুরো-পুরি ইংরেজিতে প্রকাশিত করেন। যেহেতু আইনটি শুধুই দেশীয় ভাষার সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই ইংরেজি অমৃতবাজারের ক্ষেত্রে সরকার ওই আইনে কোন ব্যবস্হাই নিতে পারলেন না। ঘোষ ভাইরা সেদিন যে তৎপরতায় প্রায় রাতারাতি একটি বাংলা সাপ্তাহিককে পুরো ইংরেজিতে প্রকাশ করেন তা আজও সংবাদপত্র জগতের কাছে এক মহাবিস্ময়।

অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে না পারলেও ওই আইনে বেশ কিছু বাংলা কাগজের বিরুদ্ধে তাদের অতীতের লেখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তখনকার দিনের অন্যতম চালু কাগজ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার বিরুদ্ধেও ওই আইন অনুযায়ী এক নোটিশজারি করা হলে দ্বারকানাথ আইন অনুযায়ী মুচলেকা দিয়ে কাগজ বের করার পরিবর্তে কাগজের প্রকাশই বন্ধ করে দেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্ম-জীবনীতে জানিয়েছেন, কাগজের প্রকাশ বন্ধ রাখায় এত তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় যে অ্যাশলি ইডেন দ্বারকানাথকে ডেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার

পত্রিকা চালু করার কথা বলতে বাধ্য হন। এবং সেইমত সোমপ্রকাশ আবার প্রকাশিত হতে থাকে। সোমপ্রকাশ বন্ধ রাখা এবং আবার প্রকাশ করার মাঝে অবশ্য দ্বারকানাথ 'নববিভাকর' নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন।

সোমপ্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারকে প্রায় নাকে খত দিতে হলেও অন্য কাগজের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি হয়নি। অমৃতবাজার, সোমপ্রকাশ ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি বাংলা কাগজের প্রতি অ্যাশলি ইডেনের সঙ্গে লর্ড লিটনেরও তীব্র আক্রোশ ছিল। এই কাগজগুলি যেভাবে তাঁদের সমালোচনা করতেন তাতেই তাঁরা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

'সাধারণী' পত্রিকার ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের দিল্লি দরবারের বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে বড়লাটের পদ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তাছাড়াও সাধারণী প্রায় প্রতি পদে সরকারের কাজের সমালোচনা করত। লর্ড লিটন তখন প্রচলিত আইনে এ পত্রিকার বিরুদ্ধে তেমন ব্যবস্থা নিতে না পারলেও এবার তার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থাই নেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শাসন পরিষদের মাত্র একটি বৈঠকেই ওরিয়েণ্টাল ল্যাঙ্গুয়েজস প্রেস অ্যাকট নামে আইনটি গ্রহণ করে লিটন তা অনুমোদনের জন্য বৃটেনে পাঠান। তার আগেই অবশ্য লিটন এই বিলটি পেশ করার অনুমতি নিয়ে নেন তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড সলিসবেরির কাছ থেকে। পরবর্তী ভারতসচিব ক্র্যানবোর্ড ওই আইনটি অনুমোদনের কথা জানিয়ে সংশ্লিষ্ট আইন থেকে "আগাম-সেনসর সংক্রান্তবিধিটি" বাদ দিতে বলেন ওইসঙ্গে সরকারি অফিসার এবং সরকারি ব্যবস্থার সমালোচনা করলেই যাতে শাস্তি পেতে না হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে একটু উদার হতে বললেন। সেইমত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট নামে চালু আইন সংশোধিত হয়।

এই আইনটি উত্থাপনের সময় থেকে শুধু ভারতে নয়, বৃটেনেও সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিলটি গবর্নর জেনারেলের পরিষদে উত্থাপন

করেছিলেন স্যর আলেকজাণ্ডার আরবনট কিন্তু সমস্ত সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠলেন বাংলার লেঃ গবর্নর স্যর অ্যাশলি ইডেন। বিশেষ করে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'গ্যাগিং অ্যাকট' এবং 'অস্ত্র আইনের' মত এক্ষেত্রে 'আনুগত্যহীন দেশীয় কাগজ' এবং 'অনুগত বৃটিশ কাগজ'-এর নামে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হল তাতে কোন পক্ষের সমালোচনাকেই ঠেকানো গেল না।

মাদ্রাজ গবর্নর পরিষদের সদস্য স্যর ডবলিউ রবিনসন এক কড়া মন্তব্যে বলেন, ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য এখুনি কোন বিশেষ আইনের প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করেন না। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে অ্যাশলি ইডেনের বিশ্লেষণকেও তিনি মেনে নিতে পারছেন না। তাছাড়া ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র সে দেশের প্রজা বা অসন্তুষ্ট অধিবাসীর আনুগত্যের গ্যারাণ্টি হতে পারে না।

স্যর ডবলিউ রবিনসন আরো স্পষ্ট করে বলেন, ইংরেজি এবং ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলির জন্য আলাদা বিচারব্যবস্থা বা তাদের ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখাটা কখনই উচিত নয়। এমনিতেই প্রায় প্রতিদিন জাতি বিদ্বেষ যেভাবে বাড়ছে সেটা গুরুতর উদ্বেগের বিষয়, তারও পর আইন করে জাতি বিদ্বেষ ছড়ানো কতটা যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা দরকার। তাছাড়া দেশীয় সংবাদপত্রগুলি যে পরিমাণ বিদ্বেষ বা ঘৃণা ছড়াচ্ছে তার থেকে অনেক বেশি বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে ইংলণ্ড থেকে আসা নিম্নমানের লেখাগুলি। মনে রাখা দরকার, কণ্ঠরুদ্ধ, বিপর্যস্ত এবং স্তাবক সংবাদপত্র বিপজ্জনক না হলেও একেবারেই অদরকারি। এ অবস্থায় দেশীয় সংবাদপত্র দমনের জন্য কোন আইন না করার পরামর্শ দেন তিনি।

কিন্তু গবর্নর পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকটের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকটকে কিন্তু সবচেয়ে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। কলকাতার জনসভায় জোরালো ভাষায় ওই আইনের

বিরোধিতা করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, যেভাবে এই আইন আনা হয়েছে তার প্রতিটি পদক্ষেপের মধ্যেই সরকারের ভুল নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। এই আইনের তুলনায় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ক্যানিংয়ের গ্যাগিং অ্যাকটও রীতিমত উদার আইন। আইন প্রণয়ণের জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন তা যে রীতিমত উদ্দেশ্যমূলক তাতেও কোন সন্দেহ নেই। ইডেনের আগে বাংলার দুই ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল এবং স্যর জর্জ ক্যাম্বল ভারতীয় ভাষার সংবাদপত্রগুলিকে আনুগত্যের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন। তাই প্রশ্ন ওঠে ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব কাগজ অনুগত ছিল হঠাৎ তিনবছরে এমন কি ঘটল যার জন্য তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল? বাংলা থেকে প্রকাশিত ৩৫টি বাংলা কাগজের মধ্য থেকে মাত্র ১৫টি কাগজের ৩২টি রাজদ্রোহমূলক অংশের নজির তুলে এই আইন আনা হয়েছে। ওই ১৫টি কাগজের মধ্যে সমাচার দর্পণের প্রকাশ আবার ছ মাস আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া অনুচ্ছেদগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রেও অবাধ স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ওই অংশগুলি বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ওইসব নিবন্ধের আনুগত্যের পরিচয়জ্ঞাপক অংশগুলি ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এ আইন প্রয়োগের ক্ষমতা যেখানে জেলাশাসক বা পুলিশ কমিশনারদের হাতে সেখানে ইডেন নিজে বেশ কিছু পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, সমালোচনা সহ্যে অপরাগ ইডেন ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থেই এ আইনের সুপারিশ করেছেন।

সেদিনের সেই সভার উদ্যোক্তা ছিল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন। অ্যাসোসিয়েসনের পক্ষ থেকে গ্ল্যাডস্টোনকেও একটি চিঠি দেওয়া হয়। গ্ল্যাডস্টোন এই আইনটি ঠেকাতে ব্যর্থ হলেও কমন্স সভায় এক প্রস্তাব এনে বলেন, ওই আইনে যেসব পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা ভারতসচিবকে জানাতে হবে এবং ভারতসচিবকে তা সংসদে পেশ করতে হবে। সেদিন গ্ল্যাডস্টোনের সে প্রস্তাবও খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু সভার

কার্যবিবরণী থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সভার বহু সদস্যর মনেই ওই আইনের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহের মেঘ উঠেছিল।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট জারির দু'বছর পরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রক্ষণশীলদের হারিয়ে উদারনৈতিকরা ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী হন গ্ল্যাডস্টোন। ভারতেও লিটনের জায়গায় বড়লাট হয়ে আসেন লর্ড রিপন। ফলে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির যেমন পরিবর্তন হ'ল তেমনি সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারি নীতিতেও লাগল বদলের হাওয়া। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকটের বিরোধী গ্ল্যাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর গবর্নর পরিষদের সভায় আইনটি রদ হয়ে যায়।

দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য জারি করা ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট জাতির জীবনে আনল জোয়ার। ওই আইনের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় হ'ল জাতির নতুন নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের আর এরই মধ্য দিয়ে বিশ্বের সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সংযোজনের অবকাশ পেল অমৃতবাজার পত্রিকা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, ওই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনই জাতীয় আন্দোলনের উৎস মুখ, অন্যদিকে মতিলাল ঘোষ বলেন, এ আন্দোলন অমৃতবাজার পত্রিকার জাতীয় পত্রিকা বা জাতীয় মর্যাদালাভের সূচনা। সব মিলিয়ে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট শাপে বর হয়ে উঠল—তার প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বেজে উঠল নতুন ভোরের ভৈরবী।

## সূর্য ওঠার আগে

এ যেন সূর্য ওঠার আগের মুহূর্ত। অন্ধকারের বৃন্তে রক্তিম সকালের ফুটে ওঠার প্রস্তুতি। লর্ড লিটনের শাসনকালে ভারতের বুকে নেমে এসেছিল যে কালো অন্ধকার, অত্যাচার আর দমনের যে কামড় হয়েছিল তীব্র—তা যেন আলগা হবার লক্ষণ দেখা দিল, অন্ধকারের বুকে দেখা গেল আলোর আভাস। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নির্বাচনে গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বে উদারনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার পরই ভারত সম্পর্কে চিন্তাভাবনার স্রোতটা নতুন খাতে বইতে শুরু করল। ভারত বৃটেন সম্পর্ক নিয়ে নতুন মূল্যায়ন ভারতে আনল স্বস্তি, জাগাল প্রত্যাশা। বৃটেনের প্রগতিবাদী গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতের নবোদ্ভূত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মানসিক নৈকট্য দু'টি দেশকে যেন সহানুভূতির গভীর বন্ধনে বাঁধতে থাকল। ভারতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র আর দেশীয় সংবাদ-পত্রের বর্তমান ব্যবধান আর বৃটেনের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের কথা কলকাতার সংবাদদাতারা প্রায় নিয়মিতভাবে পাঠাতে থাকলেন ফ্লিট স্ট্রিটের সংবাদ-পত্রগুলিকে। এতে ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা বৃটেনের উদারনৈতিক এবং প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ক্রমেই অবহিত হতে থাকলেন। ফলে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ শাসকদের ভাবনাচিন্তার স্রোতেও স্পষ্ট হয়ে উঠল বাঁক নেবার লক্ষণ। এ অবস্থায় ভারত থেকে লর্ড লিটনকে সরিয়ে লর্ড রিপনকে যখন গ্ল্যাডস্টোন বড়লাট করলেন তখন কলকাতার দেশীয়ভাষার সংবাদপত্রগুলি নতুন প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে রইল তেমনি কলকাতা এবং অন্যজায়গায় ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিতে দেখা গেল কিছুটা আতঙ্ক, ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। এই ভয় ভাবনা এবং আশা শুধু লর্ড রিপন বৃটিশসরকারের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে ভারতে এসেছেন বলেই নয়, নতুন দলীয় সরকার অতীতের ভুলভ্রান্তি সংশোধনে এবং অনাচার অত্যাচার নিরসনে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ বলেও।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে শুধু বৃটেনে নয়, ভারতেও দেখা গেল একটা নতুন ধারা। মহীশূরকে সেখানকার মহারাজাদের হাতে প্রত্যর্পণ, বাজেটে বিভিন্ন আমদানি পণ্যের শুল্ক হ্রাস, কৃষকদের অবস্থা উন্নয়নে পরিকল্পনার খসড়া অথবা নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির সম্প্রসারণের প্রতিক্রিয়া হ'ল সুতীব্র এবং সুদূরপ্রসারী। এরই পাশাপাশি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি যখন ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংশোধনের জন্য ইলবার্ট বিল এল তখন ক্রিয়া বিক্রিয়ার এক প্রচন্ড সংঘাত দেখা গেল। বিশেষ করে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা এই ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে মুখর হয়ে উঠল। অথচ ভারতীয় ফৌজদারি আইন সংশোধনের জন্য আনা ইলবার্ট বিলটি হঠাৎ কোন ব্যবস্থা নয়। এর আগে এই আইন সংশোধনের জন্য বি এল গুপ্ত যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং অ্যাশলি ইডেন যা অনুমোদন করেছিলেন তারই ভিত্তিতে লর্ড রিপন-এর আমলে আইন-বিষয়ক সদস্য কার্টনি ইলবার্ট এই সংশোধনী বিলটি উত্থাপন করেন। ওই বিলে মফঃস্বলের ইউরোপীয় আসামিদের ভারতীয় বিচারকদের বিচারের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়।

বিলের খসড়া প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ইউরোপীয়দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এই বিল বাতিলের জন্য তারা তীব্র আন্দোলন শুরু করে দেয়। সে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ব্যারিস্টার ব্র্যানসন।

সেই আন্দোলনের মুখে লর্ড রিপন সিমলা থেকে কলকাতায় এলে তাঁকে রীতিমত অপমান করা হয়। লর্ড রিপন যদি প্রস্তাবিত ইলবার্ট বিলকে একইভাবে গ্রহণ করার জন্য চাপ দেন তাহলে তাকে অপহরণ করার পর্যন্ত এক চক্রান্ত করে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী। লাটভবনে দেওয়া ভোজ সভা বয়কট করেন ইউরোপীয়রা এবং চারিদিকে যেন উত্তেজনার আগুন জ্বলতে থাকে। এমনও শোনা যায়, ছোটলাট অ্যাশলি ইডেনেরও এই চক্রান্তের কথা অজানা ছিল না— কিন্তু তিনি সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেননি।

এই আন্দোলনের চাপেই ইলবার্ট বিলটি যথাযথ অবস্থায় গৃহীত হয়নি। এর বেশ কিছু বিধি সংশোধন করা হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংশোধিত অবস্থায় গৃহীত বিলটিতে ভারতীয় দায়রা এবং জেলাজজদের বিচারের আওতায় ইউরোপীয়দের আনা হলেও বলা হল বিচারের জন্য যে জুরি নিয়োগ করা হবে কম করে তার অর্ধেক হবে ইউরোপীয়। ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নেতা স্পষ্ট ভাষায় জানালেন শান্তি রাখতে সমঝোতা হিসেবে এটা করা হয়। কিন্তু সব মিলিয়ে নতুন আইনে অবস্থাটা কিন্তু আগের চেয়ে খারাপ হয়ে ওঠে। ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরোধ হ'ল আরো তীব্র।

ইলবার্ট বিল নিয়ে ইউরোপীয়রা যেমন তীব্র বিরোধিতা করে তেমনি লালমোহন ঘোষ এবং অন্যান্য আরো কয়েকজনের নেতৃত্বে ভারতীয়রা বিলের সমর্থনে সরব হন। শেষ পর্যন্ত ইলবার্ট বিল আন্দোলনে ভারতীয়রা তখনকার মত ব্যর্থ হলেও, ব্যর্থতার মধ্য থেকেই শিক্ষা পেলেন, ঐক্য এবং উপযুক্ত সংগঠন ছাড়া ইংরেজদের কাছ থেকে কোনরকম অধিকারই অর্জন করা যাবে না। এই শিক্ষা ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নেওয়ার পক্ষে হ'ল সবচেয়ে বড় সহায়ক।

ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ইংরেজ বিদ্বেষ এত তীব্র হয়ে উঠল যে ছোটলাট অ্যাশলি ইডেনের বিদায় সভা শেষ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলনের চাপে বন্ধ হয়ে যায়। আবার বড়লাট রিপণ-এর বিদায় উপলক্ষে ভারতীয়রা কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সমারোহ করে তাতে রিপণ-প্রশাসনের প্রতি ভারতীয়দের সন্তোষ এবং অনুরাগের কথাই প্রকাশ পায়। এই সমারোহ দেখে পাইওনিয়ার পত্রিকায় 'If it be real what does it mean' শিরোনামে একটি উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষরবিহীন ওই নিবন্ধটির লেখক পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের উদ্যোক্তা অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।

এই সময়েই কলকাতার সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করে এমন একটি ঘটনা ঘটে যার মধ্য দিয়ে ভারতের আগামী আন্দোলনের নেতার আবির্ভাব ত্বরান্বিত

হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি নরিস এক হিন্দুর গৃহদেবতাকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, মূর্তিটি কিছুতেই একশবছরের পুরনো হতে পারে না। এই ঘটনাটি প্রকাশ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাবা এবং বিশিষ্ট আইনজীবী ভুবনমোহন দাশের 'বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন' পত্রিকায় বলা হয়, এই প্রথম হিন্দুর গৃহদেবতাকে আদালতে টেনে আনা হ'ল। ভুবনমোহন ওই সংবাদটির শেষে মন্তব্য করেন।

> Whether the orthodox Hindus of Calcutta will tamely submit to their family idols being dragged into court is a matter for them to decide, but it does seem to us that some public steps should be taken to put a quietus to the wild eccentricities of this young and raw dispenser of justice.
>
> কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুরা বিনতভাবে তাঁদের গৃহদেবতাদের আদালতে হাজির করবেন কিনা সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার ভার তাঁদের, কিন্তু এধরণের খামখেয়ালি অনভিজ্ঞ তরুণ আইনের রক্ষকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য জনগণকেই কোন ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই সংবাদটি উদ্ধৃত করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় মন্তব্য করলেন, নরিস ওই উচ্চপদের অযোগ্য এবং তাঁর যা প্রকৃতি তাতে তিনি ওই পদের মর্যাদা রক্ষার পক্ষেও অনুপযুক্ত।

মজার ব্যাপার হ'ল বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়নে যে খবর ছাপা হয়েছিল তার কোন প্রতিবাদ পর্যন্ত করা হল না, অথবা তার বিরুদ্ধে মামলা আনা হ'ল না কিন্তু সেই সংবাদের ভিত্তিতে লেখা সম্পাদকীয়র জন্য সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এক মামলা আনা হল।

বিচারপতি নরিস সম্পর্কে মন্তব্য করায় ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২ মে সুরেন্দ্রনাথকে এক রিট জারি করে কেন আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর বিচার হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হয়। ৫ মে শুনানির দিন ধার্য হয়। ওইদিন প্রধান বিচারপতি স্যর রিচার্ড গার্থ-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যর

এক বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি হয়। বেঞ্চে গরিষ্ঠ ইউরোপীয় বিচারপতির দল কারাদণ্ডের কথা বললেও ভারতীয় বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র শুধু জরিমানা করার পক্ষে মত দেন। বিচারপতি মিত্রকেও গরিষ্ঠের মত মেনে নেওয়ার জন্য প্রধান বিচারপতি অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাতে রাজি হন না। ফলে বিচারপতি মিত্রের ভিন্ন মত সহ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে দু' বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার রায় ঘোষণা করা হয়।

সুরেন্দ্রনাথের এই বিচার চলার সময়ই কলকাতায় এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সুরেন্দ্রনাথ যখন কারাদণ্ড ভোগ করছেন তখনও এই আন্দোলন চলে। কলকাতার ছাত্ররাই ছিল এ আন্দোলনের পুরোভাগে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ছাত্র এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর যুক্ত হওয়ার ক্রিয়া শুরু হয়ে যায় সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বেঙ্গলী কাগজকে কেন্দ্র করেই।

যে দিন সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের আদেশ ঘোষিত হয় সেদিন কলকাতায় ভারতীয়দের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। ছাত্ররা সেদিন শোক পালন করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম খোলা মাঠে জনসভা করার রেওয়াজ চালু হ'ল। এর আগে সভা করা হত কোন হল ঘরে। কিন্তু সভায় এত লোক আসতে শুরু করল যে হল ঘরে তার জায়গা হল না। বাধ্য হয়েই খোলা ময়দানে হল সভা। সে সভায় শুধু ছাত্র বা শিক্ষিত শ্রেণী নয়, সর্ব শ্রেণীর মানুষ এসে যোগ দিলেন। সেদিনের সেই ঘটনার উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী 'দি মেকিং অব এ নেশন'-এ বলেছেন, "বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন ছাড়া আমার জীবনে এত স্বতঃস্ফূর্ত ও ব্যাপক জনজাগরণ দেখিনি। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে এবং আমার সমর্থনে প্রায় প্রতিটি শহরে জনসভা হয়। অনেক জায়গায় সরকারি কর্মচারীরা পর্যন্ত তাতে যোগ দিয়ে শাস্তিভোগ করেন।" এ আন্দোলন কিন্তু একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার হয়নি। বাংলাদেশের জনজীবনে এটি একটি স্থায়ী দাগ ফেলে রেখে যায়।

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর বেঙ্গলী কাগজ অসম্ভব

জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সুরেন্দ্রনাথ উন্নীত হন নির্যাতিত রাজনৈতিক দেশপ্রেমিক ও জাতীয় নেতার পদে। রাজনৈতিক কারণে বৃটিশ আদালতে প্রথম শাস্তিপ্রাপ্ত সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলী কাগজের চাহিদা তখন এত বেড়ে যায় যে, তিনি সহজেই এই কাগজ কেনার সময় যে ঋণ হয়েছিল তা শোধ করে দেন।

বেঙ্গলী পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশ করেন বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। হিন্দু পেট্রিয়টের মতই এ পত্রিকাতেও তিনি জনগণের অভাব অভিযোগের কথা নির্ভীকতার সঙ্গেই প্রকাশ করতেন। কিন্তু আর্থিক দিক থেকে কাগজটি কোনদিনই দাঁড়াতে পারেনি। তাই একসময় তিনি এটিকে বেচারাম চ্যাটার্জির কাছে বেচে দেন। বেচারাম চ্যাটার্জিও কিন্তু বেশিদিন কাগজটি চালাতে পারেননি। তাঁর কাছ থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কাগজটির মালিকানা গ্রহণ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, বেচারাম চ্যাটার্জি পত্রিকাটি সুরেন্দ্রনাথকে দান করতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু রমানাথ লাহা যখন বললেন, এই হস্তান্তরকে আইনের চোখে বৈধ করতে কিছু টাকা নিতেই হবে তখন বেচারাম চ্যাটার্জি মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে পত্রিকাটির স্বত্ব ছেড়ে দেন। এরপর এক বন্ধুর কাছ থেকে বিনা সুদে ৭০০ টাকা ধার নিয়ে মোট ১৭শ টাকা তিনি দেন ছাপাখানার জন্য। কয়েকমাসের মধ্যেই অবশ্য তিনি ধারের ওই টাকা শোধ করে দেন।

কাগজটি সম্পূর্ণভাবেই চালাতেন সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর এক বন্ধু। শনিবার শনিবার কাগজটি বেরত। শুক্রবার রাত জেগে তাঁরা প্রুফ দেখতেন, দরকারে লেখালেখি করতেন এবং মুদ্রাকরকে যথাযথ নির্দেশ দিতেন। সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদনার গুণে পত্রিকাটি কিছুদিনের মধ্যেই একটি স্বতন্ত্রধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের সময় আন্দোলন করে এবং পরবর্তীকালে মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়ে বেঙ্গলী সারা দেশে একটা সাড়া জাগিয়ে তোলে। দিন দিন বেঙ্গলীর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দ থেকে এটি দৈনিক আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।

বেঙ্গলী পত্রিকায় বিচারপতি নরিসের সমালোচনার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হওয়ায় কলকাতা এবং বাংলাদেশ জুড়ে যে আন্দোলন হয় তা এক অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। তার সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের রিপোর্টে আনন্দমোহন বসু লেখেন,

> It has now been demonstrated by the universal outburst of grief and indigration which the event called forth, that the people of different Indian provinces have learnt to feel for one another, and that a common bond of unity and fellow feeling is rapidly being establisted among them.

সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস নিয়ে সেদিনের আন্দোলনের ফলে সারা ভারতবর্ষের মানুষ একাত্মবোধের ভাবনায় ভাবতে শুরু করল, দ্রুত গড়ে উঠতে থাকল এক ধরণের সংহতিবোধ, মানুষ বাঁধা পড়তে থাকল এক সাধারণ বন্ধনে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়েই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই কলকাতায় আহ্বান করা হ'ল ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন। সে অধিবেশন সম্পর্কে আনন্দমোহনের অভিমত, এটা হ'ল জাতীয় সংসদ গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের চেষ্টাও দানা বাঁধতে থাকে তখন থেকেই। অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম ভারতীয় শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি এক আহ্বানে বলেন, সংগঠিত হও, নিজেদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম কর। ব্যক্তিস্বার্থের কথা ভুলে নিজের ও দেশের ব্যাপক স্বাধীনতার জন্য সংগঠিতভাবে সংগ্রাম কর, নিরপেক্ষ প্রশাসন এবং নিজেদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আরো অধিকার আদায় কর।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন গড়ার জন্য তিনি ৫০ জন ভাল ও সৎ ব্যক্তিকে চাইলেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। লর্ড ডাফরিন তাঁকে বললেন, শুধু সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা নয়, অনুগত রাজনৈতিক বিরোধী দলের

ভূমিকাও পালন করতে হবে এদের। ওই পরামর্শ মাথায় রেখেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে জন্ম নিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে মন্তব্য করেন,

It gave an impetus to journalism. The Sulava Samachar had been started a pice paper by the late Keshab Chandra Sen, but the movement for cheap journalism had languished. Now however, it received an awakened impulse in the Passionate desire for news. Babu Jogendranath Bose started the Bangabasi as a pice paper. His example was followed by Babu Kristo Kumar Mitter. The Bangabasi and Sanjibani still continue to hold an important place in journalistic world of Bengal.

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে যে 'বঙ্গবাসী'র উল্লেখ করেছেন, জনজীবনে তার প্রভাব ছিল অসীম। মানুষ তখন খবরের কাগজ বলতে বুঝত শুধুই বঙ্গবাসী-কে। নিরক্ষর বা গ্রামের মানুষের কাছে তখন ইংরেজি কাগজেরও পরিচয় ছিল ইংরেজি বঙ্গবাসী হিসেবে।

ইংরেজি সাপ্তাহিক বেঙ্গলী সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে যে জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করল তাকেই ব্যাপক ও বহুমুখী করে তুলল বাংলা বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সাধারণী, প্রচার, নবজীবন প্রভৃতি পত্রিকা। এরই পাশাপাশি অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় স্বাজাত্যবোধ এবং দেশপ্রেম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকারের প্রতিটি অবৈধ কাজের বিরোধিতা করে যেতে থাকে। মূলতঃ বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে নিয়ত সংঘাতের মধ্য দিয়ে অমৃতবাজার এক নতুন ইতিহাস তৈরি করল।

লর্ড রিপন এবং লর্ড ডাফরিনের সময়ের কিছু ঘটনা নিয়ে সরকারের সঙ্গে অমৃতবাজারের ছোটখাট সংঘাত ঘটলেও মোটামুটি ভাবে অমৃতবাজারের ওপর আইনের তেমন কোপ এসে পড়েনি। এর জন্য লর্ড ডাফরিনের সুবুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। কেননা, ওইসময় অমৃতবাজার

ভূপালের শাসন সংক্রান্ত কতকগুলি খবর ও তার ওপর সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করে। দেশীয় কাগজে সরকারি নীতির সমালোচনা দেখে ভূপালের এজেন্ট পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা আনার জন্য ডাফরিনের কাছে আবেদন জানান। ডাফরিন বললেন, মামলা করলে কুৎসা আরো বেশি করে ছড়াবে, তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল। ভারতীয় কাগজকে শাস্তি দিতে বড়লাটের এই অনীহায় অপমানে ক্ষিপ্ত এজেন্ট ইস্তফা দেন।

কিন্তু লর্ড ডাফরিনের পর লর্ড ল্যান্সডাউন বড়লাট হয়ে আসার পরই অমৃতবাজার আরেকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের সঙ্গে বড় ধরণের সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ল্যান্সডাউন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। আর ওই বছরই কাশ্মীর সীমান্ত সম্পর্কে মর্টিমার ডুরান্ডের কার্যবিবরণীর নোট বলে অমৃতবাজার পত্রিকা যা প্রকাশ করে তাতে ল্যান্সডাউন রীতিমত চটে যান।

ল্যান্সডাউন বলেন, ওই নথির প্রথম দু'টি স্তবক যথাযথ হলেও পরের স্তবকগুলি দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হয়ে রদবদল করা হয়েছে। ল্যান্সডাউন বলেন, গোপন সরকারি নথিপত্র ফৌজদারি বিশ্বাসভঙ্গের মাধ্যমে ছাড়া সংগ্রহ করা যায় না জেনেও যারা সেসব নথিপত্র সংগ্রহ করে এবং সেসব নথির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহপরায়ণ হয়ে তাতে রদবদল করে তাদের দায়দায়িত্ব অনেক এবং অপরাধের গুরুত্বও অনেক বেশি।

ল্যান্সডাউনের এই বক্তব্যের উত্তরে 'স্টেটসম্যান' লেখে, ল্যান্সডাউন ওই নথির সত্যতা অস্বীকার না করে কয়েকটি অনুচ্ছেদে শব্দ রদবদলের যে অভিযোগ করেছেন তা আদৌ টেকে না। সম্ভবত তাড়াতাড়ি নকল করতে গিয়েই ওই শব্দবিপত্তি। শব্দবিপত্তি ঘটলেও নথির বক্তব্য যে ঠিক তাতে এখন আর কোন সন্দেহই থাকছে না।

স্টেটসম্যান পত্রিকার এই সমালোচনার পরও ল্যান্সডাউন অমৃতবাজার পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় অনেকেই ধরে নেন সরকার বোধহয় এ ব্যাপারে পিছু হটলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল সরকার মোটেই পিছু হটেননি বরং নতুন করে আক্রমণের জন্য তিন পা এগিয়ে দু পা পিছিয়ে যাবার কৌশল নিয়েছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেই

তাঁরা সরকারি নথিপত্র এবং তথ্য ফাঁস রোধে জারি করলেন অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাকট বা ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ নম্বর আইন। এই আইনে বিদেশে তথ্য পাচারের জন্য যাবজ্জীবন বা কম করে পাঁচ বছর কারাদণ্ড এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা বা উভয় দণ্ডেরই ব্যবস্থা রাখা হয়। সরকারি গোপন তথ্য সম্পর্কে বৃটেনে যে আইনটি চালু ছিল হুবহু সেই ধাঁচেই ভারতেও আইনটি বলবৎ করা হয়। সংবাদপত্রকে কিছুটা শিক্ষা দিতে, যাতে সরকারি গোপন তথ্য প্রকাশ না পায় তার জন্য জারি করা এই আইনটি কিন্তু সংবাদপত্রের, বিশেষভাবে অমৃতবাজার পত্রিকার শক্তিবৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠল। জনসমাজে অমৃতবাজারের নির্ভীক চরিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরিমধ্যে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার হিন্দু সহবাস সম্মতি নামে যে নতুন বিলটি আনল তাতে দেশের হিন্দু সমাজ দারুণভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সমাজের সেই উত্তেজনার আঁচ লাগল সংবাদপত্রের পাতাতেও। তীব্র ভাষায় চলতে থাকল সরকারের সমালোচনা। সেইসঙ্গে দেশের নানা জায়গায় সংগঠিত হতে থাকল প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ। সবকিছুকে নীরবে মেনে না নিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে প্রতিবাদ জানাবার মানসিকতা বাড়তে থাকল। শিক্ষিত শ্রেণীর সমাজচেতনতা বাড়ছে দেখে অমৃতবাজারও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পত্রিকাটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করে।

ওদিকে সহবাস সম্মতি বিলকে হিন্দু ধর্মের ওপর সরাসরি অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করায় বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক, ম্যানেজার এবং মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। বাংলার তৎকালীন ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট ওই পত্রিকার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারায় প্রথম মামলাটি আনেন উত্তেজনাপূর্ণ নিবন্ধ ছাপার অভিযোগে। প্রধান বিচারপতি রায় দেন, ওইসব লেখা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের ইচ্ছাকৃত প্রয়াস। মামলার জুরিরা কিন্তু প্রধান বিচারপতির সঙ্গে একমত না হয়ে ভিন্ন অভিমত দেন। ফলে পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত চূড়ান্ত রায় দান স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে বঙ্গবাসী

দুঃখ প্রকাশ করে এবং বঙ্গবাসীর প্রকাশক, সম্পাদক ও মুদ্রাকর আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে তাঁরা এ ধরণের আর কোন নিবন্ধ প্রকাশ করবেন না। বঙ্গবাসীর এই প্রতিশ্রুতি এবং দুঃখ প্রকাশের পর স্বাভাবিকভাবেই সরকারের তরফ থেকে পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না।

বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে ১২৪ ক ধারা প্রয়োগের পর বিচারের ক্ষেত্রে যে আইনগত জটিলতা দেখা যায় তাতে সরকার আর ওই আইনটি প্রয়োগের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ পান না। তবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ওই মনোভাবের সুযোগ নিয়ে ছোটলাট স্যর চার্লস ইলিয়ট কিন্তু এই ফাঁকে নেটিভ প্রেস অর্গানাইজেসন নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন এবং অনুগত সংবাদপত্রগুলির ক্ষেত্রে সরকারি সংবাদ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য নেটিভ প্রেস কমিশন নিয়োগ করলেন। সেসময় ইণ্ডিয়ান মিরর, ইণ্ডিয়ান নেশন এবং রেইজ অ্যাণ্ড রায়ত ছাড়া ভারতীয় মালিকানার আর সব কাগজ ওই নেটিভ প্রেস অর্গানাইজেসনে যোগ দেয়।

আগের ছোটলাট স্যর অ্যাশলি ইডেনের মতই স্যর চার্লসেরও দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে কেমন যেন একটা অ্যালার্জি ছিল। দেশীয় সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হত তার মধ্যেই স্যর চার্লস একটা খারাপ উদ্দেশ্য খুঁজে পেতেন। তাছাড়া স্যর চার্লস ছিলেন হিন্দু বিধবার মত একটু ছুৎমার্গসম্পন্ন মানুষ। তাঁর ধারণা ছিল, সরকারিস্তরে যা কিছু বলা হয় অথবা করা হয়, সবই সরকারি গোপন তথ্য। সব সময় তাঁর ভয়, এই বুঝি কোন গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেল। তাই তিনি নিজে যেমন এক ধরণের মানসিক ভয়ের শিকার ছিলেন, তেমনি কাগজে প্রকাশিত সব কিছুর মধ্যেই আইনভাঙার নজির খুঁজে ব্যবস্থা নেবার চেষ্টা করতেন।

স্যর চার্লসের এই মানসিকতা তখন অনেকেরই রাগ এবং বিরক্তির কারণ হয়ে উঠলেও তেমনভাবে কেউ প্রতিবাদ করেন নি। কিন্তু রেইজ অ্যাণ্ড রায়ত-এর সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় ছোটলাটের সবকিছুর ওপর নেকনজর রেখে যা পেতেন তাই ছেপে দিয়ে তাঁর অস্বস্তির মাত্রা বাড়াতেন। ওইসঙ্গে সুযোগ পেলেই তিনি ছোটলাটের সমালোচনা

করতেন তাঁর কাগজে। সে সমালোচনা ছিল ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম অথচ সাধারণভাবে খুবই নির্দোষ ধরণের। কিন্তু ওই সমালোচনায় ছোটলাট শুধু যে জ্বলতেন তা নয়, অনেক সময় ছেলে মানুষের মত কাণ্ডকারখানাও করতেন। তাঁর সেই কাণ্ড দেখে ডাঃ মুখার্জি এক ধরণের মজা পেতেন এবং ছোটলাটকে রাগাবার জন্যই সেই ঘটনার জের টেনে মন্তব্য করতেন রসিয়ে রসিয়ে।

যেমন সেবার, আফিম বিভাগের পরীক্ষায় অসফল এক পরীক্ষার্থী ছোটলাটের কাছে পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করেন। অভিযোগটি যথাযথ দেখে ছোটলাট সে ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে নির্দেশ করেন। ডাঃ মুখার্জি সেই খবরটি জানতে পেরেই তা তাঁর রেইজ অ্যাণ্ড রায়তে ছাপিয়ে দেন। খবরটি দেখেই স্যর চার্লস রেগে লাল, এ তো রীতিমতো গোপন তথ্য ফাঁসের সামিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মুখার্জিকে চিঠি দিলেন, কে খবরটি দিয়েছে, তার নাম জানাও।

উত্তরে ডাঃ মুখার্জি জানালেন, ওটা একটা বাজারে আলোচনার ভিত্তিতে লেখা। হঠাৎই একটা আলোচনা শুনে তিনি একে লিখেছেন। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ তাঁর হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, সেই আলোচনাটা মনে না রাখার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। কিন্তু আলোচনাটা এমনই মজার যে তিনি কখন যেন সেটি লিখে ফেলেন। তারপর খবরের অভাব দেখে কে যেন এটি পাতায় বসিয়ে দিয়েছে।

ডাঃ মুখার্জির এই হেলাফেলা জবাব স্যর চার্লসকে আরো চটিয়ে দিল। তিনি তাঁর সচিবালয়ের কর্মীদের এক নির্দেশে জানিয়ে দিলেন,খুব সাবধান! কোন রকমেই যেন সরকারি গোপন তথ্য ফাঁস না হয়। এমনকি ঘরোয়া আলোচনার সময়ও তথ্য প্রকাশ হতে পারে এমন কিছু বলবে না।

এত হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান মিরর কাগজে এমন একটা চিঠি প্রকাশিত হ'ল যার থেকে স্যর চার্লস ধরে নিলেন, তাঁর কর্মচারীদের বেফাঁস কথাবার্তাই সংবাদটির উৎস। ইণ্ডিয়ান মিরর-এর ওই চিঠিতে লেখা হয়, স্যর চার্লসের সচিবরা তাঁর চেয়েও খারাপ লোক। চিঠিটা দেখেই স্যর চার্লস রেগে টং। সচিবালয়ের কেরাণীরা আলোচনার সময়

এ ধরণের মন্তব্য করেছে বলে তাঁর ধারণা হ'ল, তাই তিনি ইণ্ডিয়ান মিরর-এর সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখলেন, পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তারজন্য অনায়াসে মামলা করা যায়, কিন্তু তিনি এবারের মত তাঁদের শুধু হুঁশিয়ার করেই ছেড়ে দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে এ জাতীয় কথার ভিত্তিতে কিছু প্রকাশ করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যর চার্লসের এই হুঁশিয়ারির প্রতিবাদ করে ইণ্ডিয়ান মিরর একটু শক্তভাবেই লিখল, খবরের খোঁজে সচিবালয়ের অলিন্দে আড়ি পাতা হয়েছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা মোটেই ঠিক নয়। তাই স্যর চার্লসের এই হুঁশিয়ারিকে তাঁরা মেনে নিতে পারছেন না। ব্যাপারটার ওইখানেই ইতি। কিন্তু রেইজ অ্যাণ্ড রায়ত-এর সঙ্গে স্যর চার্লসের এক ধরণের খটাখটি চলতেই থাকল। কলকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং ইন্সপেকটর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেসন নিয়োগ নিয়ে পত্রিকাটিতে সেবার বেশ কিছু মন্তব্য করা হয়। সেসব মন্তব্য দেখে স্যর চার্লস এক চিঠি লিখে ডাঃ মুখার্জির কাছে জানতে চান, এগুলি কী তাঁর জ্ঞাতসারে ছাপা হয়েছে, নাকি এবারও তিনি অশোভনতার এক অভিযোগ সম্পর্কে গতবার যা বলেছিলেন, তাই বলবেন যে, তাকে না জানিয়েই কে যেন এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

ডাঃ মুখার্জি ছিলেন একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তিনি জানতেন, কোনটা কিভাবে লেখা উচিত। তাই প্রায়ই ছোটলাটের এ ধরণের চিঠি পেয়ে তিনি বলেন, ভারতীয় সাংবাদিকরা তাঁদের দায়িত্বের কথা বেশ ভালভাবেই জানেন। তাই ঘনঘন এ জাতীয় কোন চিঠি লেখার দরকার আছে বলে তিনি মনে করেন না।

ডাঃ মুখার্জি লিখলেন, তাঁর কাগজটা গণমান্য ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলারা পড়েন। এমনকি ইংলণ্ডের সংসদ সদস্যরাও তাঁর লেখা অনুমোদন করেন। তাই ছোটলাটের অভিযোগ তিনি মানতে পারছেন না। ওই চিঠিতে, শোভন এবং অশোভনতার মাপকাঠি সম্পর্কে এমিল জোলা ও সুইনবার্গের অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি স্যর চার্লসকে প্রায় নাজেহাল করে তোলেন।

তিনি লেখেন, স্যর চার্লস গত বছরের যে ঘটনা এবং সে সম্পর্কে তাঁর

( ডাঃ মুখার্জির ) ক্ষমা প্রার্থনার কথা লিখেছেন, সে সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই। আদৌ এধরণের কোন ঘটনা ঘটেনি বলেই তাঁর ধারণা।

এর উত্তরে একটি 'ফরোয়ার্ডিং লেটার' সমেত রেইজ অ্যান্ড রায়তের কিছু পুরনো সংবাদের অংশ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ডাঃ মুখার্জির সেই পুরনো উত্তর সম্পর্কে আর কিছু পাঠানো হয় না। বরং এক হুঁশিয়ারিতে বলা হয়, ভবিষ্যতে এধরণের খবর ছাপা হলে, ছোটলাটকে যেসব কাগজ দেওয়া হয় তার তালিকা থেকে রেইজ অ্যান্ড রায়তের নামটি কেটে দেবেন।

কাগজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিতেও কিন্তু মাথা নত করলেন না শম্ভুচরণ মুখার্জি। বরং আবার তিনি অশোভন ( indecent ) এবং বিরক্তিজনক ( disgusting ) শব্দ দুটির পার্থক্য নিয়ে আরেক প্রস্থ লেখা ছাপলেন। বললেন, স্যর চার্লস এব্যাপারে সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছেন যেহেতু কোন প্রতিবাদ পাঠানো হয়নি, তাই তার কোন উত্তরও নেই।

রেইজ অ্যান্ড রায়ত—এর সঙ্গে সরকারের এই চিঠি চালাচালির মধ্য দিয়ে কিন্তু একই সঙ্গে কলকাতার কাগজের শক্তি ও বলিষ্ঠতা এবং সরকারের ত্রুটি ও দুর্বলতার ছবিটি পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশের মুখে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাকট, ইলবার্ট বিল, সহবাস সম্মতি আইন এবং সরকারি গোপনীয়তা আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার সংবাদপত্রগুলি যে সংগ্রামী ভূমিকা নেয়, তাতে সূর্য ওঠার আগের আকাশের কথাই বারবার মনে হয়। পরাধীনতার নিগড় যখন দৃঢ় হয়ে চেপে বসেছে, তখনই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় কলকাতা তথা সারা ভারতের সংবাদপত্র এক সংগ্রামী চেতনায় মুখর হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদের ভাষা প্রতিমুহূর্তে হয়েছে তীব্র। বাণিজ্য নয়, দেশের মানুষের কথা তুলে ধরাটাকেই তখন জীবনের ব্রত করে নিয়েছিল কলকাতার কাগজ। তখন তাদের 'শৃংখল' ছাড়া আর কিছু হারাবার ভয় ছিল না। ছিল না বলেই সরকারের রক্তচক্ষু কলকাতার কাগজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে পারেনি বরং প্রতি মুহূর্তে জুগিয়েছে এক অপূর্ব প্রাণশক্তি। সেই প্রাণশক্তিতে মুখর হয়েই কলকাতার কাগজ প্রহর গুনেছে মুক্তিসূর্য উদয়ের।

প্রতিটি ক্রিয়ার ঘটে সমান প্রতিক্রিয়া। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রতিটি সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে প্রতিরোধের এবং নতুন সৃষ্টির অদম্য বাসনা। এটাও বাস্তব সত্য। কলকাতা তথা ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই সত্যের প্রতিফলন ঘটেছে স্বাভাবিক ভাবেই। অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষপাদ থেকে এদেশে সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু। শুরুর মুহূর্ত থেকেই এক ধরণের সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হয় সে সংবাদপত্রকে। জন্মলগ্নেই রয়েছে যার সংঘর্ষের কঠিন গ্রহ—বাকিটা জীবন যে তার এগোবে সংঘর্ষের পথে তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। ওই অর্থে সংঘর্ষ সংবাদপত্রের স্বাভাবিক প্রাণশক্তি।

সংঘর্ষ সংবাদপত্রের প্রাণশক্তি হলেও তার রূপভেদ রয়েছে। অষ্টাদশ শতকে হিকি থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতকে সিল্ক বাকিংহাম পর্যন্ত সাংবাদিকদের সঙ্গে সরকারের যে সংঘর্ষ তার পিছনে রয়েছে ব্যক্তিগত স্বার্থ-রক্ষার প্রয়াস। বলা যেতে পারে সে সংঘর্ষের সঙ্গে পরোক্ষভাবে বৃহত্তর সমাজের স্বার্থ জড়িয়ে পড়লেও আসলে সেটা ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ এবং ব্যক্তির বাণিজ্যিক তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কিন্তু মূলত রামমোহনের সময় থেকে এদেশের মানুষ যখন নিজেরাই সংবাদপত্র পরিচালনায় এগিয়ে এলেন তখন থেকেই শুরু হ'ল সত্যিকারের শ্রেণীসংগ্রাম। শাসক এবং শাসিত, শোষক এবং শোষিতের সে লড়াইয়ে কলকাতার সংবাদপত্রগুলি যদি আত্মসমর্পণ করত, যদি আপোস রফার পথ ধরে ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির পথ ধরত তাহলে পরবর্তীকালের সংবাদপত্র যেমন এক নির্ভীক সংগ্রামী চরিত্র পেত না—তেমনই দেশের মুক্তিসংগ্রামের পথ হত আরো বন্ধুর। সম্ভবত সে সংগ্রাম শুরুর মুহূর্তটিও হত বিলম্বিত। সে সময়ের সংবাদপত্রের সংগ্রামী ভূমিকাই জাতিকে বিস্মরণের আঁধার থেকে

নিয়ে এসেছে সত্যের উজ্জ্বল আলোয়—উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে আত্মবোধে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর সমালোচনায় চন্দ্রনাথ বসু যে কথা বলেছিলেন, সে কথাটিই আবার নতুন করে স্মরণ করতে হয়। সংবাদপত্রের ভূমিকা, তার ভাষার বলিষ্ঠতার উল্লেখ করে শ্রীবসু বলেছেন, "তাঁর ফলেই আত্মবিস্মৃত জাতি নিজেকে দেখতে শেখে, জানতে শেখে, আত্মপরিণতির পথ দেখতে পায়। তারই ফলে মোহাভিভূতরা, সম্মোহিতরা ক্ষুদ্রত্ব বর্জন করে মনুষ্যত্ব অর্জনে মনোনিবেশ করে।"

আসলে উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্র পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শুধু একটি ঐতিহ্যই রেখে যায়নি, শক্তমাটিতে দাঁড়িয়ে দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে সরকারের সঙ্গে লড়াইয়ের মানসিকতাটাও তৈরি করে দিয়ে যায়। আরো একটু এগিয়ে বলা যায়, উনবিংশ শতকের সংবাদপত্রের সদা তৎপর, প্রতিবাদী এবং বিদেশী শাসক শক্তির বিরোধিতা করার মানসিকতাই দেশের মুক্তিসূর্য উদয়ের মুহূর্তকে করেছিল ত্বরান্বিত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে রামমোহনের নেতৃত্বে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়েই নানা সামাজিক কুসংস্কার এবং অন্যায় দূর করার সংগ্রাম শুরু করে। সে সময় সরকারের কোন কোন নীতির প্রতিবাদ করলেও বৃটিশের শাসন মুক্ত হবার ভাবনা তেমন দানা বাঁধেনি। কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি মহাবিদ্রোহ দমনের সময় শাসকদের যে মূর্তির পরিচয় শাসিতরা পেয়েছিল, নীল বিদ্রোহের সময় নীলকরদের যে ধরণের অত্যাচার এবং নির্যাতনের মুখোমুখি মানুষকে হতে হয়েছিল এবং ইলবার্ট বিল নিয়ে ইউরোপীয়দের আন্দোলনের যে মূর্তি দেখা গেল—তাতে দেশের শিক্ষিত শ্রেণী প্রতিকারের পথ চিন্তা করতে থাকলেন-বৃটিশ শাসন সম্পর্কিত মনোভাবেও দেখা গেল দ্বিধা। বৃটিশ শাসনে দেশের যে মঙ্গল হতে পারে না—এই বোধটা ক্রমেই হতে থাকল দৃঢ়। ফলে শিক্ষিত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী সমাজের মননলোকে চলতে থাকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া। তাঁরা খুঁজতে থাকলেন একটি মঞ্চ যেখান থেকে সমবেত প্রতিবাদের আওয়াজ তোলা যাবে। মননজগতের সেই ক্রিয়া থেকেই জন্ম নিল কংগ্রেস।

একথা সত্য, কোন দেশীয় ব্যক্তির মস্তিষ্কে কংগ্রেসের জন্ম হয়নি—এর পরিকল্পকের নাম অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শের প্রভাবে সঞ্জাত এদেশীয়দের বর্ধমান উত্তেজনাকে একটা প্রকাশ্য এবং সাংবিধানিক পথে প্রবাহিত করার জন্যই সিভিল সার্ভিসের দক্ষ কর্মচারী হিউম কংগ্রেসের মত একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁর সেই ভাবনার সঙ্গে একমত হলেন স্টেটসম্যান পত্রিকার রবার্ট নাইট, স্যর উইলিয়াম ওয়েডারবার্ন প্রমুখ। তাঁরা সেদিন হিউমের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয়রাও পেল প্রতিবাদ জানাবার মঞ্চ, আকৃষ্ট হল কংগ্রেসের দিকে। তখনকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অনেকেই সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই সংবাদপত্র এবং কংগ্রেসের মধ্যে গড়ে উঠল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু দ্বিধাও দেখা গেল। মহারাষ্ট্রের কেশরী পত্রিকার সম্পাদক বালগঙ্গাধর টিলকের নেতৃত্বে একটি শ্রেণী মনে করলেন বিদেশী শাসক এবং সাংবাদিকরা যে সংগঠন গড়ে তুলেছে তা কখনই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠবে না। তবে অবস্থার গতিতে এঁরা-ও কংগ্রেসের সঙ্গেই যুক্ত হলেন।

হিউম কিন্তু প্রথমে কংগ্রেসকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি। তিনি সামাজিক স্তরেই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। কিন্তু লর্ড ডাফরিন তাঁকে বলেন, জাতির রাজনৈতিক মত প্রকাশ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠান না থাকলে শাসকের পক্ষে শাসিতের আকাঙ্ক্ষার কথা জানা শক্ত। ফলে শাসক এবং শাসিতের ব্যবধানটা বেড়ে যায়। ব্যবধান বাড়লেই ভুলবোঝাবুঝির সম্ভাবনা বেশি। তাই শাসনের সুবিধার জন্যই শাসিতদের একটি প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার।

ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের মতামত জানার পর হিউম কংগ্রেস গঠনের মূল পরিকল্পনার রদবদল ঘটালেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বললেন,—

**Indirectly this conference will form the germ of a Native Parliament and if properly conducted will constitute in a**

few years an unswerable reply to the assertion that India is still wholly unfit for any form of representative institution.

কংগ্রেসের এই ঘোষণা দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কাছে যথেষ্ট আবেদন নিয়ে এল। কিন্তু টিলক এই ঘোষণার পেছনে যেন অন্য উদ্দেশ্য খুঁজে পেলেন। বৃটিশ শক্তি ভারতীয় সমাজ সংস্কারে যতটা আগ্রহী, ভারতীয় সংবাদপত্রকে স্বাধীনতা দিতে ততটাই কুণ্ঠিত। বৃটিশের এই পরস্পর বিরোধী মনোভাব দেখে, টিলকের ধারণা হয়, ভারতীয়রা রাজনৈতিক দিক থেকে যাতে সচেতন হয়ে উঠতে না পারে তারজন্যই বৃটিশ 'কংগ্রেস' নামের এই সোনার পাথর বাটিটি তৈরি করছে। ভারতবাসীর মনে তারা এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে চায় যে, সামাজিক ব্যবস্থায় ভারতীয়রা পাশ্চাত্যের সভ্যজাতির অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে বলেই তারা রাজনৈতিক অধিকার অর্জন করতে পারবে না। অর্থাৎ মানুষকে যদি তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তার ঐতিহ্য সম্পর্কে তার মনে যদি অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলে তার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আসে না-স্বাধীনতার পথ খোঁজার দিকে তার চিন্তাধারাও তাহলে কাজ করে না। বৃটিশ শাসকরা মানুষের এই প্রবৃত্তির কথা ভালভাবে জানতেন বলেই ভারতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে অশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলার কাজটি করতে থাকলেন নানা সামাজিক কুসংস্কার দূর করার নামে। আর ঠিক এইখানটিতেই ছিল টিলকের মত অনেকের আপত্তি।

এ কারণেই টিলক অথবা বঙ্গবাসী কাগজের সম্পাদক শশধর তর্কচূড়ামনি 'হিন্দুসহবাস সম্মতি' বিলের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। বিলটি সমাজের পক্ষে হিতকর, না অহিতকর তা নিয়ে তাঁরা কোন প্রশ্ন তোলেন নি। তাঁদের সাফ কথা, আমাদের সামাজিক ব্যাপারে বিদেশী বৃটিশ, তোমাকে আমরা মোড়লি করতে দেব না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রের এই নির্ভীকতা, এই প্রাণবন্তাই বিংশ শতকের সংবাদপত্রকে অনুপ্রাণিত করেছে আরো ক্রান্তিকারী ভূমিকা নিতে।

বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন এরই ফলে এগিয়ে চলে সেই পথে—বিদেশী শক্তি যার নাম দিয়েছে সন্ত্রাসবাদ,—কিন্তু প্রকৃত অর্থে যা বিপ্লববাদ ছাড়া আর কিছু নয়। মুক্তি সংগ্রামের সেই রক্ত ঝরানো দিনগুলিতে কলকাতার সংবাদপত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করতেই প্রয়োজন তার প্রেক্ষাপটের এই চিত্রণ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম, সেই কংগ্রেস কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাদের কাজকর্ম সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করার মধ্যেই সীমাবন্ধ রেখেছিল। কিন্তু টিলক—বিপিন পাল—লাজপত রায়-অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির মত চরমপন্থীরা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁদের কণ্ঠে শোনা যায় বিপ্লববাদের কথা। তাঁরা বৃটিশ শাসনকে দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করেন না - বরং মনে করেন অভিশাপ। বৃটিশ শাসনকে উৎখাত করার জন্য হত্যা বা সন্ত্রাসের পথ নিতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। তাঁদের এই চিন্তার প্রভাবেই দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ভাইরা পুনেতে হত্যা করলেন প্লেগ কমিশনার র‍্যান্ড এবং তাঁর অধীনস্থ অফিসার লেঃ আয়ারস্টকে। পরিণামে চাপেকার ভাইদের ফাঁসি হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসবাদ সংযোগের দায়ে এটাই প্রথম শহিদ হবার ঘটনা। এর সূচনা মহারাষ্ট্রে হলেও তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল বাংলাদেশে। অন্য কথায়, মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসমূলক যে বিপ্লববাদের জন্ম তার লালন-পালন এবং বিস্তার ঘটল বাংলাদেশে এবং কিছুটা পাঞ্জাবে। বাংলাদেশের অনেক সংবাদপত্রই তখন প্রকাশ্যে এই বিপ্লবের পক্ষে কথা বলতে শুরু করল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলাদেশ হয়ে উঠল অগ্নিগর্ভ।

বাংলার রূপ তখন বৃটিশ শাসকের কাছে হয়ে উঠল রীতিমত ভীতির কারণ। সরকারের তরফ থেকেও একটা চরম ব্যবস্থা নেওয়ার পটভূমিকা তৈরি হয়ে গেল। সেই পটভূমিকায় একজন জবরদস্ত বড়লাট হিসেবে লর্ড কার্জন ভারতে এলেন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। ভারতের মানসিকতা না বোঝার মত একটা চিন্তাধারা কার্জনের মাথায় জাঁকিয়ে বসেছিল। যে কোন সমালোচনাকেই তিনি দেখতেন শাসনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে। কার্জন ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে ন্যায়বিচার পাওয়ার বোধটা

জাগ্রত করতে কঠোর প্রশাসনের ওপর জোর দিলেন। এক এক করে যেটুকু স্বাধীনতা ভারতীয়রা আদায় করেছিল তাকে খর্ব করার জন্য তিনি সক্রিয় হলেন, সেইসঙ্গে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধে হলেন তৎপর।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে গোখলে বললেন, কার্জনের প্রশাসনকে তুলনা করা যায় মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের সঙ্গে। কার্জন প্রশাসনকে জবরদস্ত করেছেন কিন্তু সাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্র মূল্য দেননি বরং মনে করেছেন তাদের ওপর দমননীতি চালিয়েই তাদের দেশকে চরম সেবা করছেন।

কার্জন তাঁর বড়লাট গিরির প্রথম দফায় কিছু ভাল কাজ করলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গ ভঙ্গর মত অজস্র ভুল করে বৃটিশ ভারতে একধরণের গণচেতনা গড়ার হেতু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। তাঁর কঠিন শাসন বাংলাদেশে বিপ্লববাদের প্রসারকে করল ত্বরান্বিত। যুগান্তর, নিউইণ্ডিয়া, বন্দেমাতরম, সন্ধ্যা, বেঙ্গলী, হিতবাদী প্রভৃতি কাগজ রাজরোষের ভয়কে উপেক্ষা করে প্রকাশ্যেই বিপ্লববাদের প্রচার শুরু করে দিল। অন্যদিকে সংবাদপত্রের ওপর সরকারের দমননীতির প্রয়োগ ঘটতে থাকল যথেষ্ট ভাবে। ১৯০০—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটার পর একটা রাজদ্রোহের মামলা দায়ের হতে থাকল কলকাতার সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সারাদেশে বইতে থাকল স্বাদেশিকতার জোয়ার।

সরকারি দমননীতি যখন তীব্র সেই সময়ই কলকাতায় এমন কয়েকটি কাগজের আত্মপ্রকাশ ঘটল যার সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকররা কারাবাস বা সরকারি দমননীতিতে এতটুকু ভীত ছিলেন না। তাঁরা অত্যন্ত চড়া সুরে তাঁদের কথা প্রকাশ করে জনগণের স্বদেশীচেতনাকে জাগ্রত করতে থাকলেন, ওইসব পত্রপত্রিকার মধ্যে বিশেষ করে নাম করতে হয় সন্ধ্যার। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় 'মিসআণ্ডারস্টুড' ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

ব্রহ্মবান্ধব তরুণ বয়সে কেশব সেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। এই সময় তিনি ব্রাহ্ম হন। পরে আবার খৃষ্টধর্মও নেন কিন্তু সবশেষে প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্মেই ফিরে আসেন। প্রচণ্ড আবেগ,

একজাতীয় বিরল তেজস্বিতা এবং দেশাত্মবোধে ভরপুর ব্রহ্মবান্ধবের প্রকৃত নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কাকা হলেন রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে ব্রহ্মবান্ধবের আবির্ভাব জ্বলন্ত ধূমকেতুর মত। 'স্বল্পকালের জন্য দিগন্তকে আলোকিত করে' তিনি জ্বলতে জ্বলতেই শূন্যে বিলীন হয়ে যান। রাজদ্রোহের মামলায় বিচারের সময় তিনি জোর গলায় ঘোষণা করেন, 'ফিরিঙ্গির কোন জেলখানা আমাকে আটক করতে পারবে না', এবং সত্যিই তাই, মামলায় বিচার শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোরালো একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব। সন্ধ্যা পত্রিকায় চলতি কথায় সংবাদ ও নিবন্ধের শিরোনাম দিয়ে তিনি এক নতুন চমক সৃষ্টি করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় সরকার নিয়ন্ত্রিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের ডাক উঠলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলদিঘির গোলামখানা' আখ্যা দিলেন। সেসময় কথাটি এমনভাবে সকলের মনে গেঁথে যায় যে, মুখে মুখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি ওই 'গোলদিঘির গোলামখানা' হয়ে যায়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ব্রহ্মবান্ধব প্রায় একক প্রচেষ্টায় সান্ধ্য দৈনিক 'সন্ধ্যা' প্রকাশ করেন। প্রথম থেকেই সন্ধ্যা ছিল উগ্র রাজনীতির প্রচারক। পত্রিকার অনুষ্ঠান পত্রে ব্রহ্মবান্ধব সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন—

> রাজা ম্লেচ্ছ।... উপজীবিকার জন্য, মানসম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে। রাজার সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। রাজায় প্রজায় কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে রাজনৈতিক কথা সন্ধ্যা পত্রিকায় বিস্তর থাকিবে। কিন্তু সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সবাই বলিব। যাহা শুন—যাহা শিখ যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও। সুখের জন্য সাহেবি ঢং নকল করিলে আসল ভেস্তে যাবে।

এক পয়সা দামের 'সন্ধ্যা' ক্রমেই সাধারণের কাগজ হয়ে উঠল। শিক্ষিত

শ্রেণীর বোধগম্য গুরুগম্ভীর ভাষা ছেড়ে সন্ধ্যা ক্রমেই মেঠো, গ্রাম্য, সহজ, সরল, সরস এবং সবার বোধগম্য ভাষায় লিখতে থাকল।

ইংরেজের শক্তি সামর্থকে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখলেন 'গোদা পা'র ভোঁতা লাথি'। বললেন,

> তমোভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। রজোগুনটা স্বভাবত কিছু কড়া। তাই যাঁহারা নরম প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের ঐ কড়া মেজাজটা ভাল লাগে না। যে আফিম খাইয়া মরিতে বসিয়াছে, তাহাকে না চাবকাইলে তাহার সংজ্ঞা থাকিবে না।... দেশের রোগটা কিছু বিষম হইয়াছে, তাই মকরধ্বজেরও উপরে চাঁট খাওয়াইতে হইবে। দেশে চারিদিকে তমোভাব— অসাড়তা। এখন হাত বুলাইলে চলিবে না।

এই সন্ধ্যা পত্রিকার পাশাপাশি ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১০ মার্চ 'স্বরাজ' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যেন আরো স্বচ্ছভাবে প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় দেখা যায় উপাধ্যায়ের রাষ্ট্রিক চেতনার পরিণত রূপ। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর নতুন রাষ্ট্রদর্শণ বিশ্লেষণ করে ওই পত্রিকায় লিখলেন—

> রাজা ও প্রজার সম্বন্ধে রাজনীতির উদ্ভব। রাজা না থাকিলে রাজনীতি থাকিতে পারে না। আমাদের এখন কোন রাজা নাই। তাই আমাদের রাজনীতিও নাই। কেন, ইংরেজত আমাদের রাজা। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই ইংরেজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। যথাবিধি অভিষিক্ত না হইলে হিন্দুস্থানে কেহ কখনও রাজা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই ·· ইংরেজ যথাবিধি অভিষিক্ত রাজা নহে—রঞ্জন গুণের সমাবেশ উহার হৃদয়ে নাই— হইতেও পারে না। শাসন করিতে-দণ্ড দিতে-কর্মদোষের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেই বিধাতা ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ—বুঝিতে পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত তোমার এই বোধ গভীর হইবে, ঘন হইবে—তত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্তী হইবে। এতদিন আমরা মোহমুগ্ধ ছিলাম—মনে করিতাম ,ইংরেজ আমাদের রাজা আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে তাহারা আসিয়াছে। এখন কিন্তু মোহ ঘুচিয়াছে।

স্বরাজ পত্রিকায় এত খোলাখুলি ভাবে নিজের ভাবনা চিন্তার কথা

প্রকাশ করলেও ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে কিন্তু রাজদ্রোহের মামলা আনা হয় সন্ধ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য। সন্ধ্যায় প্রকাশিত নিবন্ধের শিরোনাম এরজন্য অনেকটা দায়ী বলে অনেকের ধারণা। সন্ধ্যা মামলায় বাংলা সরকারের অনুবাদক নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য সাক্ষ্যদানকালে এজাতীয় অনেকগুলি শিরোনামের উল্লেখ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য 'আমাদের পোয়াবারো, ফিরিঙ্গির তেরো' (৭ আগষ্ট ১৯০৭), 'আজ কালীঘাটে জোড়া পাঁঠা একটা কালো একটা সাদা' (৯ আগষ্ট ১৯০৭) 'ফিরিঙ্গির কৃপায় দাড়ি গজায় শীতকালে খাই শাঁকালু (২১ আগষ্ট ১৯০৭) 'ঢেঁকী অবতার' (৩০ আগষ্ট ১৯০৭), 'গোদা পা'র ভোঁতা লাথি' (৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) 'দুশো মজা তিলাই খাজা' (৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭) ইত্যাদি।

সন্ধ্যা পত্রিকায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৩, ২০ ও ২৩ আগষ্ট প্রকাশিত 'এখন ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে'; 'ছিদিশনের হুড়ুম দুড়ুম ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম' এবং 'বাচচা সকল নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন' প্রবন্ধ তিনটির জন্য ১২৪ক ধারায় রাজদ্রোহের অভিযোগে কিংসফোর্ডের আদালতে সন্ধ্যার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব, ম্যানেজার সারদাচরণ সেন এবং মুদ্রাকর হরিচরণ দাসের বিচার শুরু হয়।

২৩ সেপ্টেম্বর মামলার কাজ শুরুর আগেই উপাধ্যায় এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন,

> I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say I am the writer of the article, Ekhan Theke Gechi Premer Dai which appeared in the Sandhya of the 13th August 1907, being one of the articles forming the subject matter of this prosecution. But I do not want to take any part in this trial because I do not belive that in carrying out any humble share of the God-appointed mission of Swaraj I am in any way accountable to the alien people, who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development.

স্মরণীয় ওই বিবৃতিতে ব্রহ্মবান্ধব সমস্ত দায় নিজের মাথায় নিয়ে মামলায় অংশ না নেবার কথা জানিয়ে বলেন, ঈশ্বর নির্দিষ্ট কর্ম করে বিদেশী এবং শাসক জাতির কাছে কোনরকম জবাবদিহি করতে তিনি বাধ্য নন।

এই মামলা চলার সময়েই ১১ এবং ১৩ সেপ্টেম্বরের দুটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য রাজদ্রোহের দায়ে সন্ধ্যার ম্যানেজার সারদাচরণ সেন এবং মুদ্রাকর হরিচরণ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার তাঁদের জামিনও দেওয়া হয় না। বরং হাজতে অকথ্য অত্যাচার করা হয়। এই প্রথম রাজদ্রোহের মামলায় একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন পেলেন না। সব শুনে হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ব্রহ্মবান্ধব কান্না সামলাতে পারলেন না।

যাইহোক, ব্রহ্মবান্ধবের অসুস্থতার জন্য মামলার শুনানি ১৮ নবেম্বর পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ২৭ অক্টোবর রবিবার সকাল ৯টায় বীর ব্রহ্মবান্ধব ইংরেজ শাসনকে যেন ধিক্কার জানিয়েই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। ইংরেজের কোন কারাগার এই বীরকে ধরে রাখতে পারল না।

ব্রহ্মবান্ধব যখন সন্ধ্যা'র মধ্য দিয়ে জোরালো ভাষায় বৃটিশ শাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখর সে সময় আরো দু'টি পত্রিকাও বৃটিশ শক্তির ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে। এদু'টি পত্রিকার নাম যুগান্তর এবং বন্দেমাতরম্। বিশেষ করে যুগান্তর যেরকম খোলাখুলি এবং গরম ভাষায় বিপ্লববাদ প্রচার করতে থাকে তাতে বৃটিশ সরকার রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কেননা এই পত্রিকাগুলি প্রকাশের আগে থেকেই এর পটভূমি তৈবি হয়ে গেছে। বাংলায় তখন রীতিমত বিপ্লবী গুপ্তসমিতি গড়ে উঠেছে। এই বিপ্লবী গুপ্তসমিতি গড়ে ওঠাকে অবশ্য ত্বরান্বিত করেছে লর্ড কার্জনের শাসন এবং অন্যায় সিদ্ধান্ত।

কার্জন চেয়েছিলেন বাঙালীর শক্তিকে খর্ব করতে, চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল করতে। বাস্তবে কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। বিভেদের মধ্য দিয়েই ঐক্য ও সংহতি হল আরও দৃঢ়। কার্জনের কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাংলা জন্ম দিল এক

নবীন সংগ্রামী নেতৃত্বের। প্রথমে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আন্দোলনের শুরু হলেও অল্পদিনের মধ্যেই সেই আন্দোলন আপন বৈপ্লবিক প্রাণশক্তিতে হয়ে উঠল দুর্বার। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কংগ্রেস নায়করা স্বৈরাচার নিবারণ করতে চাইলেন, এর মূলচ্ছেদ চাইলেন না। তাঁরা বৃটিশের শুভ বুদ্ধি জাগিয়ে নিরপেক্ষ, সৎ, উদার বৃটিশ শাসন চাইলেন, বৃটিশ সরকার উৎখাত করার কথা ভাবতে পারলেন না। বয়কট এবং স্বদেশীকে তাঁরা ক্ষণকালের অস্ত্র হিসেবে নিলেন, সর্বকালের অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারলেন না।

সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাময়িক প্রতিবাদের জন্য যে বয়কট এবং স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুললেন তা কিন্তু অচিরেই সুরেন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে রূপান্তরিত হ'ল। ডঃ ঈশ্বরনাথ টোপা পরিষ্কার ভাষায় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে লিখেছেন,—

> It was for the first time in the history of India that such a movement of protest indignation was launched forth against the Government of the country……
>
> The partition of Bengal quickned the pace of nationalist ideas. It made the people of India more sober, wise, and realastic in their political thinking and activity.

সেই রাজনৈতিক প্রজ্ঞাই আর তুচ্ছ শাসন সংস্কার বা আবেদন নিবেদনের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে জ্বলে উঠতে এবং অন্যকে জ্বালিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করল। জীবন দিয়ে এবং জীবন নিয়ে স্বৈরাচারী শাসন উচ্ছেদের আন্দোলনে রূপান্তরিত হল তা। সৃষ্টি হল বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি শুরু হল নতুন বিপ্লবী আন্দোলন। সেই আন্দোলনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন,

> এই আন্দোলন রাজনীতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তাও নয় রাজনীতি, জাতীয়তা একটা ধর্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা। আমাদের

পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। মানবজাতির মুক্তির জন্য ভারতের সনাতন ধর্মস্থাপন। এই ধর্ম দেবার জন্যই ভারত উঠছে। ভারত নিজে শক্তিমান হয়ে অপরকে দুর্বল করবে না। ভারত চিরদিন মানবজাতির জন্য জীবন ধারণ ও যাপন করছে—নিজের জন্য নয়।

বাংলার বুকে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার অন্যতম রূপকার শ্রীঅরবিন্দ। তিনিই বরোদা থেকে প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা স্বামী নিরালম্ব এবং পরবর্তীকালে বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে পাঠান কলকাতায় গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলার জন্য। এই সমিতি একদিকে যেমন সশস্ত্র আক্রমনের মধ্য দিয়ে দেশের শৃঙ্খল মুক্তির সাধনায় বসল অন্যদিকে তেমনি নবলব্ধ চেতনাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য নতুন ধরণের সংবাদ পত্রের প্রয়োজন অনুভব করল। গুপ্ত সমিতির এই প্রয়োজন বা অনুভব থেকেই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম নিল দুটি সংবাদপত্র 'যুগান্তর' এবং 'বন্দেমাতরম্'। এই দু'টি কাগজই শেষপর্যন্ত বিদেশী শক্তির আক্রমণের লক্ষ্য হয় - কাগজের সম্পাদক এবং প্রকাশক মুদ্রাকরকে কারাবাসও করতে হয়, তবু কোন আপোস তাঁরা করেননি বরং রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতিকে একটি বৈপ্লবিক রূপ দেবার প্রয়োজনীয়তায় 'অ্যাগ্রেসিভ' হয়েছেন।

তখন কলকাতায় যে সব কাগজ ছিল তারা সবাই যে দেশের প্রয়োজনে সে সময় একটা আক্রমনাত্মক ভূমিকা নিয়েছিল তা নয়, তবে ভীরুতার পথ ধরেনি কোন কাগজই। হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, বসুমতী চরমপন্থী না হয়েও যথেষ্ট নির্ভীক ছিল। বেঙ্গলী, অমৃতবাজার নরমপন্থী হয়েও সরকারের কাছে কোন সময়ই নতি স্বীকার করেনি– কোন সময়ই সমর্থন জানায়নি সরকারের স্বৈরাচারকে বরং প্রতিদিনই মনে করিয়ে দিত, সরকারের অক্ষম শাসনই দেশের দুর্বার প্রাণশক্তি জাগিয়ে তুলেছে।

এদের মধ্যে সন্ধ্যা যে বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়েছিল তার বিশ্লেষণ তো ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার চেয়েও জোরালো আর খোলাখুলি ভাষায় বিপ্লবের কথা প্রচারের জন্যই প্রকাশ করা হল যুগান্তর। বাংলায়

যুগান্তরের মত জোরালো ভাষায় আর কেউ সরকারের বিরোধিতায় নামেনি। বলা যায় যুগান্তরই প্রথম খোলাখুলিভাবে এদেশে বিপ্লবের কথা প্রচার করে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রথম যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন। যুগান্তরের প্রচ্ছদপটে থাকত খড়্গ সমেত মা কালীর একটি হাত। এটিকেই যুগান্তরের ট্রেড মার্ক বলা চলে। এছাড়া প্রচ্ছদপটে দু'খানা আড়াআড়ি তলোয়ারের ওপর একখানা ঢাল ছিল। যুগান্তরের চারমাস পরে ৭ আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্'। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—এই চারজনকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল বন্দেমাতরমের সম্পাদকমণ্ডলী। প্রধান সম্পাদক হন বিপিনচন্দ্র পাল। কিন্তু কিছুদিন বাদে মনান্তরের ফলে বিপিনচন্দ্র বন্দেমাতরম্ ছেড়ে চলে যান। অরবিন্দও এরপরে অসুস্থ হয়ে পড়ায় - বাকি দুজনই কার্যত বন্দেমাতরম্ চালাতে থাকেন। আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ধরা পড়লে বিপিনচন্দ্র আবার বন্দেমাতরমে যোগ দেন এবং এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাগজের সঙ্গে ছিলেন।

যুগান্তর প্রকাশের দিন থেকে এর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল না হওয়া পর্যন্ত (জুলাই) এক বছর পাঁচ মাস এবং পরে আগষ্ট মাস পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে খোলাখুলিভাবে বিপ্লববাদের প্রচার করে। জুলাই মাস পর্যন্ত সরকার এ পত্রিকার ওপর ওই অর্থে কোন ব্যবস্থাই নেয় না। কিন্তু জুলাই মাসে দুটি রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পত্রিকাটির প্রেস তল্লাসি চালিয়ে বহু জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হয় এবং ২৪ জুলাই তারিখে পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৭ জুলাই তাঁকে এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভূপেন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধ দু'টির লেখক না হয়েও হাসি মুখেই কারাবরণ করেন।

সেই যুগান্তর পত্রিকার কোন সংখ্যাই এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু সরকারি নথিপত্রে যুগান্তর সম্পর্কে যে সব মন্তব্য রয়েছে তা থেকে পত্রিকাটির চরিত্র অনায়াসে অনুমান করা যায়। আলিপুর বোমার মামলার

সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মন্তব্য করেন, বন্দেমাতরম্ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা স্বাধীনতা লাভের নীতিতে বিশ্বাসী কিন্তু যুগান্তর সেই মতকে রীতিমত উপহাস করে। যুগান্তরের পথ রীতিমত উগ্রপথ।

যুগান্তর যে উগ্রমতের পরিপোষক ছিল তা রাউলাট কমিটির বিবরণ থেকেও জানা যায়। কমিটির রিপোর্ট, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যুগান্তর প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭ হাজার। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নতুন প্রেস আইনের কবলে পড়ে পত্রিকাটি উঠে যায়।

রাউলাট কমিটির রিপোর্টে যুগান্তরের তিনটি সংখ্যার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১১ এপ্রিল বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। রাউলাট কমিটির রিপোর্টে ইংরেজি তর্জমায় তার নাম দেওয়া হয় 'Welcome Unrest'। এখানে Unrest কথাটির অর্থ করা হয়েছে Revolt বা বিপ্লব। প্রবন্ধে বলা হয়, "Unrest must be created, welcome therefore Unrest, 'whose historical name is Revolt'."

১২ আগষ্টের সংখ্যায় সেনাবাহিনী থেকে দেশীয় সৈন্য ভাগাবার জন্য সচেষ্ট হতে বলা হয়। এরপর পরেই ২৬ আগষ্ট ছদ্মনামে প্রকাশ করা হয় পাগলের চিঠি, রাউলাট কমিটির রিপোর্টে ওই চিঠির ইংরেজি অনুবাদে লেখা হয়,—

> News of loots is reaching me from all quarters and I am dreaming as it the future guerilla bands were loot;ng money and as it the future war had commenced in the shape of Petty dacoities ( gangrobberies )…o Plunder ! I worship you to-day.

যুগান্তর পত্রিকায় মে মাসের ৫ তারিখে লেখা হল, 'You Englishmen have demoralised educated Indians as lambo and in East Bengal you have set Muslims against the Hindus'.

৫ মে তারিখে যুগান্তরে প্রকাশিত ওই প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ছাপা হয়। মহাত্মা গান্ধী একবার ইংরেজ সরকারকে শয়তানের সরকার বা Satanic Government বলেছিলেন। কিন্তু তারও দীর্ঘদিন আগে যুগান্তর বৃটিশ সরকারকে 'অসুর' বলে অভিহিত করে ওই ৫ মে'র প্রবন্ধে। সে প্রবন্ধের ইংরেজি অনুবাদের মধ্যেই যে ধরণের জোরালো ভাব দেখা যায় তা থেকে অনুমান করা যায় মূল প্রবন্ধটি কতটা উত্তেজক ছিল। ২৬ জুলাই বন্দেমাতরমে প্রকাশিত অনুবাদটি এইরকম—

> What do you want? You Englishmen are not a man, you are a demon. You are an asura, otherwhise our Surendranath would not have talked all these nonsense to your representative near the battlefield of Jamalpur.

এর আগে ৭ এপ্রিলের প্রবন্ধেও যুগান্তর বলে, প্রত্যেক দেশেই বিপ্লবের আগে তিনটি দল দেখা যায়। যেমন, (১) দেশদ্রোহী বিভীষণ, (২) নরমপন্থী রাজভক্ত মডারেট এবং (৩) বেপরোয়া বিপ্লববাদী। এখন বাংলাদেশেও সে ধরণের অবস্থাই দেখা দিয়েছে, অতএব সাবধান।

এতদিন চুপচাপ থাকলে বৃটিশ সরকার এবার আর চুপচাপ থাকল না। ৭ এপ্রিলের ওই প্রবন্ধ এবং ৫ মে তারিখের প্রবন্ধটিকে রাজদ্রোহমূলক বলে চিহ্নিত করে ৩ জুলাই যুগান্তর অফিসে খানাতল্লাসি চালায়। ভূপেন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র জামালপুরের হাঙ্গামার তদন্ত করে অফিসে এসে বসেছেন। তাঁকেই তখন যুগান্তরের সম্পাদক মনোনীত করা হল এবং ভূপেন্দ্রনাথও তা মেনে নিলেন। সম্পাদক হিসেবে ৫ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হলেন। ২২ জুলাই তাঁর বিচার আরম্ভ হল এবং ২৪ জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হল।

যুগান্তরের মাত্র ৪ মাস পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট বন্দেমাতরমের আবির্ভাব। সুরেও বন্দেমাতরম্ যুগান্তরের চেয়ে অনেক নরম। আলিপুর বোমার মামলার সময় চিত্তরঞ্জন দাশ যুগান্তর এবং

বন্দেমাতরমের তুলনা করে দেখিয়েছেন স্পষ্টতই বন্দেমাতরম্ যুগান্তর থেকে একেবারে ভিন্ন। যুগান্তরে তল্লাসির পর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ আগষ্ট বন্দেমাতরম্‌ও লেখে—'বয়কট দ্বারা আমরা কাহাকেও (ইংরেজ জাতিকে) ঘৃণা করিতেছি না, আমরা শুধু আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক জাতিয়ত্ব ঘোষণা করিতেছি মাত্র'। যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের পরও বন্দেমাতরম্ জোরালো ভাষায় কিছু বলেনি। তা সত্ত্বেও ৩০ জুলাই পুলিশ বন্দেমাতরম্ অফিসে তল্লাসি চালায়। পুলিশ সেদিন কতকগুলি বাজে কাগজ নিয়ে চলে যায়।

এ ঘটনার পরও বন্দেমাতরম্ কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। অবশ্যই সেটি কৌশল, কেননা সরকার তখন নির্বাসন নীতির পর সংবাদপত্র দমননীতি গ্রহণ করেছে। তাই বন্দেমাতরম্ চুপচাপ থাকল, তবু শেষরক্ষা হল না। ১৬ আগষ্ট অরবিন্দের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বের হল। অভিযোগ, ২৭ জুন বন্দেমাতরমে 'India for the Indians' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধটি রাজদ্রোহমূলক এবং যেসব প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যুগান্তর সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৮ জুলাই সেই প্রবন্ধগুলিরই ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে বন্দেমাতরম্ আইন ভঙ্গ করেছে। বলা হল অরবিন্দই বন্দেমাতরম্ কাগজের সম্পাদক তাই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ১৬ আগষ্ট তারিখেই অরবিন্দ আত্মসমর্পণ করে জামিনে মুক্ত হলেন। এরপর মামলা শুরু হল। কিন্তু ২৩ সেপ্টেম্বর প্রমাণের অভাবে আদালত অরবিন্দকে মুক্তি দিলেন।

কিন্তু সংবাদপত্রে ক্রমাগত রাজদ্রোহমূলক উত্তেজক প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও প্রচলিত আইনে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না দেখে ইংরেজ সরকার ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জারি করল নিউজ পেপার (ইনসাইটমেন্ট টু অফেন্স) আইন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যাতে উত্তেজনা বা সন্ত্রাস ছড়িয়ে না পড়ে তারজন্যই ওই আইন। ওই আইনে বলা হল, স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের আবেদনক্রমে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যদি দেখেন সংশ্লিষ্ট ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা হত্যা বা হিংসাত্মক

ঘটনা ঘটাতে প্ররোচিত করছে অথবা বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী অপরাধ করছে তবে তিনি ওই ছাপাখানা শর্তাধীনে বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। জরুরি অবস্থায় একতরফাভাবে অথবা শর্তাধীন নির্দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনে ম্যাজিস্ট্রেট ওই শর্তাধীন নির্দেশকে শর্তহীনভাবেই জারি করতে পারবেন। সমনের বলে পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর ম্যাজিস্ট্রেটের ওই নির্দেশকে কার্যকর করবেন এবং নির্দেশটি নিঃশর্ত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হাইকোর্টে আপিল করতে পারেন। এই আইনে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্য আইনের শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাবেন না এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ প্রকাশক মুদ্রাকরের ডিক্লারেশন বা ঘোষণাপত্রকে রদ করতে পারবেন এবং ওই সংবাদপত্রের অথবা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত কোন সংবাদপত্রের জন্য ডিক্লারেশন নাও দিতে পারেন।

নতুন এই আইনে বন্দেমাতরম্‌, যুগান্তরের প্রেস বাজেয়াপ্ত হ'ল। মামলা হল অরবিন্দ ঘোষ (বন্দেমাতরম্‌), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (সন্ধ্যা), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যুগান্তর) প্রভৃতির বিরুদ্ধে, নির্বাসনে পাঠান হ'ল কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পুলিনবিহারী দাস, মনোরঞ্জন গুহ এবং ভূপেশচন্দ্র নাগ—এই ন'জন সাংবাদিক সম্পাদককে। বিপিনচন্দ্র পালের হ'ল ছমাস কারাদণ্ড, বন্দেমাতরমের মুদ্রাকরের হ'ল জেল।

এত করেও সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের রাগ এতটুকু কমল না। সংবাদপত্রকে আরো ভালভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে জারি হ'ল ভারতীয় সংবাদপত্র আইন বা ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাকট। এ আইনে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে যে কোন সংবাদপত্রের প্রেস বাজেয়াপ্ত করা, ডিক্লারেশন বাতিল করার ব্যাপক ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হল। এ সমস্ত আইন কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসারদের ওপর এবং তারা এই সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ অত্যাচার শুরু করল। সব মিলিয়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর থেকে শুধু কলকাতায় কেন সারা দেশের সংবাদপত্রের ওপর নেমে আসতে থাকল একটার পর একটা আঘাত। কিন্তু সরকারের সেসব আঘাতের কাছে নতি স্বীকার না করে কলকাতার সংবাদপত্র মুক্তির স্বপ্নে মাথা উঁচু করেই কাজ করে যেতে থাকল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবেশ কিছুটা হঠাৎ-ই, কিন্তু সে প্রবেশ যেন বড় চুপিচুপি—কিছুটা বা ধীর পায়। সে প্রবেশের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা তখনই ঠিক বোঝা যায়নি। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও গান্ধীজির প্রবেশ—তাৎক্ষণিক কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কী রাজনীতি, কী সাংবাদিকতা এই দুই ক্ষেত্রেও গান্ধীজি আনলেন এক নতুন জোয়ার।

গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় দীর্ঘ সত্যাগ্রহ চালিয়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তারই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকাশ করলেন ইয়ং ইন্ডিয়া এবং হরিজন। স্পষ্ট, সোজা সরল এবং জোরালো ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন, "সংবাদপত্রের প্রথম লক্ষ্য হ'ল, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুধাবন করে তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য, জনগণের মধ্যে কিছু বাঞ্ছিত উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা এবং তৃতীয় লক্ষ্য, নির্ভয়ে জনতার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির প্রকাশ ঘটানো।"

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় আরো স্পষ্ট ভাষায় তিনি বললেন, "দমন বা নির্যাতনের মধ্যে কাগজ বের করার চেয়ে বরং না করাই ভাল। ওইসঙ্গে কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করেই জনগণ কংগ্রেসকে সমর্থন করুক এটাও আমি চাই না।" তিনি লিখলেন,

> The national cause will never suffer by honest criticism of national instutions and national policics. The danger to be gurded against is the inflamis of communal passions.

গান্ধীজি একইসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন নেওয়ার বিরোধী আবার সে পত্রিকাকে স্বনির্ভর করার নীতিতেও বিশ্বাসী। তাঁর সেই নীতি

এবং বিশ্বাসের প্রতিফলন যে শুধু তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' বা 'হরিজন' পত্রিকায় দেখা দিল তা নয়, সে প্রতিফলন ঘটল অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও। গান্ধীজির নীতি এবং আদর্শ কলকাতার পত্র-পত্রিকাকেও দেখাল চলার নতুন এক পথ।

শুধু গান্ধীজির আবির্ভাব নয়, ১৯১০ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পরপর এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটল যার মধ্য দিয়ে তৈরি হল সাংবাদিকতার নতুন ইতিহাস। প্রেস অ্যাকটের দমন যখন সক্রিয় সেই সময়ই অর্থাৎ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতে বৃটিশ মালিকানার সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে স্ট্যানলি রিড যোগ দিলেন। রিডের জোরালো যুক্তির কাছে হার মেনেই তারবার্ত্তায় সংবাদ প্রেরণের খরচ অসম্ভব রকম কমিয়ে দেওয়া হল। ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন সংশোধনের মধ্য দিয়ে সংবাদ সরবরাহ সংস্থার উদ্ভব ও প্রসার ঘটল। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের শেষে চেমসফোর্ডের ব্যক্তিগত অনুরোধে রিড ভারত সরকারের পক্ষে প্রচার শুরু করলেন এবং ভারতীয় সম্পাদকদেরও ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ জানানো হতে থাকল। আর এসবের মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কিছুটা ঘনিষ্ঠ হতে থাকল।

অথচ এর আগে বিশেষ করে লর্ড কার্জনের আমলে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কটা সবসময়ই ছিল রণং দেহিং গোছের। সেসময় অমৃতবাজার পত্রিকার প্রভাব জনমানসে ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেও হত্যা বা সন্ত্রাসে উস্কানি দেয় এমন বিষয় সযত্নে পরিহার করে ইণ্ডিয়ান প্রেস অ্যাকটকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন। লর্ড কার্জনের যে তীব্র সমালোচনা তিনি করতেন তা সহ্য করা ছিল দুষ্কর অথচ তারজন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া ছিল আরও দুঃসাধ্য।

এই সংঘাতপর্বে অমৃতবাজারে কার্জনের সত্যবাদিতা নিয়ে মতিলাল যে জবাব দিয়েছিলেন তা শুধু কলকাতা নয়, ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাসে সম্পদ হয়ে আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে কার্জন বলেন, প্রাচ্যের মানুষ সত্য কথা বলতে শিখেছে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে। আগে তাদের চরিত্রে সত্যবাদিতা বলে কিছু ছিল না। কার্জনের এই মন্তব্যে প্রতিটি ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু মতিলাল কোন মন্তব্য না করে কার্জনেরই "প্রবলেমস অব দি ইস্ট" বই থেকে তাঁরই লেখা কিছু বক্তব্য প্রকাশ করেন অমৃতবাজারে এবং বলা যায় তাতেই কার্জনের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যায়। লজ্জায় আর কিছু বলতে পারেন না তিনি। কার্জন তাঁর বইতে লিখেছিলেন, প্রাচ্যে বয়স্কদের বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় বলে তিনি কোরিয়ার বিদেশ দপ্তরেব প্রেসিডেণ্টকে তাঁর বয়স বলেন ৪০। অথচ সে সময় তাঁর প্রকৃত বয়স ৩৩। এরপরে বিদেশ দপ্তরের প্রেসিডেণ্ট তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কী ইংলণ্ডের রানীর নিকট আত্মীয়? কার্জন এবারও খুব একটা সত্যি কথা বলেন না। প্রথমে অবশ্য তিনি না-ই বলেছিলেন, কিন্তু প্রেসিডেণ্টের মুখের ভাব দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, অবশ্য এখনও আমার বিয়েটা হয়নি। ওই একটি কথাতেই বৃদ্ধ মানুষটির আস্থা ফিরে পান। কার্জন তাঁর বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে প্রসঙ্গটি বাদ দেন কিন্তু মতিলাল প্রথম সংস্করণ জোগাড় করে তার থেকেই কার্জনের মত পাশ্চাত্যের মানুষের সত্যবাদিতার নমুনা দেখান।

সে সময় যে ক'জন সম্পাদককে নির্বাসনে পাঠাবার তালিকা করা হয় তাতে মতিলালের নামও উঠেছিল। কিন্তু সরকারি অফিসারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক থাকায় মতিলাল রেহাই পেয়ে যান। নির্বাসন থেকে বাঁচলেও ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে জগৎশ্রী আশ্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার কাছ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রেস আইন অনুযায়ী ৫ হাজার টাকা জামিনজমা দাবি করা হয়। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবেদন নিয়েও অমৃতবাজারকে আদালত অবমাননার মামলায় পড়তে হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে কাগজটি ছাড়া পেলে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বিল আনা হয় এবং সেই বিল অনুযায়ী প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকের নাম

ছাপা বাধ্যতামূলক করা হয়। তবে মহাযুদ্ধের জন্যই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারাটি প্রয়োগ স্থগিত থাকে।

যাইহোক, গান্ধীজির আদর্শ প্রচারের জন্যই শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'সার্ভেণ্ট' প্রকাশ করেন। আইনসভায় যোগদানের বিরোধীদের পক্ষ নেয় এ কাগজ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধু আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে প্রচারের জন্য 'ফরোয়ার্ড' প্রকাশ করলে সার্ভেণ্টের প্রচার সংখ্যায় ভাঁটা পড়ে। সার্ভেণ্ট কাগজ চালানোর সময়ই ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ৬ মাস কারাবাস বরণ করেন। ফরোয়ার্ডের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হয় 'বাংলার কথা' এবং 'আত্মশক্তি'।

১৯২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ ভারতীয় পরিচালিত বিভিন্ন ইংরেজি কাগজ দেশীয় ভাষাতেও পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকে। এই ধারাতেই 'বেঙ্গলীর' সহযোগী হিসেবে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নায়ক'। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সম্পাদনায় দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক বসুমতী, প্রকাশিত হয় বসুমতী'র ইংরেজি সংস্করণ। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 'নবশক্তি' কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' প্রভৃতি কলকাতার নির্ভীক সাংবাদিকতার ধারাটিকে পুষ্ট করতে থাকে। সেইসঙ্গে নবশক্তি, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কাগজ বারেবারেই সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে এবং কয়েকটি কাগজ প্রকাশ বন্ধ করতেও বাধ্য হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বৃটিশ সরকার সংবাদ জগতের ওপর অত্যাচারের যে রথ চালিয়েছিল তার মোটামুটি একটা হিসেব পাওয়া যায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রেস অ্যাসোসিয়েসন অব ইণ্ডিয়ার পেশ করা একটি স্মারকলিপি থেকে।

ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়, প্রেস অ্যাকট চালু হবার আগে থেকেই যেসব কাগজ চালু ছিল এবং যাদের বিরুদ্ধে প্রেস অ্যাকট অনুযায়ী কোন না কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার সংখ্যা ৯৯১। অন্য কথায় বলা যায়

ওই আইনের বলি হয় প্রায় হাজার কাগজ এবং ছাপাখানা। এরমধ্যে ২৮৬টির ক্ষেত্রে দেওয়া হয় হুঁশিয়ারি, অনেকগুলি তো তাদের প্রচার চিরতরে বন্ধ করে দিতেই বাধ্য হয়। বাকি ৭০৫টির কাছে মোটা রকম জামিনজমা চাওয়া হয় এবং সরকার যখনই কোন সংবাদকে আপত্তিকর মনে করেছে তখনই প্রশাসনিক আদেশ বলে তাদের বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়া এই আইন জারির পরে চালু আরো ৭০টি পত্রিকার কাছ থেকে জামিনজমা চাওয়া হয়েছে এবং তাদের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

সরকারি চাহিদামত জামানত দিতে না পারায় ১৭৩টি নতুন ছাপাখানা এবং ১২৯টি কাগজ জন্মলগ্নেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া প্রেস আইন প্রবর্তনের ফলে আরো যে কত ছাপাখানা এবং খবরের কাগজ ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি তার লেখাজোখা নেই। এই আইনে পুরনো কাগজগুলিরই ক্ষতি হয়েছে বেশি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২২টি কাগজের মধ্যে ১৮টি কাগজই তাদের প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। এদের কাছে জামিনজমা চাইবার পরই এরা কাগজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে শুধু যে জামিনজমার জন্য কাগজ বন্ধ হয়েছে তা নয়, সরকারি কর্তারা যেভাবে এসব কাগজের ওপর অত্যাচার চালিয়েছে এবং নিজেদের খেয়ালখুশিমত এদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে তাতে যে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষেই ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। একইভাবে ৮৮টি পুরনো ছাপাখানা ও তাদের কারবার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এসব ছাপাখানা সাধারণভাবে ছাপার ব্যবসাই করত কিন্তু ওখানে ছাপানো কিছু কাগজপত্র সম্পর্কে সরকারি আপত্তির জের হিসেবেই এগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ৪০টি ছাপাখানা বন্ধ হয়ে যায় অতিরিক্ত জামানত চাওয়ার জন্য।

প্রেস আইন চালু হওয়ার পর প্রথম পাঁচ বছরে সরকার জামানত এবং প্রেস বাজেয়াপ্ত করে ৫ লক্ষ টাকার মত আয় করেছে। বছরের পর বছর সরকারি অত্যাচার এবং নির্যাতনের ফলে এই খাতে সরকারি তোষাখানায়

জমার পরিমাণ প্রতি বছরেই বেড়ে যায়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের এক সরকারি হিসেব, প্রেস আইনে ৫০০টি প্রকাশন বেআইনি ঘোষিত হয়েছে।

ভারতরক্ষা আইন শুধু যে যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়, সবরকম রাজনৈতিক আন্দোলন এবং কার্যকলাপ বন্ধেও এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। এই আইনকে হাতে পেয়ে প্রশাসন প্রকৃত যুদ্ধ পরিস্থিতি বা প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও সুযোগ পেলেই এই আইন প্রয়োগ করেছে। যে কোন ক্ষেত্রেই তারা 'জননিরাপত্তার' ধুয়া তুলে আইনটি প্রয়োগ করেছে। যুদ্ধের সময় পোস্ট অফিস অ্যাকট, রাজবন্দি আইন ইত্যাদিরও যখন তখনই অপব্যবহার করা হয়েছে। সংবাদপত্র এবং ছাপাখানাকে দমন করার জন্য সরকার ভারতরক্ষা আইনে এমন নির্দেশও জারি করেছে যা যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেওয়া নির্দেশকেও যেন ছাড়িয়ে গেছে।

প্রেস অ্যাসোসিয়েসনের ওই স্মারকলিপি থেকে সরকারি অত্যাচারে জর্জরিত সংবাদপত্রের অবস্থাটা মোটামুটিভাবে আন্দাজ করা যায় বেশ সহজেই। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে কার্যকর হয় মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার ব্যবস্থা। ওই ব্যবস্থা অনুযায়ীই আইনবিষয়ক সদস্য হিসেবে তেজবাহাদুর সপ্রু ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁরই নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রেস অ্যাকট রদ বা সংশোধনের ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখার জন্যই ওই কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ীই ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্র (অপরাধে প্ররোচনা) আইন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রেস আইনটি রদ করা হয়।

তবে লবণ সত্যাগ্রহের সময় রদ হওয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দের প্রেস আইনের কিছু ধারা নিয়েই আবার একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। সেই অর্ডিন্যান্স আরো একবার কলকাতা তথা ভারতীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে বিভীষিকা হয়েই নেমে আসে। সেই অর্ডিন্যান্সের মুখে অনেকগুলি কাগজকেই আত্মবিলুপ্তির পথ ধরতে হয়।

গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে দেশ যখন উত্তাল

সেই সময়ই চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে থাকে। স্বরাজ্য দলের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য এবং সবার কাছে তাদের বক্তব্যকে পৌঁছে দেবার জন্য চিত্তরঞ্জন, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'দি ফরোয়ার্ড'। জাতিকে সবরকম মুক্তির পথে এগিয়ে নেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে ফরোয়ার্ড। কিছুদিনের মধ্যেই ফরোয়ার্ডের সহযোগী হিসেবে প্রকাশিত হয় 'বাংলার কথা' এবং 'আত্মশক্তি'। কিন্তু কোপে পড়ে ফরোয়ার্ড গ্রুপের এই তিনটি কাগজ তাদের প্রকাশ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। অবশ্য ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ফরোয়ার্ড, বাংলার কথা এবং আত্মশক্তির জায়গায় প্রকাশিত হয় 'লিবার্টি,' 'বঙ্গবাণী' এবং 'নবশক্তি'। কলকাতা থেকে 'বেঙ্গলী'র সংস্করণ হিসেবে প্রকাশিত হয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নায়ক', যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তর ইংরেজি দৈনিক 'অ্যাডভানস'।

সংবাদপত্র যতই সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে, সরকারও ততই সংবাদপত্রকে দমন করার জন্য নতুন নতুন আইন তৈরি করেছে। এমনই একটি আইন হ'ল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের প্রেস ( এমারজেন্সি পাওয়ার ) অ্যাকট বা সংবাদপত্র ( জরুরি ক্ষমতা ) আইন।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ গর্জে উঠলেও দেশকে মুক্ত করার জন্য প্রকৃত অর্থে গণআন্দোলন শুরু হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। গান্ধীজির নেতৃত্বে ওইসময় যে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয় তাতেই প্রথম সারা দেশের মানুষ একসঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজির নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ শুরু হয় ব্যাপকতার দিক থেকে তার নজির আজও বিশ্বের ইতিহাসে নেই।

ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া লিখেছেন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দের অসহযোগে গ্রেপ্তার হন ৩০ হাজার মানুষ। কিন্তু ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দের ওই আন্দোলনে ১০ মাসের মধ্যে বৃটিশের জেলে ঠাঁই পান ৯০ হাজার মানুষ। নারীপুরুষ এমনকি শিশুরা পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় আর পুলিশের লাঠির নির্মম আঘাতে জর্জরিত মানুষের সংখ্যা নয়-নয় করেও

এর তিন-চারগুণ। সরকারি হিসেবে অবশ্য বলা হয়, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হয় ১৮ হাজার ৭২৫ জন এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের শেষে ওই সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৬০ হাজার।

আন্দোলনের প্রতি কাগজগুলির এই সমর্থন দেখে বৃটিশ শাসক রীতিমত ভয় পেয়ে যায়। সংবাদপত্র দমনের জন্য যতগুলি আইন ছিল তার অতিরিক্ত একটি আইনের জন্য তারা উদগ্রীব হয়ে ওঠে। তাদের সেই উদগ্র ইচ্ছারই ফল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে জারি করা ওই সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইনটি।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ওই আইনে যে কোন সংবাদপত্র বা পুস্তকে উত্তেজনা সৃষ্টি বা খুনের অনুমোদন অথবা হিংসাত্মক কাজে উস্কানি দেওয়া ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৃটিশ সরকারের কোন সেনা বা পুলিশকে প্ররোচিত করা বা বিভিন্ন সম্প্রদায় বা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক করার বা কাউকে ভয় দেখানোর, সরকারি কর্মচারীকে তার কাজ করতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিত থাকলেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ওই আইনে যথারীতি ডিক্লারেশন বাতিল, জামানত বা প্রেস বাজেয়াপ্ত ছাড়াও কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংবাদপত্র দমনে এধরণের কঠোর আইন করেও কিন্তু কলকাতার সংবাদপত্রকে দমিয়ে রাখা গেল না। বরং প্রতিদিনই নতুন নতুন সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকল। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থা সহযোগী হিসেবে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করল ইংরেজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, অমৃতবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রকাশ করল যুগান্তর।

যাইহোক ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইনটি এক বছরের জন্য জারির কথা বলা হলেও এটি তারচেয়ে বেশিদিন চালু ছিল। মহাযুদ্ধ শুরুর সময় এই আইনটি ছাড়া ভারতরক্ষা আইনে সরকার সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য আরো ক্ষমতা হাতে তুলে নেয়। ভারতরক্ষা আইনে কয়েকটি ক্ষেত্রে সংবাদ বা সংবাদ নিবন্ধের আগাম

সেনসর করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারি গোপনীয়তা আইন বা অফিসিয়াল সিক্রেট আইন সংশোধন করে শত্রুর কাজে লাগতে পারে এমন কিছু প্রকাশের দায়ে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হল। ওইসঙ্গে প্রেস (এমারজেন্সি পাওয়ার) আইনও সংশোধন করে শত্রুর কাছে গোপন তথ্য প্রকাশ অথবা অনিষ্টকর বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হ'ল।

মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে ভারত সরকার এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলে,

> In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule 11 of rule 41 of the Defence of India Rules, the Central Government is pleased to prohibit the Printing by any printer, publisher or editor in British India of any matter relating to the holding of meetings or the making of speeches for the purpose, directly or indirectly, of fomenting such opposition as aforesaid. Provided that nothing in this order shall be deemed to apply to any matter Communicated by the Central Government or a Provincial Government to the Press for Publication.

ভারত সরকার এবং সম্পাদক সম্মেলনের এক সমঝোতার পর অবশ্য এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এই সম্পাদক সম্মেলনই পরে 'অল ইণ্ডিয়া নিউজ পেপার এডিটরস' কনফারেন্সে রূপান্তরিত হয়। সমঝোতার ফলেই কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে গঠিত হল সংবাদপত্র উপদেষ্টা কমিটি।

এই উপদেষ্টা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে যেমন সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ভাল করার একটা সাময়িক প্রয়াস দেখা গেল তেমনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকারে যোগ দেওয়ায় অবস্থাটা আরো একটু অন্য রকমের হয়। ফলে নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় আরো সংবাদপত্র। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কৃষক প্রজা পার্টি প্রকাশ করল

'কৃষক', মাখনলাল সেন প্রকাশ করলেন 'ভারত'। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ফজলুল হক প্রকাশ করলেন 'নবযুগ'।

কাগজ প্রকাশিত হতে থাকলেও সরকারের দমননীতি কিন্তু তেমন কমল না। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সংবাদপত্রগুলিও ক্রমশ জোটবন্ধ হতে থাকল এই সরকারি আক্রমণের বিরুদ্ধে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের প্রেস অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে ছ'মাসের শুধু জামানত হিসেবে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা আয় করে এবং ১৩১টি কাগজকে বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে জামানত হিসেবে যে টাকা চাওয়া হয় সাড়ে চারশ সংবাদপত্র তা দিতে পারে না এবং ৭২টি কাগজকে সাজা দিয়ে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা চাওয়া হয়। ৭২টির মধ্যে ১৫টি মাত্র ওই টাকা দিতে পারে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসেও ৯২টি কাগজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্টে কংগ্রেস ভারতছাড় আন্দোলন শুরু করলে ভারতরক্ষা আইনের ৪১ বিধি অনুযায়ী নতুন করে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে কংগ্রেসের কর্মসূচী এবং কাজকর্ম সম্পর্কিত সংবাদ ছাপার ব্যাপারে বেশ কিছু নিষেধজ্ঞা আরোপ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রের প্রতি আহবান জানিয়ে বললেন, বরং পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ রাখুন তবু নিষেধের চাপে মিথ্যা ও বিকৃত সংবাদ প্রচারের ভাগিদার হবেন না। এই সময়ও সরকার অবশ্য সম্পাদক সম্মেলনের সঙ্গে কথা বলে ও বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার করেন। কিন্তু এই সময় অমৃতবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশের খাদ্যাবস্থা নিয়ে দু'টি সম্পাদকীয় লেখায় অমৃতবাজারের সম্পাদকীয় প্রকাশের আগে সেনসর করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এ নির্দেশ সম্পর্কে বাংলার সংবাদপত্রগুলিকে মন্তব্য করতে নিষেধ করা হয়।

এরই মধ্যে এল ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ আগষ্ট। ভারত স্বাধীন হ'ল। সারা দেশের সঙ্গে কলকাতার সংবাদপত্রগুলিও তাদের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। এতদিন বিদেশী সরকারের শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে অগ্নিবীণা তারা বাজিয়েছে এবার সেই বীণাতেই দীপকের পরিবর্তে বসন্ত রাগ বাজাবার জন্য তৈরি হ'ল।

স্বাধীনতা শুধু দেশবাসী নয়, সংবাদপত্র জগতের কাছেও নতুন আশার আলো নিয়ে হাজির হ'ল। প্রশাসনের রক্তচক্ষু চলার পথকে আর বাধাবন্ধুর করবে না এটাই হল সংবাদপত্রের কাছে স্বস্তির বিষয়।

স্বাধীনতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্র জগৎ থেকে বৃটিশ শক্তিও বিদায় নিল। বৃটিশ মালিকরা হয় কাগজ তুলে দিল কিংবা মালিকানা ছেড়ে দিল। ব্যতিক্রম অবশ্য কলকাতার স্টেটসম্যান এবং ক্যাপিটাল।

এদিকে দেশীয় ভাষায় এবং মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি কিন্তু স্বাধীনতার পর সাময়িকভাবে সামান্য বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ল। কেননা এতদিন এসব সংবাদপত্র দেশকে স্বাধীন করার উন্মাদনায় সংবাদপত্র পরিচালনা ও প্রকাশ করে গেছে। তাদের মধ্যে সেই অর্থে ছিল না Professionalism বা পেশাগত দক্ষতা, তারা কাজ করত একটা mission বা বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে। কিন্তু স্বাধীনতার পর সংবাদপত্র যখন একদিকে একটা শিল্প এবং অন্যদিকে গণতন্ত্রের 'চতুর্থ স্তম্ভ' হয়ে উঠল তখন তার পেশাগত দক্ষতার ঘাটতি কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি করল। তবে সেটা ক্ষণকালের জন্য।

অল্পদিনের মধ্যেই সংবাদপত্রগুলি তাদের নতুন ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। এই অবস্থায় স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের কাছে সংবাদপত্রের প্রত্যাশা ছিল যথেষ্ট।

নতুন গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, প্রেস আইনগুলি পর্যালোচনা করে দেখার জন্য তিনি একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সেই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করল। কমিটি ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি দণ্ডবিধি, বহিঃশুল্ক আইন, ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন, ভারতীয় ডাকঘর আইন-এর সংশ্লিষ্ট ধারাগুলিকে বিশ্লেষণ

করে দেখেন এবং প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেসন অব বুকস আইন, ইন্ডিয়ান স্টেটস (প্রোটেকসন) আইন, ভারতীয় সংবাদপত্র (জরুরি ক্ষমতা) আইন ইত্যাদিও বিচার বিবেচনা করে এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে যেসব আইন গৃহীত হয়েছে তার জনস্বার্থ ঘটিত দিকটিও খতিয়ে দেখে কয়েকটি সুপারিশ করে। ওই সুপারিশ সংবাদপত্র সম্পর্কে বিশেষ আইনগুলি বাতিল করে তার গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলি দেশের সাধারণ আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়। কমিটি অবশ্য সরকারি গোপনীয়তা আইন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক, ১৫৩ ক এবং ৫০৫ ধারাটি বহাল রাখার পক্ষেই মত দেয়।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কিন্তু কমিটির এসব সুপারিশ কার্যকর হয় নি। ফলে সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্কটা তেমন একটা মধুর হয়ে ওঠে না। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান গ্রহণের পর একটা নতুন ধরণের পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। জনশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে এমন অভিযোগে প্রশাসন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছিল সেগুলি সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট নাকচ করে দিতে থাকল।

সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদের আইনগত ব্যাখ্যায় বলা হয়, মানহানি, সন্ত্রাস, আদালত অবমাননা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অথবা সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্ররোধ আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত করা আছে। বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্তে কিন্তু স্পষ্টই বলা হল, অপরাধের জন্য প্ররোচনা বা উত্তেজনা ছড়ানোটা যখন ঠিক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করার পর্যায়ে পড়ে না তখন তার বিরুদ্ধে মামলা করা যায় না।

আইনসদস্য সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধনের ব্যাখ্যায় বললেন, যে কেউ হত্যা বা অন্যান্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে অন্যকে উত্তেজিত বা প্ররোচিত করতে পারে। সংশোধনীতে দেশের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতার সুরক্ষার মত প্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কোচিত করার কথা বলা হ'ল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলকাতা এবং সারা দেশের সংবাদপত্রগুলি প্রতিবাদে

মুখর হয়ে উঠল। এরই ফলে শেষ পর্যন্ত সংশোধনীতে যুক্তিসঙ্গত নিষেধাজ্ঞা শব্দটি যুক্ত হয়। এই সংশোধন গ্রহণের ব্যাপারে সংবাদপত্রের অনুমোদন পাবার আশায় দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সি. রাজাগোপালচারী এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বেশ কিছু আশ্বাস দেন, কিন্তু সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংস্থা তা মেনে নেন না। তা সত্ত্বেও ২৮৮-২০ ভোটে সংশোধনীটি গৃহীত হয়। প্রতিবাদে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ১২ জুলাই সর্বভারতীয় সংবাদপত্র ধর্মঘট হয়। ওই বছরই সংবাদপত্র ( আপত্তিকর ) আইন গ্রহণের সময় সংবাদপত্রকে খুব সামান্য কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এই আইন গ্রহণের ফলে সংবাদপত্র ( জরুরি ক্ষমতা ) বৈদেশিক সম্পর্ক আইন এবং দুটি রাষ্ট্ররক্ষা আইন এবং ১৩টি রাজ্যের আইন বাতিল হয়ে যায়। এই আইনটি ১৯২১ এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের প্রেস কমিশনের আইনের সম্পূর্ণ বিরোধী। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা প্রশাসন নয়, বিচার বিভাগ ঠিক করবেন, এটাই হ'ল আগের সংবাদপত্র আইনের সঙ্গে এই নতুন আইনের পার্থক্য। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলার সংখ্যা ১৩৪টির বেশি হয়নি। এরমধ্যে ৮৬টি ক্ষেত্রে জামিনজমা দাবি করা হয় এবং ৪৮টির জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরেই সরকার বিভিন্ন সাংবাদিক সংস্থার চাপে প্রেস কমিশন গঠন করতে বাধ্য হন। বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের নেতৃত্বে কমিশন সংবাদপত্রের অবস্থা তদন্ত করে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে সংবাদপত্রের তৎকালীন অবস্থা এবং আইন সম্পর্কে বেশকিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। কমিশন তার রিপোর্টে প্রেস অ্যাণ্ড বুকস রেজিস্ট্রেসন আইন সংশোধন, মানহানি আইন সংশোধন, আপত্তিকর আইন রদসহ বেশ কিছু সুপারিশ করে।

এরপর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে যে পার্লামেণ্টারি প্রসিডিংস ( প্রোটেকসন অব পাবলিকেসন ) আইন গৃহীত হয় তাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বেশ কিছুটা মেনে নিয়ে বলা হয়, সংসদের কার্যবিবরণের সঠিক তথ্য পরিবেশন

কখনই শাস্তিযোগ্য নয়। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রেস কাউন্সিল আইন (১৯৫৬ খৃঃ) সংশোধিত হয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় প্রেস কাউন্সিল গঠিত হলেও সরকারের সঙ্গে সংঘাতের কিন্তু অবসান হয় না।

স্বাধীনভারতে সংবাদপত্রকে সবচেয়ে বেশি নিপীড়নের মুখে পড়তে হয় ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ২৫ জুন জারি করা জরুরি অবস্থার সময়। সে সময় সংবাদ প্রকাশের ওপর আগাম সেনসর প্রথা চালু করা হয় এবং বহু সাংবাদিককে কারাবরণও করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিহার, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক, জম্মু ও কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্য সরকারও একাধিকবার সংবাদপত্রকে দমন করার জন্য প্রেস আইন বা কালা কানুন গ্রহণের চেষ্টা করে। কিন্তু সংবাদপত্র এবং জনমতের চাপে প্রতিবারই কি কংগ্রেসী, কি অ-কংগ্রেসী সরকার এই আইন প্রণয়নের জন্য আনা বিল প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

রাজীব গান্ধীর সরকারও গত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট লোকসভায় মানহানি বিল পেশ করেন। ৩০ আগষ্ট ৪৬-১৩৮ ভোটে সমস্ত সংশোধনী বাতিল করে বিলটি লোকসভায় গৃহীত হয়। এর প্রতিবাদে সেপ্টেম্বর থেকেই দেশজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী এই বিল প্রত্যাহার না করার সিদ্ধান্তে অনড় থাকলেও আন্দোলনের তীব্রতার মুখে ২২ সেপ্টেম্বর এটি নিয়ে আর না এগোবার কথা ঘোষণা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার ফলে সংবাদপত্রের সঙ্গে সরকারের একটি বড় ধরণের সংঘাতের অবসান হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সরকারের সঙ্গে সংবাদপত্রের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সম্ভবত বর্তমান মানসিকতায় পুরোপুরিভাবে তা সম্ভবও নয়। কেন না, বর্তমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও কোন সরকারই সংবাদপত্রের সমালোচনা শুনতে রাজি নয়, বরং প্রত্যেকেই চায় সংবাদপত্রের অবাধ সমর্থন। একই সংবাদপত্র সরকারের সমালোচনার দায়ে হয়ে যায় জনবিরোধী আবার পরমুহূর্তে সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থনের মধ্য দিয়ে পেয়ে যায় জনদরদী সংবাদপত্রের খেতাব। সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের মনোভাব তথা সংবাদপত্রের কাছে সরকার বা

সরকারি দলের চাহিদার কথা ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের মত আর কেউ বোধহয় সরাসরি বলতে পারেননি। বল্লভভাই প্যাটেল বোম্বাইয়ের ফ্রি প্রেস জার্নালের সদানন্দকে সাফ বলে দেন,—

We are interested in newspapers which will support us wholeheartedly. To say you will support us when we are right is meaningless. For why should any one oppose us then!

অর্থাৎ যে সব কাগজ আমাদের পুরোপুরি সমর্থন জানাবে তাদের সম্পর্কেই আমরা আগ্রহী। আমরা যখন সঠিক কাজ করছি তখন সমর্থন করাটা নিরর্থক, কেননা, সে সময় কেউ আমাদের বিরোধিতা করবে কেন?

ওই কথার মধ্য দিয়ে প্যাটেল একটিই ইঙ্গিত দেন, বিচার বুদ্ধি খুইয়ে যেসব সংবাদপত্র সব সময় সরকারকে সমর্থন করে যাবে সেগুলিই ভাল সংবাদপত্র—সেগুলির প্রতিই বর্ষিত হবে সরকারের উদার করুণা। কিন্তু আত্মমর্যাদা খুইয়ে কোন দেশেরই সব সংবাদপত্র কোন দিন একসঙ্গে সরকারের স্তাবকতা করেনি—ভবিষ্যতেও করবে না। কলকাতার সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরাও এর ব্যতিক্রম নন। সরকার যেখানে ভুল পথের যাত্রী সংবাদপত্র সেখানে সমালোচনায় কঠিন, আবার সরকার যখন জনমুখী কর্মসূচী কার্যকর করবেন তখন সংবাদপত্রও বিনা শর্তেই এগিয়ে দেবে সহযোগিতার হাত।

কলকাতার সাংবাদিকরা জানেন, শাসকের রক্ত চক্ষুই চিরকাল হয়ে ওঠে সাংবাদিকদের শক্তির উৎস। তাই কলকাতার সংবাদপত্র বিশ্বের স্বাধীন সংবাদপত্রগুলির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই আজও জোর গলায় বলতে পারে—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভাত সূর্যের মতই রক্তিম—স্বাধীনতার সেই রক্তিম সূর্যকে ভাস্বর রাখতে পণ রক্তাক্ত হৃদপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু। স্বাধীনতার লাল সূর্যে কলঙ্কের দাগ পড়তে দেব না কখনই।